بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামিক রাষ্ট্র

এক আল্লাহ, এক ধর্ম, এক দেশ



আল্লাহর আইনে তৈরি মুসলিম বঙ্গের রূপরেখা

আল-ফিহরাস্

আল্লাহর পৃথিবীতে মানুষ প্রতিনিধি (আল্লাহ কর্তৃক আদেশ)

আমার সন্তানকে আমি সৃষ্টি করি নাই, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, এই সন্তানকে যত্ন করা আমার দায়িত্ব। আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীর দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানুষকে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আবার জীবিত করবেন, যা সূরা বাকারার ৩০ নং ও আল আনআমের ১৬৫ নং আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সমূহ কী জানতে হবে। যে ব্যক্তি অন্য কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হয়ে কর্তৃপক্ষের আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করেন, সেই ব্যক্তিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলা হয়। আর দায়িত্ব হলো আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা। যেমন- জেলা প্রশাসক (ডিসি)গণ সরকার থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত; জেলা প্রশাসকগণ সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং সরকারের হয়ে কাজ করার দায়িত্ব পালন করেন। কোন ব্যক্তি সরকারের আইনের বাইরে কাজ করলে জেলা প্রশাসক ওই ব্যক্তিকে বন্দি করে সরকারের আইন অনুসারে শাস্তি প্রদান করবেন—একেই দায়িত্ব পালন বলে। ডিসি যদি তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন না করেন, তাহলে সরকার তাকে শাস্তি দেবে বা চাকরিচ্যুত করবে।

ডিসিগণ যেভাবে সরকারের দায়িত্ব পালন করেন ঠিক সেভাবে আল্লাহ মানুষকে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে হলে মানুষকে প্রথমে কালিমার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। যেই সকল মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে না, সেই সকল মানুষ ইবলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর মুসলমানদের ওপর পর্যায়ক্রমে পাঁচটি দায়িত্ব পালন করা ফরজ হয়ে যায়। যথা: নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ও জিহাদ। এর পাশাপাশি আল্লাহ মুসলমানদেরকে কিছু আদেশ ও নিষেধ করেছেন। যে মুসলমান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানবে না, সেই মুসলমানকে শাস্তির জন্য আল্লাহ মুমিন মুসলমানদেরকে কিছু ক্ষমতা ও নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে মুমিন মুসলমানগণ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ বাস্তবায়ন করতে পারেন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ কারি মুমিন মুসলমানদের কাজ ও ক্ষমতা:

১. **নামাজ:** আল্লাহর স্মরণ থেকে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার ব্যস্ততা যাতে দূরে রাখতে না পারে সেই জন্য মুমিন মুসলমানগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এবং মুমিন মুসলমানগণ নিশ্চিত করবেন যাতে সকল মুসলমান সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করতে পারে। (সূরা আল-বাকারা: ১১০, মাউন: ৫)

২. **যাকাত:** যেই সকল মুসলমানের নিকট (নিসাব পরিমাণ) প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ জমা আছে, সেই ব্যক্তির থেকে যাকাত আদায় করে মুমিন মুসলমানগণ ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী, চিত্তাকর্ষণকারী, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টন করে দিবেন। (আল-বাকারা: ১১০)

৩. **রোজা:** মুমিন মুসলমানগণ যাকাত থেকে অর্থ দিয়ে অভাবগ্রস্ত মুসলমানগণের রোজা পালন নিশ্চিত করবেন। যাতে মুসলমানদেরকে দুনিয়ার কষ্ট রোজা পালন থেকে দূরে রাখতে না পারে। (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩, আয-যারিয়াত: ১৯)

৪. **হজ্জ:** যাকাত আদায় করার পরেও সেই মুসলমানের নিকট যদি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সামর্থ্য থাকে, তবে সেই মুসলমানকে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মুমিন মুসলমানগণ প্রশাসনিক সাহায্য করবেন। (সূরা আল-ইমরান: ৯৭)

৫. **জিহাদ:** উপরোক্ত চারটি কাজ ও আল্লাহর হালাল-হারাম, সুদের আদান-প্রদান কারিকে, অন্যায়ভাবে হত্যা কারিকে, ব্যভিচার ও অশ্লীল কাজ করা ব্যকিকে, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ কারিকে, মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন কারিকে, জুয়া খেললে, ভাগ্য নির্ণায়ক ব্যবহার করলে, ওজনে কম-বেশি করে ঠকালে এবং শাতিমে রাসূলকে শাস্তি প্রদান করতে গেলে যদি কাফেররা বাধা প্রদান করে, তখন মুসলমানদের জন্য ফরজ সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা। (সূরা আল-আনফাল: ৩৯, আল-বাকারা: ১৯৩, ২৭৫, ২৭৯)

সুতরাং বলা যায়, মুমিন মুসলমান হলেন সেই ব্যক্তি, যার বেতের ভয়ে ব্যভিচারীরা ভয় পায়, সুদখোররা আতঙ্কিত থাকে, খতমে রাসূল (সা.)-এর নিন্দাকারী (শাতিম) মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে থাকে। কোন মুসলমান যদি আল্লাহর দায়িত্ব অস্বীকার করে তখন সেই ব্যক্তি আর মুসলমান থাকে না। (সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪)

বর্তমান সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিচারক, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সরকারের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি বাস্তবায়ন করছেন, ঠিক সেভাবেই মুমিন মুসলমানরা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি বাস্তবায়ন করবে। যেহেতু বর্তমান সরকার আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করছে না, সেহেতু মুমিন মুসলমানদের জন্য প্রয়োজন রাসূল (সা.)-এর মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা। কারণ পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত আল্লহার আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি বাস্তবায়ন করা যায় না।

মানুষকে পরিচালনার সূত্র (সভ্যতা)

সভ্যতা কাকে বলে?
উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ক যাবতীয় সমস্যার সমাধানকে সভ্যতা বলা হয়। সভ্যতার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে শাসনব্যবস্থা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে। অর্থাৎ, সভ্যতার আদর্শ থেকে শাসনব্যবস্থার সংবিধান এবং শাসনব্যবস্থার সংবিধানের আলোকেই মানুষের জন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। সভ্যতার প্রধান বারোটি ভিত্তি আছে যা হলো—সরকার, বিচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, বিবাহ, পরিবার, মূল্যবোধ, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, লিখন পদ্ধতি এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন। সভ্যতার বারোটি ভিত্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে একটি মানবজাতিকে কাঙ্ক্ষিত যেকোন আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব। যেমন- মুসলিম সভ্যতার মূল সংবিধান হলো আল-কোরআন, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আল-কোরআনের দিক-নির্দেশনাকে ব্যবহার করে রাসূল (সা.) একটি অশ্লীল জাতিকে পরিবর্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে ধারণ করে চারজন সাহাবী যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, তা ইতিহাসে মদিনা রাষ্ট্র বা খিলাফত শাসন নামে পরিচিত।

উদাহরণ: ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হয়, যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাটি মূলত খ্রিষ্টান নীতি ও আমেরিকান সংবিধান-ISO মেনে চলে। খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চরম পরিণতি যদি মুসলমানরা দেখতে চায়, তবে স্পেন তার একটি বড় উদাহরণ। স্পেনের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রের লক্ষ্যের সাথে আল-কোরআনে বর্ণিত ইবলিশের লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন। বর্তমানে জাতিসংঘ এবং আমেরিকার মতো দেশগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে ইবলিশের অপকর্মসমূহ বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে বা মুসলিম বঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানি ও সংস্থার খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন প্রয়োগ করে।

খ্রিষ্টানদের আইন প্রয়োগ কারি কোম্পানি ও সংস্থার নাম: আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, রেডিসন ব্লু, কেএফসি, পিৎজা হাট, কোকাকোলা, পেপসি, নেসলে, কেরু অ্যান্ড কোং, জাতিসংঘ (ও এর সকল শাখা), ইউএসএইড, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, ইউনেস্কো, ইউএন ওমেন, ইউএনএইডস, ইউনিসেফ, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আইসিসি, রেড ক্রিসেন্ট, গুগল, মেটা (ফেসবুক), আমাজন, অ্যাপল, স্যামসাং, গ্রামীণফোন, রবি, সিলিজ ও অগমেডিক্স, বিএসসিসিএল, আইটিসি, সিটিব্যাংক, এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, ইউএসবি ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, মেটলাইফ বাংলাদেশ, প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ইউনিলিভার বাংলাদেশ, প্রাণ, ওয়ালটন, বসুন্ধরা, মেঘনা গ্রুপ, যমুনা গ্রুপ, স্কয়ার, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, কারগিল, ফিলিপস, শেভরন, হ্যালিবার্টন, লুব-রেফ, জিফোরএস, ফাইজার, মডার্না, লিলি, ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস, কোডেক, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, একাত্তর টিভি, বিবিসি, বিজিএমইএ, লায়ন।

সভ্যতা হলো মানুষকে পরিচালনার মূল গঠন, যার সম্পূর্ণ পরিবর্তন যুদ্ধ ছাড়া সম্ভব নয়। বিষয়টিকে জীবনতত্ত্বের একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা সহজ—একটি শরীরে কয়টি হাত বা পা থাকবে সেই মৌলিক নকশাটি হলো গঠনের কাঠামো, আর সেই হাত বা পা দেখতে কেমন হবে তা হলো কাঠামোর গঠন। বর্তমানে অনেকেই খ্রিষ্টান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থেকেই মুসলমানদের জন্য আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা আসলে কেবল কাঠামোর বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত বাহ্যিক পরিবর্তন নয়, বরং মূল গঠনের কাঠামো পরিবর্তন নিশ্চিত করা। গঠনের কাঠামো পরিবর্তন করার জন্য মুসলিমজাতির ইস্পাতকঠিন ঐক্যের প্রয়োজন। তবে বর্তমানে খ্রিষ্টানরা গণতন্ত্র দিয়ে সুকৌশলে মুসলমানজাতিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে, যার ফলে খ্রিষ্টান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে থেকে মুসলমানজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে মুসলমানদের আদর্শ হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), যিনি তৎকালীন অনৈক্যবদ্ধ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সম্পূর্ণ নতুন মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করেছিলেন। রাসূল (সা.) সেই কর্মপদ্ধতি থেকে শিক্ষা নিয়েই খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে এগোতে হবে।

বিশ্বব্যাপী সভ্যতার উত্থান-পতন (বিশ্বযুদ্ধ)

বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস, বিশ্বব্যাপী নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং নির্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যেই বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখন পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ বিশ্বশাসনের চিন্তা নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তখন বিশ্বযুদ্ধ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যেমনটি ঘটেছিল ইতিহাসের প্রকৃত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে, যা ছিল মূলত তৎকালীন খ্রিষ্টান রোম সাম্রাজ্যের বা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের মদিনা রাষ্ট্রের সংঘাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: এই যুদ্ধে খ্রিষ্টান রোম সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের নেতৃত্বে মুসলমানদের উত্থান ঘটে। তবে ইতিহাসের পাতায় মুসলমানদের বিজয়কে আড়াল করার জন্য একে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না এবং খ্রিষ্টানদের পরাজয়ের কাহিনী বিকৃত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহানায়ক ছিলেন মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ, যাকে নিয়ে আজও মুসলিম জাতি গর্ববোধ করে। খ্রিষ্টানদের রোম সাম্রাজ্য দীর্ঘ ১০০০ বছর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল—ঠিক যেভাবে আমেরিকা বর্তমানে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। খ্রিষ্টান রোম সাম্রাজ্যের বিশ্বব্যবস্থাকে বলা হয় রোমান সভ্যতা, যার মূল ভিত্তি ছিল খ্রিষ্টান রাজতন্ত্র। পুরাতন রোমানরা জুপিটারের পূজা করত এবং তাদের কোন লিখিত সংবিধান ছিল না; বরং রাজার ইচ্ছাই ছিল রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আইন। খালিদ বিন ওয়ালিদের হাত ধরে সেই খ্রিষ্টান রাজতন্ত্রী রোমান সভ্যতার অবসান ঘটে এবং মদিনা রাষ্ট্রের ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: এই যুদ্ধে মদিনা রাষ্ট্র ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা খিলাফতের অবসান ঘটে এবং নতুন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মূলত উসমানীয় খিলাফতের সাথে উদীয়মান বস্তুবাদী সমাজতন্ত্র ও বিভিন্ন মতবাদের সাথে সংঘাত। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতিতে উসমানীয় খিলাফতের পতন ঘটে এবং বিশ্বমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়। খিলাফত বিশ্বব্যবস্থা দীর্ঘ ১৩০০ বছর ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজ মানুষ যেভাবে খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রকে একটি স্বাভাবিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তৎকালীন সময়েও মদিনা রাষ্ট্র ছিল বিশ্বজুড়ে সর্বজনগৃহীত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা। মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় মুসলিম সভ্যতা, যার মূল ভিত্তি ছিল ইসলাম। প্রাচীন মুসলিম সভ্যতার অনুসারীরা কেবল এক আল্লাহর ইবাদত করত এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র পথ ছিল আসমানী কিতাব। মদিনা রাষ্ট্রের সমাপ্তি ঘটলেও মুসলিম সভ্যতার শান্তির রাষ্ট্রব্যবস্থা বা মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থার সেই মূল সংবিধান আল-কোরআন আজও পৃথিবীতে অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ: সাম্রাজ্যবাদের পতন ও খ্রিষ্টান আমেরিকার উত্থান, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদের এবং খ্রিষ্টানদের নেতৃত্বাধীন গণতন্ত্রের মধ্যকার এক চূড়ান্ত লড়াই। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের পতন ঘটে এবং খ্রিষ্টানরা বিশ্বনেতৃত্বে আরোহণ করে। বর্তমানে খ্রিষ্টানরা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বকে প্রায় ২১ বছর নেতৃত্ব দিয়েছিল, যাকে ইতিহাস হিটলারের উত্থান কিংবা সোভিয়েত শাসনকাল হিসেবে চেনে। সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হয় বস্তুবাদী কমিউনিস্ট সভ্যতা, তারা লেনিন ও কার্ল মার্কসের মতবাদ গ্রহণ করত। সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরবর্তীতে খ্রিষ্টানদের আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়।

চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ: এই যুদ্ধের মাধ্যমে বর্তমান প্রচলিত খ্রিষ্টান গণতন্ত্রের পতন ঘটবে। খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র গত ৮৫ বছর ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, যা মূলত খ্রিষ্টান রোম সাম্রাজ্যের আধুনিক সংস্করণ। খ্রিষ্টানরা গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে। পুরাতন রোমানরা যেমন জুপিটারের পূজা করত, বর্তমান খ্রিষ্টানরা গণতন্ত্র দিয়ে তেমনি ইবলিশের পূজা করে। কারণ, সব মানুষের ধর্ম আছে, কিন্তু ইবলিশের কোন ধর্ম **নেই**, ইবলিশ হলো ধর্মনিরপেক্ষ। যারা খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, তারা মূলত সরাসরি ইবলিশের পূজা করছে। খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক সংবিধান হলো নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। আজ দেশে অনেক নামধারী মুসলমান খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দিয়ে আল্লাহর দায়িত্ব পালন করার স্বপ্ন দেখে। অথচ আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ হলো—কাফের বা ইবলিশকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। সুতরাং, যারা খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে যুক্ত থাকবে, তারা সরাসরি ধর্মনিরপেক্ষ ইবলিশের অনুসারি হয়ে যাবে। (সূরা আল-ইমরান: ২৮)

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৯১৮ সাল—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (প্রথা অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পরবর্তী সময় থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত, যেই সকল মুসলমান খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রের অনুসারীদের সাথে আপস করে পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন, ওই সকল মুসলমান সফল হতে পারেনি। বরং মুসলমানদের মধ্যে যারা মুনাফিকি নীতি অবলম্বন করেছেন, তারা গণআন্দোলন, হরতাল, সামরিক অভ্যুত্থান কিংবা গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মুনাফিকের আলামত নিয়ে তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আল-কোরআনে সতর্ক করে বলেছেন: মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, আমি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। (সূরা ফাতির: ৬, সূরা আল-বাকারাহ: ৮)

রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহ ও তার সংবিধান (শাসনতন্ত্র)

শাসনতন্ত্র কাকে বলে?
সভ্যতার বারোটি ভিত্তিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাকেই শাসনতন্ত্র বলা হয়। মূলত আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য গৃহীত কর্মপন্থাই হলো শান্তির শাসন বা ইসলামিক শাসন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য আল-কোরআনকে ইসলামিক রাষ্ট্রের মূল সংবিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, যেখানে সরকার আল্লাহর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদের শাসন করবেন।

প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্থকতা নির্ভর করে তার নির্দিষ্ট প্রভু বা আইনদাতার ওপর। যেমন—মুসলমানদের ইসলামিক শাসনতন্ত্রের প্রভু হলেন আল্লাহ তাআলা; রাজতন্ত্রের প্রভু হলো রাজা; বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের প্রভু হলো কার্ল মার্কস এবং খ্রিষ্টান গণতন্ত্রের প্রভু হলো ধর্মনিরপেক্ষ-ইবলিশ। প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই হলো জাতিকে তার প্রভুর আইন পালনে বাধ্য করা। মানবজাতির ঐক্য মূলত সেই প্রভুর দেওয়া আদর্শের ওপরই নির্ভর করে। যখন মানবজাতি প্রভুর সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তখনই কেবল রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবর্তন আনা সম্ভব। বর্তমান পৃথিবীতে চারটি রাষ্ট্রব্যবস্থা দৃশ্যমান: ১. রাজতন্ত্র, ২. শরীয়াহতন্ত্র, ৩. সমাজতন্ত্র এবং ৪. গণতন্ত্র—এই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রব্যবস্থার নিজস্ব আইন আছে যার মাধ্যমে মানুষ পরিচালিত হয়।

১. রাজতন্ত্র: বর্তমানে আরব দেশগুলোতে রাজতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা বেশি দেখা যায়। রাজতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতি রাজার আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ থাকলেও রাজার দীর্ঘস্থায়ী শাসনের ফলে প্রজারা প্রায়শই জুলুমের শিকার হয়। রাজতন্ত্রে রাজা অঢেল সম্পদের মালিক হন এবং সকল ক্ষমতা রাজার হাতেই কুক্ষিগত থাকে। যখন রাজা আল-কোরআন থেকে কিছু নিয়ম রাখে এবং বাকি নিয়ম রাজার হয়, তখন তা ইসলামিক রাজতন্ত্র হয়। রাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো ক্ষমতা ও সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত আধিপত্য বজায় রাখা।

২. শরীয়াহতন্ত্র: বর্তমানে আফগানিস্তানে এবং ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন স্থানে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চর্চা দেখা যায়। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধানকে বলা হয় আমিরুল মুমিনিন। তিনি সরকার হলেও তাঁর কোন ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকে না, কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন সরাসরি আল-কোরআন থেকে নেওয়া হয়। আল-কোরআন থেকে আইন নেওয়ার কারণে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কোন মৌলিক মতভেদ থাকে না। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিক জনগণ এবং ইসলামিক রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো সকল পরিবারের মধ্যে সম্পদের সুষম ও সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা।

৩. সমাজতন্ত্র: বর্তমানে চীন ও রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রচলিত। সমাজতন্ত্রের নিয়ম হলো—সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিই সমাজতন্ত্রের আইন প্রণয়ন করেন, যা ওই ব্যক্তিকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত মালিকানা খর্ব করে সাধারণ জনগণকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখা এবং জনগণের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

৪. গণতন্ত্র: বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপে সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাগজে-কলমে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কথায় জনগণ ক্ষমতার মালিক হলেও বাস্তবে খ্রিষ্টান সংবিধান অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইন প্রণীত হয়। খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাটি সুকৌশলে মানুষকে ভাগ করে এবং সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। নির্বাচনের দোহাই দিয়ে এক পক্ষ সামনে অন্য পক্ষকে দাঁড় করিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষের মধ্যে স্থায়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। মূলত খ্রিষ্টান গণতন্ত্রের গোপন লক্ষ্য হলো জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও মতভেদ সৃষ্টি করা।

৫. জাদু: এটি কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। ইহুদী জাতি বিশ্বাস করে সুলায়মান (আ.) যেভাবে অদৃশ্য জগৎ নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন তা ছিল জাদু। মেসোপটেমিয়ার বিখ্যাত শহর ব্যাবিলনে হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতা ছিলেন। ইহুদীরা যখন পরাজিত হয়ে বন্দি হিসেবে ব্যাবিলনে যায়, তখন তারা সেখানকার জাদুর রহস্যময় বিষয়গুলোর সংস্পর্শে আসে। সেখান থেকে প্রাপ্ত জাদু কাবালাহ ইহুদী জাতি আজও চর্চা করে। ইহুদী জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি জাদু নিয়ে বিশ্ব শাসন করতে আসবে তাকে হয়তো মুসলিম পূর্বপুরুষরা দাজ্জাল হিসাবে নাম দিয়েছেন। আল্লাহর আইনের বিপক্ষে বর্তমানে খ্রিষ্টানরা তাণ্ডব চালাচ্ছে, এই তাণ্ডবের পরে হয়তো আসবে জাদুর তাণ্ডব যা দিয়ে সকল মুসলমানকে ইসলাম থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করবে। যার কারণে আল্লাহর কাছে মুসলমানরা সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে বারবার পাঠ করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পথ থেকে দূরে রাখুন।

প্রত্যেক আইনদাতা নিজের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী সভ্যতার বারোটি বিষয়ে নিয়ম ঠিক করে দেয়। মানুষ যখন সেই নিয়ম মেনে চলে, তখন মানুষ সেই প্রভুরই ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হয়। যেমন—বর্তমানে আল্লাহর দেওয়া আইন দিয়ে তালিবানরা রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই জন্য তারা আল্লাহর ইবাদতকারী; অন্যদিকে যারা খ্রিষ্টান আইনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা গণতন্ত্র মেনে চলছে, তারা ধর্মনিরপেক্ষ ইবলিশের ইবাদতকারী।

ধর্মনিরপেক্ষ ইবলিশের অপকর্মসমূহ (ইবাদত)

প্রকাশ্য পূজা থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু মানুষ কীভাবে অদৃশ্য ইবলিশের পূজা থেকে বাঁচবে?
মানুষের শত্রু ইবলিশ। মানুষ শারীরিকভাবে ইবলিশের পূজা করে না। কিন্তু মানুষের মনে ইবলিশ কুমন্ত্রণা প্রদান করে। মানুষ যখন ইবলিশের কুমন্ত্রণা অনুসারে কাজ করে তখন মানুষ ইবলিশের পূজা করে। ইবলিশের পূজা থেকে দূরে থাকার জন্য প্রতেক মুসলমানের ইবলিশের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে জানা দরকার। (আন-নাস)

ধর্মনিরপেক্ষ ইবলিশের কুমন্ত্রণাসমূহ (সর্বনাম মুক্ত): আল্লাহ বলেন—
০১. অতঃপর আদম ও হাওয়ার লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য ইবলিশ আদম ও হাওয়াকে কুমন্ত্রণা দিলো, যা আদম ও হাওয়ার নিকট গোপন রাখা হয়েছিল। (আরাফ: ২০)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: বর্তমান সময়ে ইবলিশ ফ্যাশন, আধুনিকতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নাম দিয়ে মানুষকে অশ্লীল ও স্বল্প কাপড় পরিধানে কুমন্ত্রণা দেয়। এর ফলে পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয় এবং পরিবারে যৌনতা ও নির্লজ্জতার প্রসার ঘটে যা মানুষের পারস্পরিক সম্মান ও পবিত্রতা নষ্ট করে।

০২. আল্লাহকে পরিত্যাগ করে কাফেররা শুধু নারী মূর্তির পূজা করে বরং কাফেররা মূর্তি পূজার নামে ইবলিশের পূজা করে। (নিসা: ১১৭)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: অতীতের কাফেররা পাথর বা কাঠের নারী মূর্তির পূজা করত। বর্তমান যুগে ইবলিশ আধুনিক কাফেরদের দিয়ে বিনোদন জগত, বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে নারীদেরকে জীবন্ত মূর্তিতে রূপান্তর করে। মানুষ যখন ঐসব আধুনিক নারী মূর্তির পেছনে সময় এবং মেধা ব্যয় করে তখন মানুষ ইবলিশের তৈরি করা আধুনিক পূজা করে।

০৩. এবং ইবলিশ আদম ও হাওয়ার নিকট কসম খেয়ে বলল—নিশ্চয়ই ইবলিশ আদম ও হাওয়ার পম বন্ধু। (আরাফ: ২১)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সুযোগসন্ধানী সংস্থা, রাজনৈতিক নেতা বা বিজ্ঞাপনী প্রচার মাধ্যম তারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রেখে মানুষকে এমনভাবে প্ররোচিত করে, যেন ঐসব সংস্থা মানুষের বন্ধু। যেমন— খ্রিষ্টানদের জাতিসংঘ মুসলমানদের বলে তোমাদের বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা ফ্রি টিকা দিবো। আচ্ছা খ্রিষ্টানরা কি মুসলমানদের কখনো নিরাপত্তা দেবে?

০৪. ইব্রাহীম (আ.) নিজ পিতাকে বলেন, হে পিতা ইবলিশের ইবাদত করো না। নিশ্চয় ইবলিশ নির্দেশ অমান্যকারী। (মরিয়ম: ৪৪)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: ইবলিশের ইবাদত মানে হলো ইবলিশের অনুসরণ করা। বর্তমানে যারা আল্লাহর আইনের বিপরীতে গিয়ে কাফেরদের ধর্মনিরপেক্ষ আইন গ্রহন করেছে তারাই ইবলিশের ইবাদত কারি।

০৫. নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা ইবলিশের ভাই। আল্লাহর প্রতি ইবলিশ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (বনী ইসরাঈল: ২৭)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: যারা পুঁজি করে আর ভোগ করে তারা অপব্যয়কারী। নিজের প্রয়োজন নেই জেনেও বিলাসবহুল দ্রব্য ও ঋণের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনে। অর্থাৎ, যখন আল্লাহর আইন অমান্য করে মানুষ বিলাসিতায় ব্যয় করে। তখন মানুষ ইবলিশের ভাই হিসেবে গণ্য হয়। অথচ আল্লাহ এই সম্পদ তাকে দিয়েছেন আর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

০৬. মুসলমানদের একটি মুনাফিক দলকে ইবলিশ বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর ইবাদত ভুলিয়ে দিয়েছে। বশীভূত মুনাফিক মুসলমান দলই ইবলিশের দল। সাবধান, ইবলিশের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (মুজাদালাহ্: ১৯)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: সোশ্যাল মিডিয়ার নেশা, ২৪/৭ বিনোদন, এবং অর্থ উপার্জনের জন্য অবিরাম দৌড়— এই সবকিছু মুসলমানদের এমনভাবে ব্যস্ত রাখে যে মুসলমান সলাত, কোরআন তিলাওয়াত, যিকিরের কথা ভুলে যায়। যেই সকল মুসলমান আল্লাহর ইবাদত ও আইন ভুলে যায়, তারাই ইবলিশের বশীভূত দল।

০৭. আল্লাহর ইবাদতকারীদের বলে দিন— ইবাদতকারীরা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। ইবলিশ ইবাদতকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় ইবলিশ মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বনী ইসরাঈল: ৫৩)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: সোশ্যাল মিডিয়া বা আলোচনার প্ল্যাটফর্মে পারস্পরকে বিদ্বেষপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। ইবলিশ তুচ্ছ বিষয়ে কথা কাটাকাটি, গুজব ছড়ানো বা রাজনৈতিক বিভেদকে উসকে দিয়ে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে। যাতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাফেরদের রচিত আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে।

০৮. ইবলিশ মানুষের মধ্যে অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি মানুষ বোঝেনি? (ইয়াসীন: ৬২)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এই প্রয়োগটি হলো— বিভিন্ন যুগে ইবলিশ নানা মতবাদ ও চিন্তাগত বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। যেমন— নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা, কাদিয়ানি, জামাত, বস্তুবাদী। বারংবার মানুষ এসব ভ্রান্তির শিকার হচ্ছে।

০৯. আল্লাহর পথে মুসলমানরা জিহাদ করে। পক্ষান্তরে ইবলিশের পক্ষে কাফেররা লড়াই করে। সুতরাং মুসলমানরা যুদ্ধ করুক কাফেরদের বিরুদ্ধে; নিশ্চয়ই ইবলিশের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (আন-নিসা: ৭৬)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে ইবলিশের পক্ষে লড়াই বলতে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে কাফেরদের রচিত আইন ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাকে বোঝায়। বর্তমানে ইবলিশ কাফেরদের প্ররোচিত করে এমন এক বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে, যা সরাসরি আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অর্থাৎ, আল্লাহর আইন অমান্য করে যারা কাফেরদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সুরক্ষা দিবে তারা আসলে ইবলিশের সৈনিক, যেমন- আর্মি, বিজিবি। তাই মুসলিমদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে তথাকথিত শক্তির মূল অত্যন্ত দুর্বল।

১০. ইবলিশের মুনাফিক মুসলমান বন্ধুরা সৎপথে বাধা দেয়, আর মুনাফিকরা মনে করে যে তারা সৎপথে আছে। (আজ-জুখরুফ: ৩৭)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে ইবলিশের মুনাফিক বন্ধু বলতে মূলত সেই ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইবলিশের আইন বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে ইবলিশের মুনাফিক বন্ধুরা সাধারণ মুসলমানদের এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যাতে তারা কাফেরদের আইন মানে। ইবলিশ মুনাফিক মুসলমানদের এমনভাবে প্ররোচিত করে যে মুনাফিকরা মনে করে খ্রিষ্টান আইন মানার পরেও তারা সঠিক পথে আছে।

১১. কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য ইবলিশের অনুসরণ করে। (আল-হাজ্জ: ৩)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক বলতে আল্লাহর আইন এবং তাঁর ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করাকে বোঝায়। বর্তমানে ইবলিশ মানুষকে তথাকথিত যুক্তি ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে কাফেরদের রচিত আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে প্ররোচিত করে। যারা আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তারা আসলে কাফেরদের গোলকধাঁধায় নিজেদের হারিয়ে ফেলে অবাধ্য ইবলিশেরই অন্ধ অনুসরণ করছে।

১২. হে মুসলমানগণ, তোমরা ইবলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে মুসলমান ইবলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো ইবলিশ নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। (আন-নূর: ২১)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে ইবলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ বলতে ধাপে ধাপে আল্লাহর আইন থেকে বিচ্যুত হয়ে কাফেরদের আইন গ্রহণ করাকে বোঝায়। বর্তমানে ইবলিশ সরাসরি কাউকে ইসলাম ছাড়তে বলে না, বরং ধীরে ধীরে কাফেরদের রচিত আইন, অশ্লীল বিনোদন এবং পারিবারিক রীতিনীতিকে আধুনিকতা হিসেবে গ্রহণ করতে প্ররোচিত করে। যখন কোন মানুষ ইবলিশের এই ছোট ছোট ধাপগুলো অনুসরণ করা শুরু করে, তখন ইবলিশ মুসলমানদের দিয়ে বড় বড় নির্লজ্জতা এবং মন্দ কাজ করিয়ে নেয়। মুসলমানরা আল্লাহর সীমানা একবার অতিক্রম করলেই ইবলিশের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে যায়।

১৩. পক্ষান্তরে যারা কাফের ও মুনাফিক তারা ইবলিশের ভাই, ইবলিশ তার ভাইকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, অতঃপর জাহান্নামের জন্য কোন কমতি রাখে না। (আল-আরাফ: ২০২)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে ইবলিশের ভাই বলতে সেই কাফের ও মুনাফিকদের বোঝানো হয়েছে যারা ইবলিশের আইন বাস্তবায়নে তার সহযোগী হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে ইবলিশ তার মানুষ ভাইদের মাধ্যমে সমাজকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করে। যারা আল্লাহর আইনের বদলে কাফেরদের আইন গ্রহণ করে, ইবলিশ তাদের জ্ঞান ও বিবেক এমনভাবে অন্ধ করে দেয় যে তারা আর ফিরে আসার সুযোগ পায় না এবং দিন দিন তাদের ভুল বাড়তেই থাকে।

১৪. মানুষের শত্রু ইবলিশ; অতএব ইবলিশকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। ইবলিশ কাফের ও মুনাফিকদের আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামি হয়। (ফাতির: ০৬)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: এখানে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো বলতে ইবলিশের কোন ব্যবস্থাকে আপস না করে প্রত্যাখ্যান করাকে বোঝায়, যেমন- লালনগীতি, পহেলা বৈশাখ, বাউলগীতি। বর্তমানে ইবলিশ মানুষকে সরাসরি জাহান্নামের দিকে ডাকে না, বরং সে কাফেরদের রচিত আইন, তথাকথিত প্রগতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের চাকচিক্য দেখিয়ে তার দলবল ভারী করে। যারা আল্লাহর আইন ছেড়ে খ্রিষ্টানদের আইন গ্রহণ করেছে, তারা মূলত ইবলিশের সেই আহ্বানেই সাড়া দিচ্ছে।

১৫. মানুষ কি ইবলিশ ও তার বংশধরদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করছে? অথচ মানুষের শত্রু ইবলিশ। কাফেরদের এই বিনিময় কতই না মন্দ! (আল-কাহাফ: ৫০)
ইবলিশের বর্তমান কুমন্ত্রণা: বর্তমান যুগে ইবলিশের বংশধর বলতে শুধু জিন শয়তান নয়, বরং সেই সব মতবাদ ও সংস্থাকে বোঝায় যারা বংশপরম্পরায় আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে। আল্লাহর আইন ছেড়ে দিয়ে মানুষ যখন খ্রিষ্টানদের আইনকে নিজেদের সংশোধনের মাধ্যম মনে করে, তখন মানুষ আসলে ইবলিশকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে।

ইবলিশের মানব অনুসারী (ইহুদী ও খ্রিষ্টান)

জাতিসংঘ কাকে বলে?
সেই সকল দেশ খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক আইন অনুসরণ করে নিজেদের দেশের আইন তৈরি করেছে তাদের সম্মিলিত কেন্দ্রকে জাতিসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস বলে। জাতিসংঘের প্রধান কাজ হলো বর্তমানে খ্রিষ্টানরা গণতন্ত্রের আড়ালে যেসব অপকর্ম পরিচালনা করে, সেগুলোকে মানুষের সামনে গ্রহণযোগ্য ও সুন্দর করে উপস্থাপন করা। যেমন- আল-আকসা ইস্যু, মুসলিম জাতিকে যখন ইহুদীরা নির্বিচারে হত্যা করে তখন খ্রিষ্টানরা ইহুদীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং সব ধরনের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র সরবরাহ করে। এমনকি খ্রিষ্টানদের দেশ আমেরিকা একতরফাভাবে তেল আবিবকে ইহুদীদের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। খ্রিষ্টানদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও ইহুদীদের প্রভাব এতটাই যে, নির্বাচনের সময় যে দল ইহুদীদের বেশি নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে, তারাই ক্ষমতায় আসবে। প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ মূলত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সংঘ। গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায় জাতিসংঘ সরাসরি ইবলিশের অপকর্মসমূহ বাস্তবায়ন করে। ইহুদীদের ধ্বংস নিশ্চিত করতে হলে প্রথমে মুসলমানদের ইহুদীদের মূল চালিকাশক্তি খ্রিষ্টানদেরকে ধ্বংস করতে হবে।

জাতিসংঘের মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা কী কী কাজ করে:
০১. নারীদের নির্লজ্জতা শিক্ষা দেয় পোশাকের স্বাধীনতা দিয়ে।
০২. নাটক-সিনেমাকে মডেল বলে নারীদের লজ্জাস্থান দেখানোর স্বাধীনতা দেয়।
০৩. নারীর অধিকার নাম দিয়ে কর্মস্থলে নারীর সমান উপস্থিতি নিশ্চিত করে।
০৪. উন্নয়নের নামে সুদে ইসরাইলি ব্যাংক থেকে অর্থ নিতে বাধ্য করে।
০৫. আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে খ্রিষ্টানদের আইন বাস্তবায়ন করে।
০৬. নির্বাচন পদ্ধতি দিয়ে মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে।
০৭. শান্তি মিশন নাম দিয়ে এক মুসলিম ভাইকে দিয়ে অন্য মুসলিম ভাইকে হত্যা করায়।
০৮. নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।
০৯. ধর্ম যার যার, উৎসব সবার বলে সকল মুসলমানকে ইবলিশের পূজা করায়।
১০. খ্রিষ্টানদের সংবিধান নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়ন করে।
১১. খাজনাভিত্তিক খ্রিষ্টান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করে।
১২. শান্তি মিশনের নামে মুসলিম দেশের সম্পদ লুট করতে সাহায্য করে।
১৩. সুদভিত্তিক ব্যবসায়িক নীতি পরিচালনা করে।

ইবলিশের অপকর্মসমূহের স্থানে খ্রিষ্টান হলে তার বর্তমান রূপ কী হবে:
১. খ্রিষ্টানরা পোশাকের স্বাধীনতার নামে মুসলমানদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করতে সাহায্য করে, যা মুসলমানদের নিকট গোপন। আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়ে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে শুধু নারীর আরাধনা করায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে অবাধ্য ব্যক্তির কথা মান্য করতে বাধ্য করায়। অবাধ্য ব্যক্তিরা নির্বাচনী ইশতেহার দিয়ে শপথ করে বলল, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন। হে মুসলমান জাতি, খ্রিষ্টানদের কথা মান্য করো না, নিশ্চয় খ্রিষ্টানরা আল্লাহর অবাধ্য। নিশ্চয় খ্রিষ্টানরা অপব্যয় শিক্ষা দেয়। আল্লাহর প্রতি খ্রিষ্টানরা অতিশয় অকৃতজ্ঞ। মুসলমানদের কিছু মুনাফিক দলকে খ্রিষ্টানরা নির্বাচনের মাধ্যমে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর আইন ভুলিয়ে দিয়েছে। সাবধান, খ্রিষ্টানদের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের অনেক মুনাফিক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি মুসলমানরা বুঝে না? নির্বাচন দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টানরা সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু খ্রিষ্টানরা।

২. যারা মুমিন তারা আল্লাহর জন্য জিহাদ করে। অন্যদিকে যারা শান্তি মিশনে যায় তারা খ্রিষ্টানদের পক্ষে লড়াই করে। সুতরাং মুসলমানরা জিহাদ করতে থাকো খ্রিষ্টানদের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, দেখবে খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। মুসলমানদেরকে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে খ্রিষ্টানরা বাধা দান করে, আর মুসলমান মনে করে যে খ্রিষ্টানরা সৎপথে রয়েছে। কতক মুনাফিক দল অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করে। হে মুমিনগণ, তোমরা খ্রিষ্টানদের পথ অনুসরণ করো না। যে কেউ খ্রিষ্টানদের পথ অনুসরণ করবে, তখন তো খ্রিষ্টানরা নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। পক্ষান্তরে যারা খ্রিষ্টানদের-ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত ইবলিশের পথে নিয়ে যায়, অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। মুসলমানদের শত্রু খ্রিষ্টানরা; অতএব খ্রিষ্টানদেরকে শত্রু রূপেই গ্রহণ করতে হবে। খ্রিষ্টানরা তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা ইবলিশের অনুসারি হয়।

৩. খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং মুসলমানদেরকে আশ্বাস দেয়। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা নয়। হে মানব জাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ করো, আর খ্রিষ্টানদের কথা শুনো না। নিঃসন্দেহে মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু খ্রিষ্টানরা।

ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা—ইবলিশের হয়ে কাজ করে অর্থাৎ ইবলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। খ্রিষ্টানরা কীভাবে গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে মুসলমানদেরকে ইবলিশের অনুসারী করছে, তা জানতে হবে। খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বের করতে পারলে মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে।

মুসলমান হয়েও যারা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসারী (গণতন্ত্র)

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের নাম নয়, বরং মুসলমানদের একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইনসাফের মানদণ্ড। যখন মুসলমানরা আল্লাহর নাজিলকৃত আইন ছেড়ে মানবরচিত আইন গ্রহণ করে, তখন মুসলমানরা কার্যত আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে ইবলিশের আইন মেনে চলে। আল-কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী—যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, যারা আল্লাহর সাথে শিরকের ন্যায় চরম জুলুমে লিপ্ত হয় এবং যারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হয়, তারাই প্রকৃত জাহান্নামী। বস্তুত, সৃষ্টি যাঁর—নির্দেশ ও আইন দেওয়ার একমাত্র অধিকার তাঁর। সুতরাং, আল্লাহর আইন বর্জন করে মুনাফিক মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের পথে চলে এবং সুদ, মদ ও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয়, আল্লাহ আইন ত্যাগ করে মুনাফিকরা মূলত শয়তানের পথ অনুসরণ করে। মুসলিম হওয়ার দাবি হলো—যাবতীয় মানবরচিত আইন ত্যাগ করে সর্বস্তরে আল্লাহর আইনকে শিরোধার্য করা। (আল মায়িদাহ:৪৪, লোকমান:১৩, আল-বাকারা:২৫৪, আল আরাফ:৫৪, আল মায়িদাহ:৫০)

খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদের বর্তমান রূপ: বর্তমানে যারা মুসলমান দাবি করেও আল্লাহর আইনের পরিবর্তে খ্রিষ্টানদের আইনকে প্রাধান্য দিচ্ছে, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়।

১. **ঈমানের মাফকাঠি**: যখন বর্তমান মুসলমানদের বলা হয়, সাহাবারা যেভাবে মুসলমান হয়েছে, তোমরাও সেভাবে মুসলমান হও, তখন মুনাফিকরা বলে, নির্বোধ সাহাবারা যেভাবে মুসলমানরা হয়েছে, আমরাও কি সেভাবে মুসলমানরা হবো? (আল-বাকারা: ১৩)

২. **বিচারের মানদণ্ড**: আল্লাহ যা আইন দিয়েছেন, তা দিয়ে যেই সকল মুসলমান বিচার করে না, বরং খ্রিষ্টানদের আইনের মাধ্যমে বিচার করে, তাদেরকে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে কাফের বলেছেন। (আল-মায়িদাহ: ৪৪)

৩. **পাপাচারের বৈধতা**: যে দেশের জনগণ যিনা, সুদ, মদ এবং নারীর অশ্লীলতাকে স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা দেয়, তারা সরাসরি আল্লাহর আইন ত্যাগ করে। (বনী ইসরাঈল: ৩২, আল-বাকারা: ২৭৫-২৭৯, আল-মায়িদাহ: ৯০-৯১, আল-আরাফ: ৩৩, আন-নূর: ১৯, আল-মায়িদাহ: ৪৪)

৪. **হুকুমের অংশীদারিত্ব**: সৃষ্টি যার, হুকুম ও আইন দেওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁর। যারা আল্লাহর আইনের সমান্তরালে খ্রিষ্টান আইন মানে, তারা মূলত আল্লাহকে বাদ দিয়ে খ্রিষ্টানদের রব হিসেবে গ্রহণ করে। (আল আরাফ: ৫৪)

৫. **আল্লহার আইন বাস্তবায়ন**: মুসলমানরা কি সেই মুনাফিক লোকদের দেখেনি, যারা বলে, মুসলমানরা যেন এখন যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে রাখে এবং মুসলমানরা যাতে নামাজ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে? (আন-নিসা: ৭৭)

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সঠিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সহ পাঠিয়েছেন, যাবতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যদিও মূর্তিপূজারিগণ অপছন্দ করে। আল্লাহর রাসূল আল্লাহ কর্তৃক রাষ্ট্রব্যবস্থা মদিনাতে ও মক্কাতে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সাহাবীগণ বিশ্বব্যাপী তা পরিচালনা করেছেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রব্যবস্থার এই ধারাবাহিকতা দীর্ঘকাল চলার পর উম্মাহর অনৈক্য এবং কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে। মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পরই মুসলমান দেশগুলোতে খ্রিষ্টানদের আইন গেড়ে বসে। (আল ইমরান:১৯, আত তাওবাহ:৩৩)

সভ্যতার সূত্র অনুসারে মানবজাতিকে পরিচালনার পদ্ধতি (পার্থক্যসমূহ)

সভ্যতার আলোচনায় আমরা বলছিলাম, আপনি সভ্যতার বারোটি -১২ মৌলিক বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করলে দেশের মানুষ আপনার অনুসারী হয়ে যাবে; অর্থাৎ আপনি তাদের পরিচালক হবেন। মুসলমানদের সংবিধান আল-কোরআন। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য আল-কোরআনে সভ্যতার বারোটি-১২ মৌলিক বিষয়ের উপর আইন দিয়েছেন। অন্যদিকে, খ্রিষ্টানদের সংবিধান নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের জন্য সভ্যতার বারোটি-১২ মৌলিক বিষয়ের উপর আইন দিয়েছে।

সভ্যতার বারোটি -১২ মৌলিক বিষয় হলো যথাক্রমে:
১. সরকার ২. বিচার ৩. ব্যবসা-বাণিজ্য ৪. শিক্ষা ৫. বিবাহ ৬. পরিবার ৭. মূল্যবোধ ৮. চিকিৎসা ৯. সংস্কৃতি ১০. যোগাযোগ ১১. লিখন পদ্ধতি এবং ১২. সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন।

সরকার বা শাসক: সভ্যতার আইনকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ও নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাকে শাসনতন্ত্র বলে। শাসনতন্ত্রের আইন অনুসারে জাতিকে পরিচালনা করার কেন্দ্রকে সরকার বা শাসক বলে। এই সরকার ব্যবস্থার যাবতীয় গঠন নীতি নিম্নে দেখানো হলো। (আন-নিসা: ৫৯)

সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. রাষ্ট্র ব্যবস্থার উৎস	স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। মুসলমানদের আইন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য নতুন ও ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ নিজেই এর আইনদাতা হওয়ায় এতে কোন ভূল বা দুর্বলতা নেই। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত এই প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থা মুসলমান দের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্ভুল রাষ্ট্রব্যবস্থা।	পুরাতন রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি নড়বড়ে হওয়ার কারণে অকেজো ইঞ্জিনের মতো বারবার সংস্কার করতে হয়। গণতন্ত্রকে সংস্কার করে রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে দেশের মধ্যে বড় ধরনের রক্তপাত হয়। যেমন—পিলখানা, শাপলা চত্বর, জুলাই হত্যাকাণ্ড। সংস্কার করে কখনোই স্থায়ী শান্তি আনা যায় না।
২. সংবিধান	রাসূল (সা.) মক্কায় ১৩ বছর দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর তিনি মদিনায় হিজরত করেন। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানের আইন বা আয়াত নাযিল হতে শুরু করে। সেই আইনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্র গঠন করেন এবং তখন থেকেই আল-কোরআন মদিনা রাষ্ট্রের মুসলমানদের জন্য সংবিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।	মদিনা রাষ্ট্রের পূর্বে রোমানরা ছিল আধুনিক। কিন্তু রোমানদের আইন ছিল জুলুম আর নির্লজ্জতায় ভরা। যখন মদিনা রাষ্ট্র চালু হয়, তখন মদিনা রাষ্ট্রের সৌন্দর্য দেখে দলে দলে মানুষ তা গ্রহণ করে। বর্তমান খ্রিষ্টানরা সেই পুরাতন খ্রিষ্টান রোমান আইনগুলো নতুন করে গণতান্ত্রিক সংবিধান বলে চালিয়ে দেয়। আর মানুষের কাছে প্রচার করে সংসদীয় আইন বলে।
৩. রাষ্ট্রীয় কার্যালয়	রাসূল (সা.)-এর সময় মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান কার্যালয় ছিল মসজিদে নববী। সেখানে সকলে আসতেন তাদের সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে এবং সমাধান নিয়ে যেতেন। এই ধারাবাহিকতায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মসজিদকে কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে তার আধুনিক রূপ হবে মডেল মসজিদগুলো, যার বিশাল বারান্দায় যাবতীয় সেবা প্রদান করবে। এর ফলে সেবার জন্য পৃথক কার্যালয়ের প্রয়োজন হবে না।	কাফেররা মসজিদে প্রবেশ করা পছন্দ করে না। যার কারণে খ্রিষ্টানরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক কার্যালয় তৈরি করে। বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় সেনানিবাস, আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয় হবে—তার সবকিছুই ব্রিটিশ নকশায় তৈরি করা হয়। খ্রিষ্টানরা বাংলাদেশে মুসলমানদের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে সংসদ ভবন তৈরি করেছে। এই সংসদ ভবন থেকে মুসলমানদের জন্য খ্রিষ্টান আইন পাস করা হয়।
৪. রাষ্ট্র পরিচালনা	হজরত ওমর (রা.)-এর আমলে রাষ্ট্র কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক ছিল না, বরং তা তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মসজিদে নববীর পাশেই ছিল আহলুস সুফফাহ-দের শিক্ষা কেন্দ্র। মসজিদে নববীতে কোন রাষ্ট্রীয় সেবা বা বিচারকার্য পরিচালিত হলে সুফফাবাসী সেখানে উপস্থিত থাকতেন। সেই কাঠামোর আধুনিক রূপ হবে কয়েকটি মসজিদ নিয়ে একটি মারকাজ মসজিদ সাথে মাদরাসা। মারকাজের সকল কার্যক্রম আহলুস সুফফাহ-দের উত্তরসূরি হিসেবে মাদরাসা পর্যবেক্ষণ করবে। পাশাপাশি সচেতন মুমিনদের একটি দল তা প্রত্যক্ষ করবে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে পক্ষপাতিত্ব ও ভুল সিদ্ধান্তের অবসান ঘটবে।	মুসলমানদের মসজিদভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতির বিপরীতে খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দেশের ক্ষমতা কেবল রাজধানী কেন্দ্রিক কিছু প্রশাসনিক ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ রাখে। খ্রিষ্টানদের নিয়মে সাধারণ মানুষের জন্য কোন সরাসরি পর্যবেক্ষণ দল বা আহলুস সুফফাহ-এর মতো নৈতিক তদারকি প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতার পরিবর্তে পক্ষপাতিত্ব ও দলীয় প্রাধান্য পায়। TIB ও CPD প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা তৈরি করে গড়ে প্রতি বছর ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খ্রিষ্টানদের দেশে পাচার করা হয়, যা দিয়ে প্রতি বছর ৩টি থেকে ৪টি পদ্মা সেতু করা সম্ভব হতো।

সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. প্রশাসনিক কাঠামো	রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী মুসলমানদের প্রাথমিক ফয়সালা মসজিদের মিম্বার থেকেই হয়। মুসলমানদের প্রশাসনিক কাঠামো অনেকটা তাবলিগ জামাতের ন্যায়। যেমন—কিছু মসজিদ নিয়ে একটি মার্কাজ মসজিদ, আবার কিছু মার্কাজ মসজিদ নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ। মুসলমানদের সেবা মসজিদ থেকে হওয়ার কারণে ইসলামে কোন দুর্নীতি হয় না। যার ফলে মানুষকে সেবার জন্য মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরতে হয় না। মসজিদ কেন্দ্রিক সেবার কারণে মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ইসলামকে শান্তি হিসেবে পাঠিয়েছেন।	খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো (মেম্বার, চেয়ারম্যান, ইউএনও, ডিসি, কমিশনার, সচিব এবং মন্ত্রী পর্যন্ত) এক বিশাল দুর্নীতির জাল তৈরি করে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্মানী মিলিয়ে প্রতি বছর ১.২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়। এই বিশাল অংকের অর্থ দিয়ে ৪টি পদ্মা সেতু করা যাবে। অথচ এর অর্ধেক অর্থ দিয়েই একটি ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। খ্রিষ্টানরা মূলত প্রশাসন দিয়ে মুসলমানকে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষের তৈরি আইনের অধীনস্থ করে। খ্রিষ্টানদের পদ্ধতি মানুষের জীবনকে জটিল করে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
৬. দল বা সংগঠন	মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুযায়ী মুসলমানদের কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। ইসলাম মুসলমানদের জন্য সরাসরি সরকার গঠন করে। মুসলমানদের প্রথম চার খলিফা—হযরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), উসমান (রা.) এবং আলী (রা.)—তাঁদের কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, তাঁরা ছিলেন সরাসরি মুসলমানদের শাসক।	খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী মুসলমান দের মধ্যে যত ইচ্ছা দল গঠন করা যায়। এই বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণে মুসলমানদের মধ্যে চরম মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টানরা মূলত দলাদলির মাধ্যমেই জনগণকে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে এক দলের সাথে অন্য দলের মারামারি ও সংঘাত দেখা যায়।
৭. নির্বাচন প্রক্রিয়া	মসজিদে নববী ছিল রাসূল (সা.)-এর মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান কার্যালয়। মসজিদে নববী থেকেই আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সেই আদর্শ অনুসরণ করেই মুসলমানদের নিয়ম হয়—সাধারণ মুসল্লিদের উপস্থিতিতে দেশের জন্য যোগ্য নেতা নির্বাচন মসজিদেই সম্পন্ন হবে। যেহেতু সমাজের মানুষ একে অপরকে খুব ভালো করে চেনেন, তাই কোন অপরাধী ব্যক্তি চাইলেই সমাজের নেতা হতে পারবে না। বাংলাদেশে মসজিদ-ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতিটি বর্তমানে তাবলিগ জামাতে প্রচলিত আছে।	মুসলমানদের নিয়মে যেখানে মসজিদের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, সেখানে খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র ঠিক তার উল্টোভাবে কাজ করে। খ্রিষ্টানদের নিয়মে দেশের মধ্যে কয়েকটি দল থাকতে হবে। সেই দল থেকে প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য ভোট হবে। যিনি ভোট বেশি পাবেন তিনি দেশের নেতা হবেন। খ্রিষ্টানদের ভোটের কারণে কিছু লোকের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়, আর কিছু লোকের হয় না। খ্রিষ্টানরা নির্বাচনে মানুষ পরহেজগারিতা ও যোগ্যতার চেয়ে তার সংখ্যাকে বড় করে দেখে।
৮. প্রার্থী যাচাই	রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর মুমিনদের সর্বসম্মতিক্রমে আবু বকর (রা.)-কে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। তখন থেকে মুসলমানদের জন্য নেতা নির্বাচনের ধারা সূচনা হয়। আবু বকর (রা.) হন মুসলমানদের যোগ্য নেতা নির্বাচনের মাপকাঠি। তাঁর ওপর ভিত্তি করে মুসলমানদের নিয়ম হয় যে, একজন নেতা ধর্মপ্রাণ মুসলিম বিবাহিত পুরুষ হবেন, যিনি আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেন এবং সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করেন। পাশাপাশি আল-কোরআন ও হাদিসের ওপর তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।	আমরা বাংলাদেশে প্রায়ই গণতান্ত্রিক নির্বাচন দেখি। বাংলাদেশ যেহেতু মুসলিম প্রধান দেশ, এই দেশের প্রার্থী নির্বাচন ইসলাম অনুসারে হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র খ্রিষ্টানদের হওয়ার কারণে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া খ্রিষ্টানদের নিয়ম অনুসারে হয়। মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের নিয়ম থাকার কারণে মুসলমানদের ভেতরে যারা আল্লাহর আইন মানে না, তারা দেশের নেতা হওয়ার প্রার্থী হতে পারে। যেমন—সুদখোর, চাঁদাবাজ, মদখোর ও যিনাকারীরা দেখবেন নেতা হয়। খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রার্থীর চরিত্র ও আমল দেখা হয় না।
৯. নেতার পদত্যাগ	খলিফা ওমর (রা.)-এর সময় হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এবং হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.)-এর মতো মহান সাহাবীদের আচরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামিক নিয়মে পদত্যাগ একটি নিয়মিত সংস্কৃতি। ইসলামিক নীতি অনুযায়ী একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকেন যদি: (১) তিনি কোন ফরজ বিধান অমান্য করেন; (২) আমিরুল মুমিনিন তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন; (৩) বয়স অত্যধিক হয়ে যায়; (৪) শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন; অথবা (৫) মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। ইসলামিক রাষ্ট্রে পদের মোহের চেয়ে আমানত রক্ষা করা হলো অনেক বড় ইবাদত।	খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার বা মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যক্তিরা জনগণের চরম অনাস্থা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চান না। বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বল প্রয়োগ করেন এবং পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানকে দমন করার চেষ্টা করেন। যার ভয়াবহ রূপ আমরা নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ও জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেখেছি। যেখানে ক্ষমতা ধরে রাখতে শত শত মুসলমানের প্রাণ কেড়ে নিতেও সরকার দ্বিধা করেননি। মুসলমানকে হত্যা করে টিকে থাকা মূলত পদের প্রতি লোভ এবং পরকালীন জবাবদিহিতার অভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। খ্রিষ্টান আইনে মুসলমান কখনো শান্তি পাবে না।

সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১০. রাষ্ট্রীয় আয়	রাসূল (সা.)-এর সময় মদিনা রাষ্ট্রের ব্যবসানীতি ছিল সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে। মদিনা রাষ্ট্রে যাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, গনিমত, সদকা, দান এবং খনিজ সম্পদ (যেমন- লবণ খনি) থেকে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যয় করত। এক কথায় বলা যায়, সম্পদশালীদের থেকে অর্থ নিয়ে দরিদ্রদের কল্যাণে ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হতো। মদিনা রাষ্ট্র জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করত। যেমন -বর্তমান সময়ে এক প্যাকেট লবণ কিনলে গরিব যে পরিমাণ খাজনা দেয়, ধনীও ঠিক সেই পরিমাণ খাজনা দেয়; মদিনা রাষ্ট্রে এমন জুলুমের নিয়ম ছিলনা।	বর্তমানে খ্রিষ্টান নিয়ম অনুসারে সরকার দেশ পরিচালনার জন্য জনগণের আয় থেকে খাজনা নেয়। আমরা দৈনিক যেসব প্যাকেটজাত পণ্য কিনি, তা থেকেও সরকার খাজনা আদায় করে। এছাড়া পাসপোর্ট ফি, বিবাহ নিবন্ধন, ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি, জন্ম নিবন্ধন ফি কিংবা ট্রাফিক আইন অমান্য করলে যে জরিমানা করা হয়—তা সরাসরি সরকারি খাজনা হিসেবে গণ্য হয়। জমি কেনাবেচা ও নামজারি থেকেও খাজনা গ্রহণ করা হয়। ব্যাংক, রেলওয়ে, বিমান, বিদ্যুৎ, ওয়াসা, তেল, গ্যাস, কয়লা এমনকি বাড়ি ও গাড়ি থেকেও সরকার বিভিন্নভাবে খাজনা আদায় করে।
১১. আন্দলন	মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থায় আন্দোলন মানে হলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। ইসলামিক আন্দোলনের মূল ভিত্তি হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামিতে ফিরিয়ে আনা। ইসলামে জ্বালাও-পোড়াও বা সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতি করার কোন অবকাশ নেই। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী, আন্দোলন একটি দাওয়াহ ও সংস্কারমূলক প্রক্রিয়া, যা মানুষকে ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচিয়ে কল্যাণের পথে ডাকে। ইসলামিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়, বরং ইনসাফ কায়েম করা।	খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আন্দোলনের নামে মানুষ দেখে নৈরাজ্য, ভাঙচুর এবং হরতাল। বর্তমানে বাংলা দেশে এক রাজনৈতিক দল অন্য দলকে ক্ষমতা থেকে নামানোর জন্য সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে তারা জনগণকে রাজপথে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, যার ফলে জুলাই অভ্যুত্থানের মতো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে এবং শত শত প্রাণ অকালে ঝরে যায়। খ্রিষ্টানদের আন্দোলনগুলো মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলকেন্দ্রিক স্বার্থ হাসিলের জন্য হয়, যেখানে পরকালীন মুক্তি বা সাধারণ মানুষের দীর্ঘস্থায়ী শান্তির কোন লক্ষ্য থাকে না।
১২. নির্বাচনী ব্যয়	মুসলমানরা দল গঠনের মাধ্যমে সরকার নির্বাচন করে না, যার কারণে নির্বাচন ব্যয় নেই। মুসলমানরা মসজিদ থেকে শুরু করে কয়েক ধাপের কঠোর যাচাই-বাছাইয়ের পর মুমিনদের দৃষ্টিতে যিনি সবচেয়ে বেশী পরহেজগার, তাঁকেই শূরা সদস্য হিসেবে মনোনীত করে। পরবর্তীতে মনোনীত যোগ্য শূরা সদস্যদের মধ্য থেকেই সরকার গঠন ও মন্ত্রী নির্বাচন করা হয়।	খ্রিষ্টানদের নিয়মে নির্বাচন করতে প্রতিবার ব্যয় হয় ২,৯৫৬ কোটি টাকা, যা দিয়ে প্রায় ১০-১২টি বড় আকারের আধুনিক ৫০০ শয্যার সরকারি হাসপাতাল তৈরি করা সম্ভব। নির্বাচনের জন্য এত বিশাল অর্থ জন গণের কাছ থেকে খাজনা হিসেবে করের মাধ্যমে নেয়। খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আল-কোরআনের সূরা ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতের বিপরীতে কাজ করে।
১৩. রাষ্ট্রীয় ব্যয়	মুমিনদের দিয়ে ইসলামক রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয়। মুমিনরা বিলাসিতা পছন্দ করে না; ওমর (রা.) প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মুমিনরা সবসময় সাধারণ মানুষের সাথে মিশে থাকে, যার কারণে তাদের আলাদা বাড়ি-গাড়ির প্রয়োজন হয় না। তারা সাধারণ পরিবহন ব্যবহার করে, যা রাষ্ট্রীয় ব্যয় অনেক কমিয়ে দেয়। ইসলামিক ব্যবস্থায় নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ সম্পদ অর্জন বা বিলাসী জীবন যাপনের সুযোগ পান না।	বর্তমান খ্রিষ্টানদের রাষ্ট্রব্যবস্থা টিকে আছে বিলাসিতার ওপর। বড় বড় কর্মকর্তাদের আলাদা বাড়ি-গাড়ি দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কর্মকর্তাদের এই বিলাসিতা তাদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাধারণ মানুষের সাথে কর্মকর্তাদের এই দূরত্বের কারণে ভ্যাটের-VAT নামে মানুষের থেকে আদায়কৃত খাজনা খ্রিষ্টানদের দেশে পাচার করতে দ্বিধাবোধ করে না।
১৪. অর্থ অপচয়	ইসলামিক রাষ্ট্রের মন্ত্রীরা জনগণের সম্পদকে পবিত্র আমানত মনে করেন। ইসলামিক মন্ত্রীরা বিলাসিতা বর্জন করে সাধারণ জীবন যাপন করেন, ফলে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য কোন অর্থ ব্যয় হয় না। মন্ত্রীদের এই মিতব্যয়িতা ও সততার কারণে রাষ্ট্রে সম্পদের অভাব হয় না। যেহেতু দেশে দুর্নীতি নেই, তাই জনগণের ওপর ভ্যাটের মতো পরোক্ষ করের কোন প্রয়োজন হয় না। যদি রাষ্ট্রীয় অর্থ পাচার ও অপচয় বন্ধ করা যায়, তবে বর্তমানে প্রচলিত ১৫% ভ্যাট কমিয়ে সরাসরি ০% এ নামিয়ে আনা সম্ভব। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতারা ক্ষমতাকে অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ মন্ত্রীরা আমেরিকা ও ইউরোপের মতো দেশগুলোতে পাচার করে। যাতে মন্ত্রীদের ও তার সন্তানদের বিলাসী জীবন নিশ্চিত হয়। GFI গবেষণা অনুযায়ী দেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৬৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি খ্রিষ্টানদেশে পাচার হয়। এই বিশাল অংকের অর্থ মূলত দেশের সাধারণ মানুষের ট্যাক্স এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের টাকা। মানুষের টাকা উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে পাচার করা হয়। মন্ত্রীদের পাচার করা অর্থ দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ৮০ থেকে ১০০টি পূর্ণাঙ্গ ৫০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করা সম্ভব।

সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১৫. ভূমির ব্যবহার	আল্লাহ নিজ কুদরতি ক্ষমতায় এই জমিনকে বিছিয়েছেন। পৃথিবীতে ভূমির পরিমাণ সীমিত, যার কারণে মুসলমানদের দায়িত্ব ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। মসজিদ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কার্যালয় হওয়ায় অতিরিক্ত ভবনের প্রয়োজন হয় না। ফলে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়া ইসলামিক সরকারের পক্ষে সহজ হয়। ইসলামিক এই সকল পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের মনে ভালোবাসার সৃষ্টি করে এবং সকলকে নামাজ ও রোজার আওতায় আনাও সহজ হয়।	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করতে বড় বড় অফিস-আদালতের প্রয়োজন হয়। কর্মীদের উচ্চ বিলাসী জীবনযাপনের জন্য বিলাসবহুল বাসাবাড়ি ও খেলার মাঠ তৈরি করা হয়। এই সকল কার্যক্রমের জন্য বর্তমান সরকার কয়েক লক্ষ একর জমি দখল করেছে। সরকারের দখলকৃত সকল জমি ও স্থাপনা যদি ভূমিহীনদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেশে কোন ভূমিহীন মানুষ থাকবে না। খ্রিষ্টানদের তৈরি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণেই আজ মুসলমানরা ভূমিহীন।
১৬. রাষ্ট্রের লক্ষ্য	আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের একমাত্র প্রভু। ইসলামিক সরকারের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁরই আইন জমিনে বাস্তবায়ন করা। সরকার কেবল আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহিতার জন্য কাজ করে। আল্লাহর আদেশ মানার পাশাপাশি ইসলামিক সরকারের কাজ হলো সমাজে সঠিক বিচার ও সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা।	বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষ্য হলো ইবলিশ ও দাজ্জালের আদর্শ বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশের সরকার আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইবলিশকে রব হিসাবে গ্রহণ করে। যার কারণে সরকারের প্রশাসন বিদেশিদের ভয় করে। যেমন– ইউরোপ, আমেরিকা ও জাতিসংঘ। বাংলাদেশ সরকার শুধু খ্রিষ্টানদের খুশি করতে কাজ করে এবং খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করে।

বিষয়	মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহ- (২১) টি	বর্তমান রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়সমূহ- (৪৩) টি
১৭. মন্ত্রণালয়	১. শূরা সদস্য নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২. প্রধান আমিরের কার্যালয় ৩. জনপ্রশাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪. আল্লাহর আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫. ফরজ ও সুন্নাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৭. অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৮. ভূমি ও সম্পদ বণ্টন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৯. প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০. ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১. ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১২. চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৩. আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৪. খাদ্য উৎপাদন ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৫. যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৬. মসজিদ শূরা ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭. পরিবেশ ও নদী বিষয়ক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৮. সংস্কৃতি ও সম্প্রচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১৯. পররাষ্ট্র-চুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০. স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২১. মুজাহিদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ২. প্রধান মন্ত্রির কার্যালয় ৩. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ৪. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৭. কৃষি মন্ত্রণালয় ৮. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৯. সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ১০. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১১. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৪. অর্থ মন্ত্রণালয় ১৫. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৬. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৭. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৮. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ১৯. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ২১. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ২২. আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২৫. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ২৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৭. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২৮. খাদ্য মন্ত্রণালয় ২৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩০. তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৩১. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৩২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৩৩. ভূমি মন্ত্রণালয় ৩৪. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ৩৫. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৩৬. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩৭. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৩৯. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ৪০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৪১. রেলপথ মন্ত্রণালয় ৪২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৪৩. শিল্প মন্ত্রণালয়

বিচার: দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান লেখা হয়। সেই সংবিধানকে বাস্তবায়ন করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। আর সেই আইন অমান্য করলে আপনি হয়ে যাবেন অপরাধী। আপনার অপরাধ নিশ্চিত করে শাস্তি দেওয়াকে বিচার বলে। (আল-আরাফ: ৫৪)

বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. আইনের উৎস	রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর নিকট বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক বিচারিক সমস্যা আসতে শুরু করে। তখন আল্লাহর নির্দেশনায় রাসূল (সা.) ওই সকল বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। সেই সময় থেকেই মুসলমানদের জন্য আল-কোরআন ও হাদিস আইনের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য হয়।	ব্রিটিশরা ঔপনিবেশিক যুগে মুসলমানদের বিচার করত খ্রিষ্টান আইন দিয়ে। আর খ্রিষ্টান সিভিল আইনের প্রধান উৎস ছিল পুরাতন রোমান আইনগুলো। তৎকালীন রোমানরা ছিল কাফের। বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। যার কারণে বাংলাদেশের বর্তমান আইনগুলো খ্রিষ্টানদের থেকে নেওয়া হয়।
২. আইনের ব্যবহার	রাসূল (সা.) কাফেরদের বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি কাফেরদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন অনুযায়ী বিচার করার সুযোগ দিতেন। তবে রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নে রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করতেন। রাসূল (সা.)-মের বিচারে কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। মুসলমানদের আইন কোন জাতিকে দমনের জন্য ব্যবহার করা হয় না; বরং সকলের জন্য সঠিক বিচার নিশ্চিত করে।	খ্রিষ্টানদের আইন সব সময় মুসলমানদের দমন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন—খ্রিষ্টান আইনের কারণে দোষী অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পায়, নির্দোষ শাস্তি পায়। অসহায় দিনের পর দিন আদালতে ঘোরে। জুলুমকারী মুক্তি পায়, প্রতিবাদকারীর ফাঁসি হয়। ইমাম হন সন্ত্রাসী, পতিতা হন ব্যবসায়ী। মুসলমান হন উগ্রবাদী, ব্যভিচারী হন সুশীল। আল্লাহর আইন লঙ্ঘনকারী হন বিচারক, আল্লাহর আইন মান্যকারী হন জঙ্গি।
৩. আইনে নিষিদ্ধ	মুসলমানদের আইন অনুযায়ী দেশের সকল নারীকে পর্দা করতে হয়। সম্পদে পুরুষের দুইয়ের এক অংশ পায় নারী। সুদব্যবস্থা, নাটক, সিনেমা, মদ্যপান, নারী দিয়ে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, প্রেম ও পরকীয়া—এইসব কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; যা সমাজে পবিত্রতা নিয়ে আসে।	বাংলাদেশে খ্রিষ্টান আইন সমূহ নারীর বেপর্দায় চলাফেরা, নারীর সমান অধিকার, সুদব্যবস্থা, নাটক, সিনেমা, মদ্যপান, নারীর বিজ্ঞাপন, প্রেম-পরকীয়াকে অনুমোদন প্রদান করে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে। খ্রিষ্টানদের এই সকল আইন যিনাকে সহজ করে দেয়।
৪. আইনের প্রভাব	আল্লাহর আইনের প্রভাবে মুসলমানের মনে সবসময় এই বিশ্বাস কাজ করে যে তার বিচার সরাসরি আল্লাহর আইন অনুযায়ী হচ্ছে। এর ফলে মানুষের ভেতরে এক ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও পরকালীন জবাবদিহি তার ভয় থাকে। এই ভয় মানুষকে গোপনে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখে। যখন মানুষ মনে করে বিচার হবে দ্রুত এবং সবার সামনে, তাই সে ইনসাফ পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে এবং সমাজের ওপর তার একটা গভীর আস্থা তৈরি হয়। আল্লাহর আইন মানুষের চিন্তায় পবিত্রতা আনে এবং মানুষকে একটি সুশৃঙ্খল ও পাপা চারমুক্ত জীবন যাপনে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে; যা সমাজে শান্তি বয়ে আনে।	বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিষ্টান আইনের প্রভাবে মুসলমান দের মনে বর্তমান আইন নিয়ে এক ধরনের ভীতি ও অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। মুসলমানরা যখন দেখে বর্তমান আইনে টাকা ও উকিলের মারপ্যাঁচে অপরাধ করে পার পাওয়া যায়, তখন ইনসাফ কমে যায় আর অপরাধী বারবার অপরাধ করার সাহস পায়। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রতার কারণে বিচারপ্রার্থীরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং তাদের মনে আইনের ওপর ক্ষোভ তৈরি হয়। খ্রিষ্টান আইনসমূহ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অনেক অনৈতিক কাজের সুযোগ দেয়। যা মানুষের চিন্তাচেতনা থেকে পরকালীন ভয় দূর করে এবং মানুষ কেবল দুনিয়াবি স্বার্থ ও ভোগবিলাসের পেছনে ছুটে।
৫. বিচারক	রাসূল (সা.)-এর পর যে ব্যক্তি আল-কোরআন ও হাদিসের ওপর বেশি জ্ঞানী ছিলেন তাকে বিচারক মানা হতো। মুসলমানদের মধ্যে মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ কোরআন ও হাদিসের ওপর বেশি জ্ঞানী। যার কারণে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বিচারের জন্য ইসলামিক সরকার মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণকে বিচারক (কাযী) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তারা বিচার করায় দুনিয়ার বিচার দুনিয়াতেই শেষ হয়।	বাংলাদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক আইন শেখার জন্য মুসলমানদেরকে খ্রিষ্টান দেশসমূহে গিয়ে পি.এইচ.ডি. করতে হয়। মূলত সংসদের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য যে সকল আইন পাস করা হয় তার অধিকাংশই খ্রিষ্টান আইন। আর খ্রিষ্টান আইন শিক্ষা গ্রহণ করে কিছু লোক মুসলমানদের বিচার করে। মুসলমানদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণভাবে খ্রিষ্টান আইন শিক্ষা গ্রহণ করে তারা প্রমাণস্বরূপ সাদা বাঁকানো পরচুলা পরে।

বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৬. বিচার প্রক্রিয়া	রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকেই মুসলমানরা মসজিদের বারান্দায় প্রকাশ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করত। মসজিদে নববীর পাশে ছিল আহলে সুফফার অবস্থান। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পরে মসজিদে নববীতে যেসব সেবা ও বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো তা দেখার জন্য আহলে সুফফার ছাত্ররা সেখানে উপস্থিত থাকত। বর্তমান সময়ে ওই বিচার প্রক্রিয়া বোঝার জন্য বলা যায়, তখন মসজিদে বিচার হতো এবং মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিচার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করত।	মধ্যযুগে খ্রিষ্টান রোমানরা নিজেদের আধুনিক মনে করত, ঠিক যেমন বর্তমান প্রেক্ষাপটে খ্রিষ্টানদের আমেরিকা মনে করে। মধ্যযুগে রোমানরা মুসলমান দের দমনের লক্ষ্যে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করত এবং সেই আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করত। রোমানরা বিচার করত বন্ধ কক্ষে, যার অনুসরণ করে বাংলাদেশে বিচারকরা বন্ধ কক্ষের ভেতরে বিচার করে। বন্ধ কক্ষে বিচার করার ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার প্রক্রিয়া দেখা সম্ভব হয় না।
৭. বিচারের উদ্দেশ্য	মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহর আইন দিয়ে মুসলমানরা বিচার করে। মুসলমানদের বিচার ব্যবস্থায় নির্যাতিতরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সুবিচার লাভ করে এবং বিচারের মাধ্যমে কাউকে অহেতুক আইনি হয়রানি করা হয় না। আল্লাহর আইন দিয়ে বিচারের উদ্দেশ্য শুধু শাসন করা নয় বরং আল্লাহর আইনের মাধ্যমে বিচার করে প্রত্যেককে দুনিয়াবি ইনসাফ দেওয়া। আল্লাহর আইন অনুসারে একজন মন্ত্রী যেমন সম্মানিত তেমনি একজন কৃষকও তেমন সম্মানিত। আল্লাহর আইন অনুসারে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ভর করে তার আমলের উপর।	বর্তমান বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের আইন দিয়ে বিচার করা হয়। মানুষ যখন মানুষের জন্য আইন ঠিক করে তখন এর উদ্দেশ্য হয় কিভাবে অপরাধ করে বাঁচা যায় তার পথ বের করা। বর্তমানে আপনি একটা মামলা করলেন, বিচারক কম হওয়ায় আপনাকে প্রতি মাসে আদালতে যেতে হয়। দেখা যায় আপনি সকল কাজ বন্ধ করে আদালতে গেলে তখন শুনলেন জজ সাহেব আজ আদালতে আসবেন না, তখন আপনাকে পরবর্তী মাসের তারিখ দেওয়া হয়। মূলত খ্রিষ্টান আইনের মাধ্যমে মানুষের গলায় রশি লাগিয়ে দেওয়া হয়, এই রশি দিয়ে তারা মানুষকে ঘুরায়।
৮. বিচার ব্যবস্থার খরচ	রাসূল (সা.)-এর যুগ থেকে মুসলমানদের বিচারকার্য মসজিদে সাধারণ মানুষের সামনে সরাসরি সম্পন্ন হতো, তাই এখানে কোন উকিল বা দালালের প্রয়োজন হয় না। উকিল না থাকার ফলে একজন সাধারণ মানুষকে মামলার পেছনে কোন প্রকার মাসিক খরচ বহন করতে হয় না। মুসলমানদের সম্পূর্ণ অধিকার বিনামূল্যে বিচার পাওয়া। মহান আল্লাহর ইবাদত মনে করে মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ মুসলমানদের বিচার করেন। কাযীগণ মসজিদকেন্দ্রিক বিচার করার কারণে মুসলমানদের বিচার পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় না এবং অর্থহীন মামলা-মোকদ্দমার পেছনে দৌড়ে কাউকে দেউলিয়া হতে হয় না।	বাংলাদেশে খ্রিষ্টান আইনের কারণে বিচারপ্রার্থীদের প্রতি বছর আনুমানিক ১৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ মামলার পেছনে ব্যয় করতে হয়। মামলার শুরুতেই উকিলের ফি, স্ট্যাম্প কেনা এবং আদালতের নানা প্রশাসনিক খরচের নামে মুসলমানদের পকেট থেকে বিশাল অঙ্কের টাকা চলে যায়। বিচারক কম হওয়ার কারণে একটি মামলা ৫ থেকে ১০ বছর চলে। এত সময়ের কারণে যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে সাধারণ একটি জমির মামলার পেছনেই গড়ে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়। খ্রিষ্টানদের বিচারব্যবস্থা মূলত একটি টাকার খেলা, যেখানে দরিদ্র মানুষ অর্থের অভাবে লড়াই করতে না পেরে নিঃস্ব হয়ে যায়।
৯. আদালতের রায়	রাসূল (সা.)-এর সময় মাখজুম গোত্রের প্রভাবশালী এক নারী চুরি করেন। রাসূল (সা.) সেই নারীর ওপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি হাত কাটার নির্দেশ দেন। রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে সাক্ষী ও প্রমাণ যদি তাৎক্ষণিক উপস্থিত থাকত, তবে মুসলমান বিচারকরা সাথে সাথে মামলার রায় দিয়ে দিতেন। মুসলমানদের এই ধরনের রায় দ্রুত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।	বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের বিচার ব্যবস্থায় আপনি যদি অপরাধী হন এবং প্রমাণসহ সাক্ষীও যদি উপস্থিত থাকে, তবুও বিচারক সাথে সাথে রায় দিতে পারে না। কারণ খ্রিষ্টানদের কিছু প্রশাসনিক কাগজপত্রের নিয়ম আছে। কাগজপত্রের নিয়মের মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা অপরাধকে দীর্ঘায়িত করে। অপরাধ যখন দীর্ঘায়িত হয়, তখন ইনসাফ বিলম্বিত হয়।
১০. রায় কার্যকর	মদিনার ইহুদী গোত্র বনু কুরাইজা খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের নিয়ে ষড়যন্ত্র ও চুক্তি লঙঘন করেছিল। যুদ্ধের পর তাদের বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয় সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)-এর ওপর। তিনি অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন। রাসূল (সা.) এই রায়কে সমর্থন করেন এবং বলেন, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত রায়। রায় দ্রুত কার্যকর হলে প্রমাণ মুছে যাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং ইনসাফ দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হয়।	আল্লাহ অন্যায়ভাবে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বলেছেন, কিন্তু খ্রিষ্টানদের আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে হত্যাকারী মুক্তি পায়। খ্রিষ্টানরা মূলত আল্লাহর আদেশের বিপক্ষে কাজ করে। যেমন— আপনি দেখবেন, অনেক হত্যাকারী রাষ্ট্রপতির আদেশে ফাঁসি থেকে মুক্তি পায়। এই ধরনের মুক্তির কারণে মুসলমান দের মধ্যে হত্যা আরও বৃদ্ধি পায়। আর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী মুক্তি পায়, অন্যদিকে মৃত ব্যক্তির পরিবার ইনসাফ পায় না। এই মুক্তি ইসলামের দৃষ্টিতে জুলুম।

ব্যবসা-বাণিজ্য: ক্রয়-বিক্রয় বা কেনা-বেচাকে ব্যবসা-বাণিজ্য বলে। ব্যবসা-বাণিজ্যর মাধ্যমে অর্থের আদান-প্রদান হয়। অর্থের আদান-প্রদান সংক্রান্ত নীতিকে অর্থনীতি বলে। অর্থাৎ, অর্থ কীভাবে আসবে এবং কীভাবে ব্যয় হবে, তার নিয়ম হলো অর্থনীতি। (আল-বাক্বারাহ: ২৭৫)

ব্যবসার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. ব্যবসা নীতি	রাসূল (সা.) মদিনা রাষ্ট্র গঠন করার পরে মুসলমান দের জন্য সুক-এ-মদিনা নামে বাজার তৈরি করেন। রাসূল (সা.)-এর হাতে গড়া মদিনার বাজারের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুসলমানদের ব্যবসা ছিল খাজনা মুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর যখন যাকাত ও মিরাস প্রয়োগ করা হয়, তখন জমাকৃত সম্পদ একটি নির্দিষ্ট সময় পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতিতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেশি। নির্ভরশীলতা যত বেশি হবে, সমাজে অর্থের প্রবাহ তত বৃদ্ধি পাবে। অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির ফলে সম্পদ কেবল গুটিকয়েক জন ধনীর হাতে জমা হতে পারবে না।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সম্পদ জমা করে কারুন হতে পছন্দ করে। বর্তমান বিশ্বে সকল ধনী ব্যক্তি হয় ইহুদী না হয় খ্রিষ্টান। কারণ ব্যক্তিকে ধনী হতে হলে সম্পদ জমা করতে হয়। সম্পদ জমা করার জন্য ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সুদভিত্তিক লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানি নাম দিয়ে কারুনের মত একচেটিয়া ব্যবসার নিয়ম চালু করে। যেহেতু ইহুদী-খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্য সম্পদ জমা করা, তাই তারা মেমোরেন্ডাম ও অ্যাসোসিয়েশন আইন দিয়ে নিয়ম করেছে ব্যক্তি মারা গেলেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মারা যাবে না। মেমোরেন্ডাম আইনে যাকাত ও মিরাস না থাকার কারণে দেশের সম্পদ গুটিকয়েক জন ধনীর হাতে জমা হতে শুরু করে।
২. বৃহৎ ব্যবসা	রাসূল (সা.)-এর হাতে গড়া মদিনা বাজারে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সিরিয়া ও ইয়েমেন থেকে উসমান (রা.) এবং আব্দুর রহমান (রা.)-এর মতো বড় ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য নিয়ে আসতেন। উনারা বড় আমদানি কারক হওয়া সত্ত্বেও মদিনার বাজারে খুচরা পণ্য বিক্রয় করতেন না। উনারা স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের কাছে বড় লটে পণ্য বিক্রয় করতেন। যার বর্তমান রূপ অনেকটা এমন যে, লিমিটেড কোম্পানি গুলো নিজেরা খুচরা বিক্রয় করত না; তারা খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করত।	বর্তমানে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ব্যবসায়িক আইন করেছে— লিমিটেড কোম্পানি হলো একজন কৃত্রিম ব্যক্তি। এই কৃত্রিম ব্যক্তি মামলা করতে পারবে, ঋণ নিতে পারবে। ফলে একজন কৃত্রিম ব্যক্তি পণ্য আমদানি করে, আরেকজন কৃত্রিম ব্যক্তি পণ্য বাজারজাত করে, আরেকজন কৃত্রিম ব্যক্তি পণ্য খুচরা বিক্রয় করে। এই সকল কৃত্রিম ব্যক্তির মালিক একজনই হয়, যাকে গ্রুপ কোম্পানি বলে। যেমন—একটি গ্রুপ কোম্পানি চাল, ডাল, তেল থেকে শুরু করে সিমেন্ট, ব্যাংক এবং মিডিয়া পর্যন্ত সব সেক্টরে ব্যবসা করতে পারে।
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসা	মুসলমানদের একক মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসানীতি বিশ্বের প্রাচীনতম সহজ ব্যবসানীতি। ছোট দোকান দিয়ে এই ব্যবসা শুরু করা যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসানীতিতে একজন ব্যক্তি যত খুশি পণ্য সংগ্রহ ও বিক্রি করতে পারেন। ক্ষুদ্র ব্যবসাকে বর্তমানে আমরা খুচরা ব্যবসায়ী হিসেবে চিনি। এই ক্ষুদ্র ব্যবসা অর্থনীতিকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে। সম্পদের পাহাড় করা জন্য অর্থ নীতিকে দূর্বল করে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানি দিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাজার নষ্ট করে দেয়	ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাজার যত নষ্ট হবে, সম্পদ তত বেশি কিছু কোম্পানির হাতে জমা হবে। বর্তমানে ইহুদী -খ্রিষ্টানদের নিয়মে গড়া লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানি গুলো মূলত খুচরা ব্যবসায়ীদের বাজার নষ্ট করে দেয় এবং সম্পদকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে রাখে। কারণ কোম্পানিগুলোর পুঁজি ও ক্ষমতা খুচরা ব্যবসায়ীদের তুলনায় অনেক বেশি। খুচরা ব্যবসায়ীরা যত দুর্বল হবে, অর্থনীতি তত বেশি কোম্পানিগুলোর হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে। তখন কোম্পানিগুলো চাইলে দাম বাড়বে-কমবে।
৪. ব্যবসার নিয়ম	রাসূল (সা.)-এর সুকে মদিনার ব্যবসানীতি থেকে মুসলমানরা জানতে পারে, যদি মুসলমানরা স্বাবলম্বী হতে চায় এবং জমাকৃত সম্পদ কয়েক প্রজন্ম পর পর সমাজে ছড়িয়ে দিতে চায়, তাহলে ব্যবসাকে তিন স্তরে ভাগ করতে হবে। ১. সাগির, ২. ওয়াসাত ৩. কাবির। এই তিন স্তরের ব্যবসার নিয়ম হবে—কাবির ব্যবসায়ীরা সাগির ও ওয়াসাত ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করবেন, ওয়াসাত ব্যবসায়ীরা শুধু লট ধরে পণ্য বিক্রয় করবেন। ওয়াসাত ও কাবির ব্যবসায়ীরা খুচরা বাজারে বিক্রয় করতে পারবেন না। সাগির ব্যবসায়ীরা সকল পন্য খুচরা বিক্রি করতে পারবে। এই তিন স্তরের ব্যবসা নীতি দেশের মধ্যে অর্থের সমবন্টন নিশ্চিত করবে।	বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যবসার তিনটি নিয়ম আছে। ১. একক মালিকানা যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ২. পাইকারি বা ডিলার যারা লট কিনে আনে। ৩. লিমিটেড বা গ্রুপ কোম্পানি। এখানে খুচরা ও পাইকারি নিয়ম দুইটি ঠিক আছে কিন্তু লিমিটেড কোম্পানির নিয়ম ঠিক নেই। যেখানে মুসলমানদের নিয়ম লিমিটেড কোম্পানি খুচরা ও চেইন শপ খুলে বিক্রয় করতে পারবে না। যেখানে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিয়ম লিমিটেড কোম্পানি খুচরা বাজারে বিক্রয় ও চেইন শপ খুলতে পারবে। আবার ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিয়মে একজন ব্যক্তি একাধিক কোম্পানি খুলতে পারবে এবং প্রত্যেক কোম্পানিকে একজন কৃত্রিম ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ব্যবসার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. ব্যবসার ভিত্তি	মুসলমানদের ব্যবসার ভিত্তি হলো যাকাত। মুসলমানরা সারা বছর ব্যবসা করে আয় করবে। আর সেই আয় থেকে রমজানের আগে গরিবদের জন্য কিছু পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করবে। মুসলমানদের এই নিয়মের ফলে সমাজে মধ্যে ধনী-গরিবের দূরত্ব কমে আসে।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক ব্যবসা নিয়ম মানে না। তারা যাকাতকে জরিমানা মনে করে, আর সুদকে সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম মনে করে। ইহুদীরা কারুনের মত সম্পদ গড়ার জন্য বর্তমান ব্যবসায়িক আইনের মধ্যে সুদকে সংযোগ করেছে।
৬. সম্পদ বণ্টন	সূত্র: A = (S - Z) / M মোট সম্পদ = (সম্পদ - যাকাত ২.৫%) / মিরাস বা উত্তরাধিকার-মালিকের মৃত্যুর পর যা সম্পদকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে দেয়। **ফলাফল:** সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বণ্টন হয়, যাকে ইকুয়ালিটি বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে সমতা আছে, তবে সেটি ধর্মের ক্ষেত্রে নয় বরং সম্পদের ক্ষেত্রে।	সূত্র: A = P (1 + r) n মোট সম্পদ = মূলধন-প্রাথমিক বিনিয়োগ (মূল পুঁজি + সুদের হার বা মুনাফা, যা মিরাস বা যাকাতের মাধ্যমে কমে না) সময় (যেহেতু প্রতিষ্ঠান মরে না, তাই এই সময় বা n অনন্তকাল চলতে পারে। **ফলাফল:** সম্পদ গুটিকয়েক জন ব্যক্তির হাতে পাহাড় সমান জমা হয়। যাকে ক্যাপিটালিজম বলা হয়।
৭. ব্যবসার প্রভাব	খলিফা ওমর (রা.)-এর শাসনামলে মুসলমান কর্ম চারীরা যাকাতের টাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। কিন্তু যাকাত নেওয়ার মতো কোন অভাবী মানুষ পাওয়া যেত না। মুসলমানরা এতটাই স্বাবলম্বী হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিজেরাই দান করতে চাইত। মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক ব্যবসা নীতি মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলেছিল। কারণ—ব্যবসায়ীরা ব্যবসার লভ্যাংশ থেকে যাকাত দিতেন এবং জমির মালিকরা ফসল থেকে যাকাত দিতেন, যাকে উশর বলা হয়।	বর্তমানে দেশের রাস্তার পাশে-রেললাইনের বস্তিতে হাজার হাজার গরিব মানুষ দেখা যায়। সুদভিত্তিক ব্যবসানীতির কারণে তারা গরিব থেকে যাচ্ছে। সুদের কারণে সম্পদ কিছু কোম্পানির হাতে জমা হয়। জমাকৃত সম্পদ থেকে এই কোম্পানিগুলো যাকাত না দেওয়ার ফলে সেই অর্থ আবার গরিবের কাছে ফিরে আসে না। ফলে গরিবের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অথচ যাকাত প্রদান করলে দেশে গরিবের সংখ্যা দিন দিন কমে আসত।
৮. কর্মসংস্থান	মুসলমানদের তিন স্তরে যাকাতভিত্তিক ব্যবসানীতির কারণে দেশে অনেক ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার ফলে কর্মসংস্থান দিন দিন বাড়ে। মুসলমানদের যাকাতনীতিতে জনসংখ্যা যত বেশি হবে, ব্যবসাও তত বেশি হয়, যা জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণত করে।	দেশের গ্রুপ কোম্পানিগুলো যখন অর্থ দিয়ে সম্পদ না কিনে তা পাচার করে,তখনই মূল সমস্যা শুরু হয়। অর্থ পাচারের ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে ব্যবসার সুযোগ কমে যায়, চাকরির চাহিদা বাড়ে এবং নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।
৯. আমানত ব্যবস্থা	রাসূল (সা.)-কে বিশ্বাস করে মানুষ আল-আমিন উপাধি দিয়েছিল। রাসূল (সা.) নিজে আমানত রাখতেন এবং রাসূল (সা.) মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছেন কী ভাবে আমানত রাখতে হয়। রাসূল (সা.) এর আমানত ব্যবস্থার বর্তমান রূপ হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থা। রাসূল (সা.)-এর নিয়ম অনুসারে ব্যাংকের নিয়ম হবে ব্যক্তি টাকা জমা দিবে ও উত্তোলন করবে। কিন্তু ব্যক্তির জমা কৃত টাকা ব্যাংক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে না।	বর্তমান ব্যাংকগুলো পরিচালিত হয় ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিয়মে। যার ফলে মানুষ যখন ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তখন ব্যাংক জমাকৃত অর্থ সুদের বিনিময়ে ব্যবসায়ী দের ঋণ দেয়। ব্যাংক যখন অন্যের টাকা ঋণ দেয় তখন ব্যাংক চাহিদা অনুসারে গ্রাহকে টাকা ফেরত দিতে পারে না। ব্যাংক বারবার ঋণ দেওয়ার কারণে দেশে কৃত্রিম টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ ১০ টাকার মালিক একজনের পরিবর্তে ১০০ জন হয়ে যায়।
১০. বিনিয়োগ	হযরত উসমান (রা.) রুমা কূপের আশেপাশে একটি খেজুরের বাগান গড়ে তোলেন। সেই বাগানের আয় দিয়ে মদিনা রাষ্ট্রের কোষাগার সমৃদ্ধ করা হতো। তখন থেকে মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ ও ব্যবসার প্রথা চালু হয়। যেমন—সেতু, বন্দর ও সড়ক নির্মাণের জন্য জনগণ থেকে বিনিয়োগ নেওয়া।	বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো খ্রিষ্টানদের। তাই মুসলমানদের সকল আইন খ্রিষ্টানরা ঠিক করে দেয়। খ্রিষ্টানদের বিনিয়োগ আইন হলো সরকার হয় শেয়ার বাজার—হারাম টাকা হালাল করার বাজার থেকে অর্থ নিবে, না হয় ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ব্যাংক থেকে নিবে। জনগণ থেকে সরাসরি অর্থ নিতে পারবে না।
১১. অর্থের সাহায্য	রাসূল (সা.)-এর সময়ে হযরত আবু দাহদাহ (রা.) ৬০০ খেজুর গাছ সমৃদ্ধ একটি বিশাল বাগানের বিনিময়ে একটি খেজুর গাছ কিনে তা এক এতিম বালককে দান করেছিলেন। যার বিনিময়ে রাসূল (সা.) তাঁকে জান্নাতে বিশাল ও ভারী খেজুরের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মদিনা রাষ্ট্রে কারো বিপদে এভাবেই করজে হাসানা দিয়ে সাহায্য করা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে একজন মুসলমান বিদেশে যাওয়ার জন্য এক হাজার টাকাও কারো কাছ থেকে ধার পায় না।	ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুদানে চলা বাংলাদেশের এনজিও গুলো প্রতি বছর গড়ে ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। তারা প্রতি বছর সাধারণ মানুষের থেকে কেবল সুদ বাবদই প্রায় ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রতি বছর এই টাকা দিয়ে দেশে প্রায় ৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসা দাঁড় করানো সম্ভব হতো, যেখানে কোন কিস্তির চাপ থাকত না। সুদে নেওয়া এনজিও গুলোর অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদত বাদ দিয়ে কেবল অর্থের পেছনে দৌড়ায়।

ব্যবসার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ	রাসূল (সা.) ইয়েমেনের মারেব নামক অঞ্চলের একটি লবণের খনিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন করে দেন। তখন থেকে মুসলমানদের নিয়ম হয় মৌলিক ও অবিভাজ্য সম্পদ রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে। কারণ মৌলিক সম্পদগুলো মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। জীবন ধারণের অপরিহার্য সম্পদগুলো যদি একক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন সম্ভব হয় না। যেমন- লোহা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য কিন্তু বর্তমানে কিছু কোম্পানি এই লোহার নিয়ন্ত্রণ করে। এতে কোম্পানি চাইলে দাম বাড়ে আবার কোম্পানি চাইলে দাম কমে।	বর্তমান সরকার অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদগুলো বেসরকারি কোম্পানি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে ইজারা দেয়। যেমন- লোহা, সিমেন্ট, বালি, পাথর, তেল, কেমিক্যাল, গ্যাস, লবণ, বিরল খনিজ, বৃষ্টির পানি, কয়লা, তামা, সোনা, রুপা, অ্যালুমিনিয়াম, লিথিয়াম, ভূগর্ভস্থ পানি, বিদ্যুৎ, বনাঞ্চল, বন্দর, মহাসড়ক, রেললাইন, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। এই সকল মৌলিক সম্পদগুলো কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে সম্পদ সঠিকভাবে বণ্টন হয় না বরং সম্পদ তাদের বংশপরম্পরায় তাদের মধ্যে ঘুরতে থাকে।
১৩. দেশের উন্নয়ন	ইসলামিক সরকার জনগণকে স্বাবলম্বী করার জন্য দেশের উন্নয়নে জনগণকে সাথে রাখে। জনগণ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার কারণে দেশের সম্পদের প্রতি জনগণের মহব্বত বাড়ে। সরকার যখন জনগণ থেকে অর্থ নিয়ে দেশের উন্নয়নের কাজ করে, তখন দেশকে ঋণের ফাঁদে পড়তে হয় না। দেশ ঋণমুক্ত থাকার কারণে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দিয়ে সরকার তেল, গ্যাস, সার, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মজুদ নিশ্চিত করতে পারে।	বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নের নাম দিয়ে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নেয়। এই ঋণের সুদ দেওয়ার জন্য সরকার প্রতি বছর জনগণ থেকে খাজনা নিয়ে ১.২২ লক্ষ কোটি টাকার রেমিটেন্স ইহুদী-খ্রিষ্টানদের দেয়। এক বছরের এই পরিমাণ রেমিটেন্স দিয়ে সরকার আগামী ২২ বছরের জন্য ১১৩ কোটি ব্যারেল তেল মজুদ করতে পারতো। আমরা ইহুদীদের যত সুদ দেই তার প্রতিটি অর্থ বুলেট রূপে ফিলিস্তিনি ভাইদের বুকে ফিরে আসে।
১৪. খাজনা	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সরকার ছিল জনগণের সেবক। সরকার জনগণের মধ্যে মৌলিক সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করত। সরকার মৌলিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে, রুমাকুফের বিনিয়োগ দিয়ে, সাদাকা ও যাকাত আদায়ের অর্থ দিয়ে প্রশাসনিক ব্যয় মিটাতো। মুসলমানদের এই আইনের ফলে জনগণ থেকে খাজনা আদায় করে দেশ চালাতে হতো না। মুসলমানদের আইনে আল্লাহ ভূমির সৃষ্টিকর্তা আর সাধারণ জনগণ তার মালিক। তাই ভূমি থেকে খাজনার পরিবর্তে ফসলের যাকাত-উশর আদায় করে সরকার তা দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিত।	বর্তমান রাষ্ট্র চলে খ্রিষ্টানদের আইন দিয়ে। রাষ্ট্র খ্রিষ্টানদের আইন দিয়ে চলার কারণে আমরা মুসলমানরাও খ্রিষ্টানদের আইন মেনে চলি। খ্রিষ্টানদের আইনে সরকার হলো জনগণের নিয়ন্ত্রক। আগেরকার ব্রিটিশ রাজারা জনগণ থেকে যেভাবে খাজনা নিয়ে রাষ্ট্র চালাত এখনও সেই নিয়মে চলে। তবে এখন খাজনার পরিবর্তে ভ্যাট, ট্যাক্স, ফি, রেজিস্ট্রেশন, বিয়ের খাজনা, বাজার লিজ নাম দেওয়া হয়েছে। ভ্যাটের বড় সমস্যা হলো ধনী-গরিব সবাইকে সমান টাকা দিতে হয়। যেমন- ৫০ টাকার লবণে একজন রিকশাচালক ও কোটিপতি সমান ভ্যাট দেয়।
১৫. সিন্ডিকেট	মুসলমানদের সমতা ও সম্প্রীতির তিন স্তরের ব্যবসা নীতির ফলে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট গোড়া থেকে বন্ধ হয়ে যায়। তার পরেও রাসূল (সা.) মুসলমানদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবার মজুদ করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনতেও নিষেধ করেছেন। যার কারণ হলো—চাহিদা যখন বেশি হবে, অসাধু ব্যবসায়ীরা তার দাম বাড়িয়ে দেবে।	বর্তমানে আমদানি-রপ্তানি ও মৌলিক সম্পদসহ সবকিছুই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যার কারণে ব্যবসায়ীরা চাইলে পণ্যের দাম বাড়ে-কমে। যেমন—প্রাণ, বেক্সিমকো, স্কয়ার, ব্র্যাক, বসুন্ধরার মত গ্রুপগুলো নিজেদের মধ্যে গোপন চুক্তি করে সবকিছুর দাম বাড়াতে পারে। দেশের মধ্যে এরাই হলো বড় সিন্ডিকেট যারা দেশ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
১৬. বিজ্ঞাপন	খলিফা ওমর (রা.)-এর সময় এক মা তার মেয়েকে বলে ছিলেন দুধের সাথে পানি মেশানোর জন্য, কিন্তু মেয়ে বলেছিল খলিফা নিষেধ করেছেন দুধে পানি মেশাতে। মা বলে ছিলেন খলিফা তো এখন দেখছেন না, মেয়ে বলেছিল খলিফা না দেখলেও খলিফার রব আমাদের দেখছেন। মুসলমানদের আদর্শ হলো তৈরি পণ্যের গুণগত মান প্রকাশ করা। যাতে ক্রেতারা সবকিছু যাচাই-বাছাই করে উন্নত ও প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে। তবে পণ্যের মান প্রচারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার নারী বা অশ্লীল কোন উপায় অবলম্বন করা যাবে না।	বর্তমানে আমরা পণ্যের অনেক প্রচারণা দেখতে পাই। কোম্পানি গুলো পণ্যের প্রচারণা করে ঠিকই, কিন্তু গুণগত মানের প্রচারণা না করে লোক দেখানো প্রচারণা করে। কোম্পানিগুলো লোক দেখানো প্রচারণার জন্য ব্যবহার করে মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যম গুলোকে। মিডিয়া ও সংবাদ মাধ্যম গুলো পুরুষদের আকৃষ্ট করতে নারী দিয়ে পণ্যের লোক দেখানো প্রচার করে। আর মিডিয়ার নারীরা পুরুষদের আকৃষ্ট করতে এমন নির্লজ্জ ও পতিতাদের পোশাক পরে যা মুসলমানদের ঈমানের জন্য হুমকি।

শিক্ষা: মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পরে মানুষকে পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ দেওয়াকেই শিক্ষা বলে। পৃথিবী-উপযোগী প্রশিক্ষণ নেওয়ার কেন্দ্রকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের পরিবর্তন করা যায়। শিক্ষা ইসলাম-কেন্দ্রিক হলে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার কথা বলবে, আর শিক্ষা পৃথিবী-কেন্দ্রিক হলে মানুষ ইবলিশের কথা বলবে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. শিক্ষাব্যবস্থা	মুসলমানদের মূল প্রতিষ্ঠান শিক্ষা শুরু হয় আহলুস সুফ্ফাহ থেকে, যার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটেছিল বায়তুল হিকমাহ পর্যন্ত। বায়তুল হিকমাহ ধ্বংসের প্রায় ৬০৮ বছর পরে খ্রিষ্টানদের নির্যাতন বন্ধ করতে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকে দেওবন্দ শিক্ষা ব্যবস্থা আহলুস সুফ্ফাহর আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করে। বর্তমানে দেওবন্দ ব্যবস্থাকেই মুসলমানদের মূল ধারার ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করা হয়। মুসলমানদের তৎকালীন আহলুস সুফফাহতে আল-কোরআন ও হাদিসের পাশাপাশি আধুনিক সামরিক রণকৌশলের শিক্ষা ছিল, কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দেওবন্দ শিক্ষায় আধুনিক শিক্ষার সংযোগ ঘটানো হয়নি।	মুসলমানদের দেওবন্দ শিক্ষাব্যবস্থাকে বন্ধ করতে খ্রিষ্টান ব্রিটিশরা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। তাদের সেই কৌশলের অন্যতম রূপ হলো খ্রিষ্টান ধাঁচের স্কুল-কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসা তৈরি করা। এ ছাড়া তারা কাদিয়ানি নামক ভণ্ড সৃষ্টি করে কাদিয়ানি মতবাদ আলিয়া মাদ্রাসায় হাদিস হিসেবে প্রচার করে। তাতেও সফল না হয়ে তারা ইসলামিক শিক্ষার শেকড়বিহীন মওদুদী মতবাদ প্রচার করে। মওদুদী অনুসারীদের বাইরে থেকে কঠোর মুসলমান মনে হলেও তাদের চিন্তা-চেতনায় খ্রিষ্টান আর্দশ প্রাধান্য পায়। ব্রিটিশদের কৌশল আজ অনেকাংশেই সফল, কারণ বর্তমানে সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশ মওদুদী অনুসারীদের ইসলামিক মূল ধারার মনে করে।
২. শিক্ষার উদ্দেশ্য	আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন—পাঠ করুন মানুষের প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ জন্মগতভাবে অজ্ঞ হয়। মানুষকে শান্ত, নমনীয় এবং আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। এই জন্য মুসলমানদের শিক্ষা হয় আল-কোরআন ও হাদিস কেন্দ্রিক। মুসলমানদের শিক্ষা আল-কোরআন ও হাদিসকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে এখানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা ডিপ্লোমার মতো বিভক্তির প্রয়োজন হয় না। বরং একমুখী শিক্ষার মাধ্যমে একটি ইনসাফপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষাকে ছোট করে স্কুল শিক্ষাকে উন্নত দেখানোর কোন সুযোগ থাকে না।	বর্তমানে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে খ্রিষ্টান মডেলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও সরকারি মাদ্রাসা তৈরি করা হয়েছে। এই সকল কিছু তৈরি করা হয়েছে দেওবন্দ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করতে এবং ব্রিটিশ মতাদর্শের কিছু কেরানি তৈরি করতে। পরবর্তীতে ব্রিটিশদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে আমেরিকা মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টান মতবাদ, সুদ ও সমকামিতার বিস্তার ঘটায়। ব্রিটিশদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে খ্রিষ্টানরা মুসলমানের বিপক্ষে মুসলমানকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং জাতীয় ঐক্য নষ্ট করে আদর্শিক বিভেদ ও বহুরূপী মানুষ সৃষ্টি করেছে।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	মদিনা রাষ্ট্রে মসজিদে নববীর পাশে ছিল পুরুষদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আহলে সুফফা, আর নারীগণ আম্মা জান আয়েশা (রা.) ও ফাতেমা (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর সময়ে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি নারীদের ইসলাম শিক্ষার পাশা পাশি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার জন্য আলাদা স্থান ও সময়ের ব্যবস্থা করে ছিলেন এবং মসজিদে নববীতে মহিলাদের যাতায়াতের জন্য পৃথক দরজা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করে। এতে পুরুষ-নারীর মধ্যে পর্দার বিধান বজায় থাকে এবং সমাজে ধর্ষণ ও যিনা কমে যায়।	১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলে তাঁর কুখ্যাত নীতিতে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার যা রক্তে-মাংসে ভারতীয়-মুসলমানদেরকে চিন্তায় ও রুচিতে ব্রিটিশ-খ্রিষ্টান করে দেবে। তাঁর সেই নীতি বাস্তবায়ন করার জন্য ব্রিটিশরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান নিয়মে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা স্বাভাবিক করে দিয়েছে। খ্রিষ্টানরা এই মেলামেশার নাম দিয়েছে সহশিক্ষা। খ্রিষ্টানদের সহশিক্ষার ফলে মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যকার আদর্শিক ও পারিবারিক দূরত্ব কমে যায়। আদর্শিক দূরত্ব কমিয়ে খ্রিষ্টানরা সহশিক্ষার মাধ্যমে তাদের নৈতিকভাবে দেউলিয়া ও নির্লজ্জ সমাজব্যবস্থাকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়।
৪. শিক্ষার লক্ষ্য	আল্লাহ মুসলমানদের জন্য সুদকে হারাম করেছেন, ব্যবসাকে হালাল করেছেন। অর্থাৎ ব্যবসা থেকে সুদকে বের করে দিয়েছেন। আর যাকাতকে ব্যবসার সাথে সংযোগ করে দিয়েছেন। তাই যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাকাতের নীতি শিক্ষা দেয়, সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সুদকে হালাল মনে করে, যাকাতকে জরিমানা মনে করে। অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ব্যবসার সাথে সুদকে সংযোগ করেছে। আর যাকাতকে ব্যবসার সাথে বাদ দিয়েছে। তাই যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুদ নীতি শিক্ষা দেয়, সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো ইহুদী-খ্রিষ্টানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. শিক্ষার পদ্ধতি	মদিনা রাষ্ট্রে আহলে সুফফার ছাত্রগণ প্রথমে আল-কোরআন, তারপর হাদিস এবং সবশেষে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধের কৌশলই ছিল সবচেয়ে আধুনিক শিক্ষা। মুসলমানদের সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান ইসলামি শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত হতে পারে। প্রথমে সকলে আল-কোরআন শিখবে; দ্বিতীয় স্তরে হাদিস ও সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করবে; আর তৃতীয় স্তরে থাকবে রাষ্ট্রের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা। যেমন— বিচারক-মুফতি, চিকিৎসক-ডাক্তার, প্রকৌশলী-ইঞ্জিনিয়ার, সামরিক-মুজাহিদ এবং রাষ্ট্রীয় দাপ্তরিক কাজের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল। গভীর গবেষণার জন্য থাকবে উচ্চতর শিক্ষা। ইসলামিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সবাই একই মানের আদর্শিক ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। ইসলামিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যাকাত-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসানীতি থাকার কারণে শিক্ষা শেষে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ব্যবসা-মুখী হয়।	খ্রিষ্টানদের শিক্ষা কাঠামোতে প্রথমে প্রাথমিক, দ্বিতীয় স্তরে মাধ্যমিক, তৃতীয় স্তরে উচ্চ মাধ্যমিক এবং চতুর্থ স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের স্কুল-কলেজ কেন্দ্রিক দ্বিমুখী শিক্ষা দেশকে দুটি মেরুতে ভাগ করে দিয়েছে। দেশে এক পক্ষ আধুনিক জ্ঞান জানলেও মুসলমানদের আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অন্য পক্ষ মুসলমানদের আদর্শ জানলেও আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ছে। দ্বিমুখী কাঠামোর ফলে প্রথম পক্ষের মুসলমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে খ্রিষ্টান মতাদর্শ প্রবেশ করছে। খ্রিষ্টান মতাদর্শের কেরানিরা বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমস্যাগুলো চিহ্নিত না করে বরং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বেশি প্রশ্ন তোলে। তারা খ্রিষ্টান মতাদর্শে এতই প্রভাবিত যে বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে বড় পরিবর্তন প্রয়োজন তা করার সাহস কেরানিদের নেই। এই কেরানি হওয়ার জন্য সরকারি একটি পদে শত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়।
৬. শিক্ষার সময়কাল	ইসলামিক রাষ্ট্র মুসলমানদেরকে ৫-১০ বছরের মধ্যে আল-কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা দেয়। যার কারণে প্রাথমিকভাবে সকল মুসলমান ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ১১-১৭ বছরের মধ্যে মুসলমানদেরকে সাধারণ (মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষা দেয়। সাধারণ শিক্ষার পরে ১৮-২০ বছরের মধ্যে মুসলমানদেরকে কর্মজীবনমুখী শিক্ষা দেয়। কর্মজীবনমুখী শিক্ষার পরে মুসলমানরা ২১-২৩ বছরের মধ্যে উচ্চতর গবেষণা শিক্ষা নেয়। মুসলমানদের শিক্ষা কার্যক্রম আহলে সুফফার অনুসারী দেওবন্দকে ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়।	মুসলমানরা কি কখনো চিন্তা করেছে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কোথা থেকে এসেছে? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন মুসলমানের শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করতে সময় লাগে— (প্রাথমিকে ৫ বছর, মাধ্যমিকে ৫ বছর, উচ্চ মাধ্যমিকে ২ বছর, স্নাতক ৪-৫ বছর, স্নাতকোত্তর ২-৩ বছর) মিলিয়ে প্রায় ২০ বছর। এই ২০ বছর পরে একজন শিক্ষার্থীর বয়স দাঁড়ায় ২৫ থেকে ২৬ বছর। এরপর চাকরি খুঁজে, বিয়ে করতে সময় লাগে ৩০-৩৫ বছর। খ্রিষ্টানদের এই দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষার কারণে প্রতিটি মুসলমান পরিবার ক্ষতির সম্মুখীন হয় পাশাপাশি মুসলমান পরিবার হয় খ্রিষ্টান মতাদর্শের।
৭. সম্প্রীতির শিক্ষা	মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি আছে শুধু অর্থের ক্ষেত্রে, আর কিছুতে মুসলমানরা কাফেরদের সাথে সমতা বা সম্প্রীতিতে যায় না। যেহেতু আহলুল জিম্মাহরা দেশের নাগরিক, তাই আহলুল জিম্মাদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে। তারা নিজেদের ধর্ম অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তাদের নিজেদের তৃণমূল প্রশাসনিক কার্যক্রম শিক্ষা গ্রহণ করবে।	সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে মুসলমান দোয়া করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পথ থেকে দূরে থাকার জন্য, কিন্তু বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমান ও কাফেরদের একসাথে শিক্ষা দেওয়া হয়। খ্রিষ্টানরা এই শিক্ষাকে বলে সম্প্রীতির শিক্ষা। বাস্তব অর্থে এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রীতির নয় বরং মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের মতাদর্শ প্রবেশ করানোর কৌশল।
৮. ব্যাকরণের ব্যবহার	মুসলমানরা যখন ইসলামের কথা বলে, তখন মুসলমানদের মুখের ভাষা হয়ে যায় অতীতবাচক। যেমন- আমাদের গৌরব ছিল, ইসলাম এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, মুসলমানদের স্বর্ণযুগ না বলে ইসলামের স্বর্ণযুগ ছিল। এই ছিল বা করেছিল শব্দ গুলো মুসলমানদের মস্তিষ্ককে বোঝায় যে, সব ভালো তো আগেই হয়ে গেছে, এখন আর কিছু করার নেই। এটি একটি বিশাল ষড়যন্ত্র, যা মুসলমানদেরকে বর্তমান ইসলামিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে স্রেফ অতীতের স্মৃতি চারণকারী বানিয়ে রাখে।	মুসলমানদের কাছে ইসলাম এমন এক জান্নাত যা মরার পরে পাওয়া যাবে; কিন্তু যে ইসলাম দিয়ে বর্তমান পৃথিবীকে জান্নাত বানানোর কথা ছিল, সেটাকে মুসলমানরা ব্যাকরণ দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আমরা যদি ইসলামকে শান্তি বলার মোহ ত্যাগ করে ইসলামকে মুসলমানদের পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে ইহুদী-খ্রিষ্টান জাতি আজ মুসলমানদের ইসলামকে জঙ্গি বলার সাহস পেত না। কারণ মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসকে গালি দেয় না বরং সম্মান করে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৯. সর্বনাম	বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, সর্বনাম মানুষের চিন্তার সর্বনাশ করে দেয়। এই সর্বনামের অধিক ব্যবহারের কারণে আজ মুসলমানরা আল-কোরআন থেকে অনেক দূরে। কারণ বিশেষ্য-নাম বা শ্রেণি মানুষকে জাগিয়ে তোলে, তাকে চ্যালেঞ্জ করে। সর্বনাম মানুষকে নিরাপদ অনুভব করায় এবং ঘুম পাড়িয়ে দেয়। যেমন— আমরা, তোমরা, তোমাদের, তাদের, তারা। যখন আল-কোরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে নাম বা শ্রেণি উল্লেখ না করে সর্বনাম শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়, তখন মানুষের চিন্তায় বাস্তব চিত্রের পরিবর্তে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। যেমন— তোমরা মুমিনরা আহলে কিতাবদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এখানে সর্বনাম ব্যবহার করার কারণে বাস্তব চিত্রে ধোঁয়াশা তৈরি হয়। যখন নাম বা শ্রেণি দিয়ে অনুবাদ করা হতো তখন অনুবাদ হতো— তোমরা মুসলমানরা পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এই অনুবাদ মানুষের চিন্তায় বাস্তব চিত্র তুলে ধরে এবং আল্লাহর আদেশসমূহ মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট করে তোলে।	আল-কোরআন ঘুমন্ত মানুষকে জাগানোর জন্য সর্বনামকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে, আর মুসলমানরা সেই সর্বনামকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সর্বনাম মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সরাসরি বিশেষ্য-নাম বা শ্রেণি দিয়ে ডাকলে মস্তিষ্কের সতর্কতা কেন্দ্র দ্রুত সক্রিয় হয়। ভাষার ওপর যাদের দখল ছিল, তারা বুঝে গিয়েছিল যে সরাসরি আল-কোরআনের বিরোধিতা করে লাভ নেই। জালেমরা মুসলমানদের ঘুম পাড়ানোর জন্য কৌশলে ভাষার মোড়ক বদলে দিল। এই জালেমদের কৌশল সম্পর্কে মুসলমানদের জানানোর জন্য আল্লাহ সূরা নিসার ৪৬ নং আয়াতে বলেন, ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক ধর্মীয় শব্দগুলোকে মূল অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলে। যেমন-মানুষ, মুসলমান ও ইহুদী-খ্রিষ্টান শব্দগুলোর জায়গায় তোমাদের, মুমিনদের, আহলে কিতাবদের— এই ধরনের অদৃশ্য সর্বনামগুলো ব্যবহার করা। যখনই সত্যকে তোমাদের-আমাদের বলা হয়, তখনই তা ব্যক্তিগত ও জাতিগত দায় থেকে দূরে চলে যায়।
১০. বলার ভাষা	আল-কোরআন যা মুসলমানদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নাজিল হয়েছে। আল-কোরআন আল্লাহর ওপর বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেয় তারা যেন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবধারীদের মতো না হয়। মুসলমানরা যখন এই আল-কোরআন অনুসারে জীবনযাপন করবে তখন তা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য কল্যাণকর হবে। কিন্তু যখনই এই আল-কোরআনকে নির্দিষ্ট জাতিকে বাদ দিয়ে মানবতার কল্যাণের জন্য বলা হয় তখন মুসলমান জাতি আল-কোরআন অনুসারে জীবনযাপন করা থেকে দূরে সরে যায়। তখন মুসলমানের চিন্তায় আসে আমি একা আল-কোরআনের অনুসারী নয়। আর অনেক অনুসারী আছে তারা আল-কোরআন মানলে আমিও মানবো।	বর্তমান সময়ে অতিরিক্ত ভক্তি দিয়ে সত্যকে আড়াল করা হয়। আমরা যখন বলি মহাপবিত্র কোরআন, মহান দায়িত্ব বা ইসলামিক জীবনব্যবস্থা—তখন এই মহা, মহান বা ইসলামিক শব্দগুলো সত্যকে অনেক উঁচুতে তুলে দেয়। এত উঁচুতে যে, সাধারণ মানুষ মনে করে—এটা তো অনেক বড় বিষয়, এটা আমার মতো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। যদি আমরা বলতাম মুসলমানদের আল-কোরআন বা মানুষের জন্য আল-কোরআন বা মুসলমানদের রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন সকল মানুষের মনে চিন্তা আসত—এর ভেতরে কী আছে জানা দরকার। কিন্তু অতিরিক্ত ভক্তি ও জাতিগত দায়বদ্ধতা উল্লেখ না করার কারণে সত্য আড়াল হয়।
১১. শিক্ষার প্রভাব	মুসলমানদের দেওবন্দ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব বুঝতে হলে প্রথমে ইসলামকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় মুসলমানদের ইসলাম আসবে তখন দেওবন্দ কেন্দ্রিক ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ পাবে। কারণ ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দেওবন্দের ছাত্র ছাড়া অন্যরা পরিচালনা করতে পারবে না। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন-কানুন দেওবন্দ অনুসারী ছাত্ররাই পাঠ করে। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকর্তারা দেওবন্দ কেন্দ্রিক শিক্ষিত ছাত্রদের থেকে নেওয়া হবে। তাই প্রত্যেক দেওবন্দ কেন্দ্রিক ছাত্রের প্রয়োজন মুসলমানদের ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।	বর্তমানে বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে তা হলো ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তৈরি করা। যার কারণে রাষ্ট্রীয় যত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয় তা সব স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের থেকে নেওয়া হয়। কারণ রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে শিক্ষা কাঠামো জড়িত। আর যেহেতু স্কুল-কলেজের শিক্ষা কাঠামো ইহুদী-খ্রিষ্টানদের, তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজন তাদের শিক্ষা কাঠামো থেকে বের হওয়া ছাত্র। এই কারণে আমরা বর্তমানে দেখি সকল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকর্তারা খ্রিষ্টান নিয়মে তৈরি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া। যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হবে তখন এরা ব্যবসায়ি হবে।

বিবাহ: অবিবাহিত নারীর জন্য হালাল পুরুষের উপর নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে নারীর অভিভাবকত্ব হস্তান্তর করাকে বিবাহ বলে। আল্লাহ তাআলা এটি বৈধ করেছেন পবিত্র সম্পর্কের জন্য, অবৈধ সম্পর্কের জন্য নয়। (আন-নিসা: ২৪)

বিবাহের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. বিবাহর উদ্দেশ্য	মুসলমানদের জন্য বিবাহ একটি পবিত্র ইবাদত ও সামাজিক বন্ধন। ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সমাজের মূল ভিত্তি হলো পারিবারিক শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলা পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, পুরুষ নারীর জন্য পোশাকস্বরূপ এবং নারী পুরুষের জন্য পোশাকস্বরূপ। রাসূল (সা.) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, বিবাহ হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক। মুসলমানদের স্বর্ণযুগে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুদৃষ্টি এবং যিনা-ব্যভিচার থেকে সমাজকে মুক্ত রাখা। ইসলাম বিবাহিত জীবনকে একটি মাদ্রাসা হিসেবে দেখে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে সহায়তা করবে। আল্লাহ বিবাহকে অত্যন্ত সহজ করেছেন এবং বিবাহের পরে সন্তান জন্ম দেওয়াকে বরকতময় করেছেন।	ইহুদী-খ্রিষ্টানদের জন্য বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। কাফেরদের দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নষ্ট করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে। দুর্বল বন্ধনের ফলে মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা হালাল পথে পূরণ করার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যায়। এই সংকুচিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে পর্নোগ্রাফি, ডেটিং অ্যাপ এবং অশ্লীল বিনোদনের একটি বিশাল বাজার তৈরি হয়। একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন অল্প বয়সে এইসব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে যায় তখন সমাজে বাল্য যিনা বৃদ্ধি পায়। বাল্যকাল থেকে যখন একজন ব্যক্তি যিনা করে তখন তার কাছে বিবাহ একটি চুক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ফলে ওই ব্যক্তি বিবাহ করলেও তার বিবাহবিচ্ছেদ দ্রুত হয় এবং সন্তানকে তারা অতিরিক্ত বোঝা মনে করে।
২. বিবাহের নিয়ম	রাসূল (সা.) ও আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ মধ্যে মুসলমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এই বিবাহের মাধ্যমে মুসলমানরা জানতে পারে ইসলামে বিবাহের নিয়ম হলো শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা এবং পারিবারিক সম্মতিক্রমে। রাসূল (সা.)-এর সময় বিবাহ হতো মসজিদে এবং ওয়ালিমা হিসেবে খেজুর ও যবের রুটি দেওয়া হতো। তখন মোহরানা এত সহজ সাধ্য ছিল যে, শুধু টাকা না দিয়ে আল-কোরআন শিক্ষা দেওয়া বা কোন ইসলামিক জ্ঞান অর্জনকেও শর্ত করা হতো। এই সকল শর্তের মাধ্যমে ঘরে ঘরে ইসলামের সঠিক শিক্ষা পৌঁছে যেত।	বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিয়ম দিয়ে মুসলমানদের বিবাহকে একটি আইনি চুক্তি হিসেবে রূপান্তর করা হয়েছে। কাফেরদের আইন অনুসারে বিবাহের পূর্বে মুসলমানদের কিছু শর্ত পালন বাধ্যতা মূলক। যেমন—ছেলের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর এবং মেয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে। এই শর্তের বাইরের বিবাহকে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিবাহের নিয়মে আইনি শাস্তি থাকার কারণে বিবাহ বিলম্বিত হয়। ফলে শারীরিক জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য ছেলে-মেয়ে হারাম পথসমূহ অবলম্বন করে।
৩. বিবাহের অনুমতি	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে খলিফা উমর (রা.) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সময়ে ওলির অনুমতি ছাড়া বিবাহসমূহকে কাজিগণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতেন এবং সেই বিয়েকে অবৈধ ঘোষণা করে পুনরায় অভিভাবকের অধীনে বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। যেমন—আয়েশা (রা.)-এর ভাই আবদুর রহমান যখন সিরিয়ায় ছিলেন, তখন আয়েশা (রা.) তাঁর ভাইয়ের মেয়ে হাফসা বিনতে আবদুর রহমানের বিয়ে আল-মুনজির ইবনে জুবায়েরের সাথে ঠিক করেন। কিন্তু মেয়ের বাবার আপত্তির কারণে পরবর্তীতে পুনরায় অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে নতুন করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়েছিল।	বর্তমানে বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের আইনে ব্যক্তির বয়স ১৮ বছর হলে সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে। অভিভাবক চাইলে তার কোন সিদ্ধান্তের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যার ফলে নারী যখন উচ্চশিক্ষিত হয়, তখন ওই নারীর চাহিদা ও স্বাধীনতার পরিধি বৃদ্ধি পায়। নারীর চাহিদা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবারের অনুমতি ব্যতীত নারীরা বিবাহ করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। যেহেতু সৃষ্টি গতভাবে নারীর মন নরম হয়, তাই নারীর স্বসিদ্ধান্তে বিবাহ হলে ওই বিবাহে বিচ্ছেদের প্রবণতা বেশি হয়। এই সকল কারণে মুসলমানদের নিয়মে নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ ওলি থাকা বাধ্যতামূলক।
৪. বিবাহের সময়	খলিফা উমর (রা.)-এর সময় এক অল্প বয়সী যুবতী নারীর বিবাহ অনেক বয়স্ক ব্যক্তির সাথে সম্পন্ন হয়। কিছুদিন পর সেই নারী উমর (রা.) কাছে এসে অভি যোগ করেন যে, তিনি এই বিবাহে সুখী নন; কারণ স্বামী ও তাঁর বয়সের ব্যবধান ও পরিপক্কতার পার্থক্য অনেক বেশি। তখন থেকে মুসলমানদের নিয়ম হয় বিবাহ হবে নারী-পুরুষের পরিপক্কতার ওপর ভিত্তি করে।	বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিবাহ যখন শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার ওপর ভিত্তি করে না হয়ে বয়সের ওপর নির্দিষ্ট করে হয়, তখন সমাজে ব্যভিচার ও বাল্য যিনা বৃদ্ধি পায়। যখন সমাজে বাল্য যিনা বৃদ্ধি পায়, তখন বিবাহের গড় বয়স দাঁড়ায় ২৫ থেকে ৩০ বছর। ফলে অধিক বয়সি নারীরা ১–২ জনের বেশি সন্তান গ্রহণ করতে পারে না।

বিবাহের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. বিবাহের বয়স	ইবনে সিনা মনে করতেন, মানুষের হাড়ের গঠন এবং স্নায়বিক বিকাশ ১৬ থেকে ২১ বছরের মধ্যে সবচেয়ে মজবুত হয়। তিনি বিবাহের ক্ষেত্রে কেবল প্রজনন ক্ষমতা নয়, বরং শরীরের গঠনগত দৃঢ়তা এবং মানসিক স্থিরতাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইউসুফ (রহ.)-এর মতে, পুরুষ-নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিপক্কতার সর্বোচ্চ বয়স ১৫ বছর। যদি পুরুষ-নারীর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়, তবে তাকে পরিপক্ক হিসেবে গণ্য করা হবে।	মুসলমান পুরুষের জন্য বিবাহ হলো চোখের যিনা বন্ধ করার হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমান সময়ে পুরুষ-২১ ও নারীর–১৮ বছর হওয়ার পূর্বে মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষকে চোখের যিনায় লিপ্ত করা হয়। মানুষ যখন পরিপক্ক তার পূর্বে যিনা করা শুরু করে, তখন পারিবারিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সমাজে বেড়ে যায় ছেলে-মেয়ে পালিয়ে বিবাহ করা, রক্তের সম্পর্কের সাথে যিনা করা ও বালেগ হওয়ার পূর্বে যিনা করা-সহ নানা রকম বিবাহবহির্ভূত কার্যক্রম দেখা যায়।
৬. বিবাহের দেনমোহর	আনসারী সাহাবী আবু তালহা (রা.) যখন উম্মে সুলাইম (রা.)-কে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। উম্মে সুলাইম ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা একজন মুসলিম নারী। উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে বলেন, আপনার মতো মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু আপনি তো কাফের, আর আমি মুসলিম। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে সেটাই হবে আমার মোহর। এর বাইরে আমি আর কোন টাকা-পয়সা বা সম্পদ চাই না। আবু তালহা (রা.) এতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইসলাম গ্রহণই উম্মে সুলাইমের মোহর হিসেবে গণ্য হয়।	মুসলমান পুরুষরা দেনমোহরের বিনিময়ে বিবাহ করে। ইসলামে দেনমোহর হলো নারীর প্রতি সম্মান এবং তার অধিকার নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান সময়ে দেনমোহর শুধু অর্থ হওয়ার কারণে একজন পুরুষ পড়াশোনা শেষ করে উপার্জনের পর্যায়ে যেতে জীবনের ৩০-৩৫ বছর পার করে দেয়। পুরুষ যখন ৩৫ বছর পার করেও বিবাহের খরচ মেটাতে সক্ষম হয় না, তখন ওই ব্যক্তি ব্যাংক থেকে চড়া সুদে ঋণ নেয়। এর ফলে ব্যাংকিং সেক্টরের একটি স্থায়ী গ্রাহক তৈরি হয়, যে আগামী ৫-১০ বছর সুদের ঘানি টানে। যেহেতু সুদ হারাম, তাই এই বিবাহের পর পারিবারিক অশান্তি বেশি দেখা যায়।
৭. তালাকের পদ্ধতি	মুসলমানদের কাছে তালাক অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলেও একে যায়েজ করা হয়েছে। তালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক বিবাহবন্ধনের অবসান হয়। তবে ইদ্দত পালনের বাধ্যবাধকতা এবং রাগের মাথায় হুট করে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার যে নিয়মগুলো আছে, তা মূলত পরিবারকে টিকিয়ে রাখার শেষ সুযোগ দেয়। তবে চূড়ান্ত তালাকের পূর্বে বরের পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং কনের পরিবার থেকে একজন সালিশ উপস্থিত করে বর-কনে উভয়েই নিষ্পত্তি চাইবে। কিন্তু ঝগড়া চলাকালীন যদি স্বামী হুশ-জ্ঞান হারিয়ে সম্পূর্ণ উন্মাদ না হয়ে যায়, তবে রাগের মাথায় দেওয়া তিন তালাকও তিন তালাক হিসেবেই গণ্য হবে। মানুষ সাধারণত রাগের মাথায়ই তালাক দেয়, তাই রাগ তালাক না হওয়ার কোন কারণ হতে পারে না।	ইবলিশ প্রতিদিন তার দলবলের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করে। ইবলিশের দলের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উচ্চ পুরস্কার পায় যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ও বিচ্ছেদ করাতে পারে। ইবলিশ যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগায় তখন কাফেরদের আইনগুলো বিবাহবিচ্ছেদকে সহজ করে দেয়, যাতে অল্পতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদের কারণে পরিবার যখন ভেঙে যায় তখন সন্তানরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, যা পরবর্তী প্রজন্মের অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে কাফেরদের কারণ ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদের আইনের প্রভাবে তুচ্ছ কারণে সংসার ভেঙে যায়। সংসার ভাঙার পরে আইনজীবী এবং বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শেষ করতে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়, যা কাফেরদের আইনকে আয়ের উৎস বানিয়ে দেয়।
৯. বিবাহের প্রভাব	মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক ব্যবসানীতি থাকায় কিছু লোকের হাতে সম্পদ জমতে পারে না, বরং সম্পদ সাধারণ মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়। এর ফলে যুবকেরা খুব অল্প বয়সেই অর্থনৈতিকভাবে সচল ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পায়। সাহাবায়ে কেরামদের যুগে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরপরই বিবাহ করা ছিল একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সেই ঐতিহাসিক ধারা অনুসরণ করে মুসলমানরা বর্তমানেও দ্রুত বিবাহকে উৎসাহিত করে। যার ফলে সমাজ থেকে ধর্ষণ ও যিনা-ব্যভিচারের মতো অপরাধ কমে যায়। অপরাধ কমার কারণে পরিবার হয় মজবুত আর সমাজ হয় সুশৃঙ্খল।	বর্তমানে বাংলাদেশে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আইনের কারণে বিবাহ বিলম্বিত হয়। বিবাহ বিলম্বিত হওয়ার কারণে বাণিজ্যিক প্রসব পদ্ধতি সিজার দেশে বৃদ্ধি পায়। সিজার পদ্ধতির কারণে নারী হয় পঙ্গু আর সন্তান হয় দুর্বল। দেশে নারী ও শিশুদের পঙ্গু করার জন্য ইওসি গর্ভবতী ভাতার নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ইওসি প্রকল্পগুলো নারীদের স্বাভাবিক সন্তান প্রসব ক্ষমতা কমিয়ে আনে যা পরোক্ষভাবে হাসপাতাল সমূহের আয় ৫-১০ গুণ বাড়িয়ে দেয়। এবং দেশে আইভিএফ-টেস্টটিউব বেবি সেন্টার ও ফার্মাসিউটি ক্যালস গুলোর ব্যবসা রমরমা করে তুলে।

পরিবার: বিবাহের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিবার বলে। পরিবার থেকেই একজন শিশু ভালো-মন্দ ও ঠিক-ভুল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়। (আর-রূম: ২১)

পরিবারের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. পরিবার গঠন	মদিনা রাষ্ট্রের মুসলমানদের পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি ছিল লোকমান হাকীম এর সেই ঐতিহাসিক উপদেশ। লোকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে উপদেশ ছলে বলে ছেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করো। চলাফেরায় নম্রতা অবলম্বন করো। কণ্ঠস্বর নিচু করো এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করো। যখন একটি পরিবার নিজ শিশুকে লোকমান হাকীম-এর মতো শিক্ষা দিবে তখন সেই শিশু হবে অহংকারমুক্ত, নম্র ও চরিত্রবান।	বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান পরিবার গঠন করে খ্রিষ্টানদের পরিবার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে। খ্রিষ্টানরা পরিবারের সদস্যদেরকে প্রথমে কোন ধর্মীয় শিক্ষা দেয় না। খ্রিষ্টানরা শুরু থেকে ক্যারিয়ার ও বিলাসিতাকে সফলতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে। পৃথিবীর সফলতার জন্য নারীরা যখন অল্প বেতনে চাকরি করে তখন মা হিসেবে নারীর দায়িত্ব কমে যায়। দায়িত্বহীন পরিবারের সদস্যরা দ্রুত বেপর্দা ও যিনার কাজে লিপ্ত সেলিব্রিটিদের অনুসারী হয়ে যায়।
২. পারিবারিক শিক্ষা	হে মুসলমান! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজ পরিবার -পরিজনকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। মুসলমানদের স্বর্ণযুগে প্রতিটি পরিবার তার সন্তানদের শেখাত বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, কীভাবে খাবে, কীভাবে দাঁড়াবে এবং মেহমান আসলে কীভাবে কথা বলবে। পরিবারের প্রত্যেক পিতা একেকজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই আল্লাহ তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। প্রতিটি পিতা তার সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না।	পশু যেমন পশুর জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা ঠিক করতে পারে না, ঠিক তেমনি মানুষ মানুষের জন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলা ঠিক করতে পারে না। মানুষ হিসেবে আমার কাছে যেটা নিয়ম, অন্যের কাছে সেটা অনিয়ম। পৃথিবীতে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা নিজেদের জন্য আদব-কায়দার নিয়ম ঠিক করে। যার ফলে খ্রিষ্টান আদর্শের পরিবারে জন্মের পরে আদব-কায়দা হিসেবে নাচ-গান আর সামাজিক উৎসব হিসেবে সমাজে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। ফলে সন্তানরা বড় হয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে প্রত্যেক পাপাচারী ব্যক্তির পূজা করে।
৩. পারিবারিক চর্চা	রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহসমূহ মুসলমানরা পারিবারিক ভাবে চর্চা করে। যেমন—দাড়ি রাখা, সাহাবাদের ন্যায় শালীন পোশাক পরা, দস্তরখানায় খাওয়া, ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া, পর্দার আইন মেনে চলাসহ ইসলামের প্রতিটি ফরজ আইনের চর্চা করে। ইসলাম অভিভাবককে শুধু শাসক হিসেবে দেখে না, বরং আদর্শ চর্চা করে পরিবারকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখার মাধ্যম মনে করে।	পতিতাবৃত্তি এই কাজটি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। যার কারণে ইসলামের আইনে এই কাজের শাস্তি রাখা হয়েছে। যে জাতির মধ্যে আদর্শের কোন মাপকাঠি নেই, সেই জাতি ইবলিশকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। ইবলিশের আদর্শ হলো সমাজে পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে দেওয়া। স্বাধীনতার নাম দিয়ে পতিতাবৃত্তি সমাজে ছড়িয়ে পড়ার কারণে নারীরা গরমের দোহাই দিয়ে পতিতাদের মতো ওড়না ছাড়া পোশাক পরে।
৪. পারিবারিক অভ্যাস	ইসলামের কিছু কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় আইন করে শেখানো যায় না। এই সকল কার্যক্রম হলো পারিবারিক অভ্যাসের বিষয়। ইসলাম পারিবারিক অভ্যাসের ব্যাপারে মুসলমানদের জন্য কিছু দিকনির্দেশনা দিয়েছে। যেমন— তিন সময় শয়নকক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া, শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুরুষের অভিভাবকত্বে পরিবার গঠন, প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে সচেতন থাকা, পরিবারের ছোটখাটো ভুল ও দোষ গোপন রাখা, হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করা।	বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা নামে একটি মন্ত্রণালয় আছে যার কাজ হলো কীভাবে ইসলামিক অভ্যাসগুলো মুসলমানদের পরিবার থেকে দূর করা যায় তা চিন্তা করা। এই মন্ত্রণালয়ের চিন্তার সহযোগী হিসেবে খ্রিষ্টান সংস্থাগুলো কাজ করে। যেমন— UNFPA, USAID, GAC, মেরি স্টোপস, Ipas, PSTC, ICDDRB, Jhpiego। খ্রিষ্টান এই সংস্থাগুলো অধিকাংশ নারীদের গর্ভপাত বিষয়ে কাজ করে। অর্থাৎ মানুষের দুর্বল বিষয়গুলোকে সামনে রেখে তারা মুসলমান পরিবারসমূহে প্রবেশ করে খ্রিষ্টান মতাদর্শ প্রবেশ করিয়ে দেয়।
৫. পারিবারিক পরিচয়	আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন পালক পুত্রকে তার পিতার পরিচয়ে ডাকতে। আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। মুসলমানদের জন্য ফরজ বংশ পরিচয় রক্ষা করা। তাই কেউ সন্তান দত্তক নিলেও তার আসল বাবার নাম পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ। এই আইন সন্তানকে একটি পরিচয় দেয়। এই পরিচয়ের মাধ্যমে ওই ব্যক্তি সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করতে পারে পরিবারে কার সাথে কার বিবাহ যায়েজ আর কার সাথে বিবাহ হারাম।	বর্তমানে খ্রিষ্টান দেশগুলোতে ভাড়াটে গর্ভাশয়ের মতো বিষয়গুলো বৈধ। বাংলাদেশেও কিছু সংখ্যক লোক গোপনে এই কাজ করে। ভাড়া করে গর্ভধারণ ও দত্তক নিয়ে পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা অনেক শিশু আছে যারা জানেই না তাদের আসল বাবা-মা কে। শিশুদের পরিচয় গোপনের ফলে ভবিষ্যতে হারাম ব্যক্তিদের সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ার মতো জেনেটিক বিপর্যয় ঘটতে পারে এবং পরিচয়হীনতা বাড়তে পারে।

পরিবারের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. পারিবারিক নিয়ম	পরিবারের কর্তা যখন সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে পরিবারের সদস্যদেরকে যে সকল নির্দেশ দেন, তখন তা পারিবারিক নিয়ম হয়ে যায়। মুসলমান পরিবারের কর্তাদের জন্য ইসলাম কিছু নিয়ম দিয়েছে। যেমন— নারীরা মাহরাম ব্যতীত সাজসজ্জা ও রূপ প্রকাশ করতে পারবে না, সাহাবাদের ন্যায় সকলে ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করবে, পর্দার মর্যাদা রক্ষার্থে নারীরা উচ্চস্বরে কথা বলবে না, বহিরাগত পুরুষরা নারীদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলবে, মোবাইল কম ব্যবহার করবে, মিথ্যা কথা বলবে না, এশার নামাজ শেষে ঘুমিয়ে যাবে, ফজরের সময় উঠে যাবে।	মুসলমানদের স্বর্ণযুগ থেকে চলে আসা ইসলামিক পারিবারিক নিয়মগুলো বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কারণে সমাজ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। যেমন— বাইরে বের হওয়ার সময় এখনকার নারীরা অধিক সাজসজ্জা করে বের হয়। তারা কাদেরকে দেখানোর জন্য নিজের রূপ প্রকাশ করে তা নারীরা নিজেরাও জানে না। সাহাবাদের ন্যায় ঢিলেঢালা পোশাক না পরে খ্রিষ্টানদের মতো শারীরিক কাঠামো দেখা যায় এমন পোশাক পরে। আর দেরিতে ঘুমানো এখন পারিবারিক নিয়ম। এভাবে চলতে থাকলে মুসলমানদের পরিবার সমূহ এক সময় খ্রিষ্টান পরিবারে পরিণত হয়ে যাবে।
৬. পারিবারিক আয়	মুসলমান পুরুষের নিকট নারী অনেক মূল্যবান। তাই মূল্যবান বস্তুকে মুসলমানরা অবহেলা করে না। মুসলমানদের স্বর্ণযুগে পুরুষ আয় করত, আর নারীরা তার পরিবার রক্ষা করত। পারিবারিক রক্ষণাবেক্ষণ করে নারী যদি হাতের কাজের পণ্য তৈরি করতে পারত, তখন ওই পণ্য পুরুষ বাজারে বিক্রয় করত; এতে পরিবার স্বাবলম্বী হতো। কিন্তু নারীর হাতে সরাসরি অর্থ আসত না। নারীর হাতে সরাসরি অর্থ না আসার কারণে নারীর চাহিদা ও স্বাধীনতার তেমন প্রয়োজন থাকত না। মুসলমানদের স্বর্ণযুগ থেকে এইভাবেই মুসলমানদের পুরুষতান্ত্রিক পরিবার গঠিত হতো।	বর্তমানে খ্রিষ্টানরা নারীদের আয়ের উৎস বানাচ্ছে। খ্রিষ্টানদের জাতিসংঘ নারীদের জন্য কাজের বিনিময়ে অর্থ প্রদান নামে কিছু প্রকল্প চালু করেছে, যার ফলে নারীরা সরাসরি অর্থ উপার্জনের নেশায় মত্ত হয়। এই নেশা নারীদেরকে গার্মেন্টসে কম বেতনে চাকরি করার প্রতি উৎসাহ জোগায়। নারীদের কম বেতনের শ্রম সরাসরি খ্রিষ্টান দেশসমূহের পোশাকের দাম কমায়। বাংলাদেশে নারীদের সরাসরি অর্থ উপার্জনের লালসা বৃদ্ধি করার জন্য ভিজিডি, স্বপ্ন, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, শক্তি ফাউন্ডেশন, আশা, উই, জয়িতা ফাউন্ডেশন, হার পাওয়ার, আড়ং ও কারুপণ্য কাজ করে।
৭. পরিবার বিক্রয়	নব্বইয়ের দশকে কেউ যদি যিনা করত তাহলে তিন মাস পরে হলেও তা জনসমক্ষে চলে আসত। তখন যিনা করে গোপন রাখা ছিল কষ্টকর কারণ ওই সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ ছিল না। ফলে সামাজিক সম্মান রক্ষার ভয়ে পরিবার থেকে পরপুরুষের সাথে দেখা করা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। কিন্তু যখন থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ সস্তা হয়েছে, তখন থেকে যিনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বর্তমানে গণহারে যিনা বন্ধে প্রয়োজন জন্মনিয়ন্ত্রণ পণ্য বিক্রয় আইন।	খ্রিষ্টানদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক। যার কারণে পরিবারে সন্তান যাতে বেশি না হয় তার জন্য পিল, কনডম, ইনজেকশনকে দেশে স্বাভাবিক করা হয়েছে। কিন্তু যখন প্রতিটি দোকানে এই সব উপকরণ পাওয়া যায় তখন দেশে যিনার পরিমাণ ১০ থেকে ১০০ গুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে এই সব উপকরণ স্বাভাবিক হওয়ার কারণে সমাজে যে কেউ যিনা করে পার পেয়ে যেতে পারে। আজ আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েকে এই সকল উপকরণের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছি।
৮. পারিবারিক পবিত্রতা	মুসলমানদের জন্য অন্যের ঘরে উঁকি দেওয়া ও বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি ঘরের ভেতরের কথা বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা বাইরে বলা কবিরা গুনাহ। এই আইন পরিবারকে একটি পবিত্র দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলে যেখানে পরিবারের সদস্যরা নিরাপদ বোধ মনে করে।	বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের প্রদর্শনী পরিবারকে একটি বাজারে পরিণত করেছে। মানুষ লাইক-ভিউ পাওয়ার জন্য নিজের বেডরুম পর্যন্ত ক্যামেরায় তুলে ধরছে। এর ফলে পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস ও পরকীয়া বাড়ছে।
৯. পারিবারিক প্রভাব	ইসলামমুখী পরিবার গঠন করলে নারীরা ঢিলেঢালা পোশাকের মাধ্যমে শালীনতা রক্ষা করে। নারীরা শালীন থাকলে সমাজ থেকে অশ্লীলতা দূর হয়ে যায়। অশ্লীলতা মুক্ত জীবন হয় বরকতময়। যেমন— এশার পর দ্রুত ঘুমানো এবং সকলে মিলে দস্তরখানায় খাওয়া। এই সকল আদর্শ ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি কমিয়ে দেয়, যা সামাজিক সম্মান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে। মুসলমান দের এই সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন কাফেরদের জন্য দাওয়াহ হিসেবে কাজ করে।	বর্তমানে মুসলমানরা বিলাসিতার পেছনে ছুটে তরুণ অধিক সময় পার করে ফেলে। তরুণ বয়সে বিবাহ না করার কারণে সমাজে যিনা বৃদ্ধি পায়। তরুণ বয়সে যিনা করার কারণে বৃদ্ধ বয়সে নারীদের সন্তান গ্রহণ করতে হয়। দেরি করে সন্তান গ্রহণ করার কারণে দেশে সিজার করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণ সিজার হাসপাতালের আয় এবং পরবর্তী ওষুধের খরচ অনেক বাড়িয়ে দেয়। সিজার প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে বিলিয়ন ডলারের বাজার তৈরি করে।

মূল্যবোধ: ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল সম্পর্কে সঠিক ধারণাকে মূল্যবোধ বলে। ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো করার জন্য মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়। মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে আজ মুসলমানরা সঠিক পথ পায় না। (আলে-ইমরান: ১১০)

মূল্যবোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. মূল্যবোধের ভিত্তি	রাসূল (সা.)-এর ওপর আল-কোরআন নাজিল হয়েছে। তিনি সেই অনুযায়ী সাহাবীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যাতে পরবর্তীদের জন্য ঈমানের মানদণ্ড হয়। আল-কোরআন হলো মুসলমানদের ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুল নির্ণয়ের ভিত্তি। আল-কোরআন ভালো-মন্দকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। আল-কোরআনের দৃষ্টিতে যা সত্য, তা কিয়ামত পর্যন্ত সত্য; আর যা হারাম, তা সব যুগেই হারাম। যেমন—আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুসলমানদের জিহাদ করা ফরজ। মুসলমানদের জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ থাকবে, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা একে জঙ্গি বলুক আর যাই বলুক।	বর্তমানে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আল-কোরআনের বিপরীতে মন্দকে-ভালো এবং ভালোকে-মন্দ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ভালো-মন্দের অনুসরণ করে ইবলিশের অপকর্মের ওপর ভিত্তি করে। মুসলমান হলে আপনি দেখবেন আল-কোরআন ইবলিশের অপকর্ম বলে যে সকল বিষয় উল্লেখ করেছে, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ওই সকল অপকর্মকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। যেমন—ইবলিশ চায় মানুষের মধ্যে যিনা, সমকামিতা, সুদ, বিবাহ বিচ্ছেদ ও অশ্লীলতার বিস্তার হোক। আপনি দেখবেন ইবলিশের এই চাওয়াকে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা নিজেদের সামাজিক রীতি বানিয়ে নিয়েছে।
২. মূল্যবোধের ব্যবহার	মদিনা রাষ্ট্রের মুসলমানরা আল-কোরআনের আলোকে মূল্যবোধকে ব্যবহার করে মানুষের মন থেকে জাহেলি যুগের আইন-নিয়ম দূর করেছিলেন। আল-কোরআনের আলোকে ভালো-মন্দকে মানুষের মনে গেঁথে দিতে সাহাবায়ে কেরাম মূল্যবোধকে ব্যবহার করতেন। যেমন—জাহেলি যুগে মদ পান করা ছিল সামাজিক রীতি। আল্লাহ যখন মদ পান করা হারাম করেন, তখন সবাই মদ পান করাকে ঘৃণা করে। এখানে মানুষের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক রীতিকে ঘৃণায় রূপান্তর করতে মূল্যবোধকে ব্যবহার করা হয়।	বর্তমানে ইবলিশের মূল্যবোধকে ব্যবহার করে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা মানুষের মনে জাহেলি যুগের আইন-নিয়ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। আজ ইবলিশের মূল্যবোধের কারণে মুসলমানরা আল-কোরআনের আলোকে ভালোকে ভালো, মন্দকে মন্দ বলে না। যেমন—আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মুসলমানরা যখন গণতন্ত্রের নাম দিয়ে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আইন মানে, তখন মুসলমান পরোক্ষভাবে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে ইবলিশের আইন কবুল করে নেয়। কারণ গণতন্ত্রের নিয়মই ইবলিশের আদর্শ।
৩. মূল্যবোধের রাজনীতি	আল্লাহর সকল নাম সুন্দর। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য মুসলমানরা ইসলামিক নামগুলো ব্যবহার করে। ইসলামিক নামের ফলে মুসলমানদের কথাবার্তায় আল্লাহর স্মরণ ফুটে ওঠে। কিন্তু মুসলমানদের চিন্তায় আঘাত করার জন্য খ্রিষ্টানরা ইসলামের অনেক পবিত্র শব্দকে সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত করে। যেমন— শরিয়া, জিহাদ, খিলাফত। খ্রিষ্টানদের আতঙ্কের চক্রান্তের ফলে আজ মুসলমানরা নিজেদের শব্দগুলো বলতে ভয় পায়।	মুসলমানদের শব্দগুলোকে খ্রিষ্টানরা যেমন আতঙ্কের শব্দ বানিয়েছে তার জন্য মুসলমানদের উচিত তাদের কিছু শব্দকে অপমানিত করা। খ্রিষ্টানদের শব্দগুলো অপমানিত হলে মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের অহংকার কমবে এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানরা উপযুক্ত শিক্ষা পাবে। যেমন—মুসলমানরা যারা জুতা সেলাই করে তাদেরকে স্যার বলবে; যারা সুইপার তাদেরকে জজ বলবে এবং যারা দুর্নীতিবাজ তাদেরকে সভাপতি বল বে। এই শব্দগুলো খ্রিষ্টান দালালদের রাগান্বিত করবে।
৪. মূল্যবোধের স্বাধীনতা	রাসূল (সা.)-এর সময়ে মুসলমানরা স্বাধীনতা বলতে বুঝত মানুষের আইন বাদ দিয়ে আল্লাহর আইন মান্য করা। মদিনা রাষ্ট্রের মুসলমানরা নাচ, গান, যিনা, মদ, সুদ ও অশ্লীলতাকে অনেক ঘৃণা করত। ঘৃণার মাত্রা এত বেশি ছিল যে, যে ব্যক্তি এই কাজ করত তাকে শাস্তি দেওয়া হতো। যার প্রভাব বাংলার মুসলমানরা নব্বইয়ের দশকেও দেখেছে। যেমন—নব্বইয়ের দশকে কোন ব্যক্তি সুদ খেলে তাকে সকল মুসলমান ঘৃণা করত এবং বিবাহ ব্যতীত ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলা মেশা তো দূরের কথা, জনসম্মুখে একসাথে হাঁটাকেও যিনা মনে করা হতো। এই সকল অশ্লীল কাজকে মুসলমানরা হারাম হিসেবে জানে। মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ও ইবলিশের কার্যকলাপের কোন স্বাধীনতা নেই।	বর্তমানে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মুসলমানদের ইবলিশের আইন মানতে বাধ্য করে। বর্তমানে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের নামে মুসলমানরা যে সকল আইন মানে তার প্রতিটি আইনের উৎস হলো ইবলিশ। খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক আইনের কারণে সমাজে আজ নাচ, গান, যিনা, মদ, সুদ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। যেমন—বর্তমানে আপনি মদ বন্ধ করতে যাবেন, গণতান্ত্রিক সরকার বলবে দেশের আয় কমে যাবে; আপনি নাচ-গান বন্ধ করতে যাবেন, গণতান্ত্রিক সরকার বলবে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে; আপনি সুদভিত্তিক ব্যবসা বাদ দিতে পারবেন না কারণ খ্রিষ্টানরা চলে সুদভিত্তিক ব্যবসা দিয়ে। মূলত গণতন্ত্র সুকৌশলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে মুসলমানদের কে ইবলিশের পূজা করায়।

মূল্যবোধের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. মূল্যবোধের প্রয়োগ	মুসলমানদের মদিনা রাষ্ট্রে একজন মুসলমানের সাথে অন্য জনের দেখা হওয়া মাত্রই একে অপরের সাথে সালাম বিনিয়ম ও মুসাফাহা করত। তখন মুসলমানরা গুড নাইট-এর পরিবর্তে একে অপরের জন্য আল্লাহ হাফেজ বলে দোয়া করত এবং মুসলমানরা গুড মর্নিং-এর পরিবর্তে সালাম বিনিময় করত। তখন মুসলমান দের দুই চোখ আল-কোরআনের পাতায় থাকত। মদিনা রাষ্ট্রে মুসলমানরা আল্লাহর হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করতেন, এতে কোন সন্দেহ রাখতেন না এবং তখনকার মুসলমানরা জিহাদের জন্য একে অপরকে উৎসাহিত করতেন।	খ্রিষ্টানরা ইবলিশের হয়ে মুসলমানদের ভালো-মন্দ ও সঠিক-ভুলের মধ্যে পরিবর্তন করে দেয়। যখন খ্রিষ্টানরা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের ভেতরে গুড নাইট, গুড মর্নিং, থ্যাংকস প্রবেশ করিয়ে দেয় তখন মুসলমানদের ইসলামিক মূল্যবোধ নষ্ট হতে শুরু করে। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের দোয়ার স্থানসমূহে তাদের বস্তুবাদী শব্দ গুলো প্রবেশ করিয়ে দেয়। যার কারণে মুসলমানরা দিন দিন কাজকর্মে ইবলিশের অনুসারী হয়ে যায়। যেমন—বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে এক দল আছে যারা ইবাদতে সাহাবাদের অনুসারী কিন্তু পোশাকে ও আদর্শে খ্রিষ্টানদের অনুসারী।
৬. মূল্যবোধের ব্যবসা	মুসলমানরা জান্নাত পাওয়ার জন্য মূল্যবোধের ব্যবসা করে। মানুষ যখন আল-কোরআন অনুসারে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলে, তখন সমাজে পবিত্রতা চলে আসে। যেমন— বাবা-ছেলে যখন একসাথে বাইরে বের হয়, তখন কোন নারী যদি অশ্লীল পোশাক পরে তাদের সামনে দিয়ে যায়, তখন বাবা-ছেলের মধ্যকার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। আল-কোরআনের নির্দেশ অনুসারে মানুষ যখন জীবনযাপন করবে, তখন সমাজের পবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। যুগের পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু আল-কোরআনের আলোকে মুসলমানদের মূল্যবোধের কোন পরিবর্তন হয় না।	আল্লাহ মানুষকে যা নিষেধ করেছেন ইবলিশ তা করানোর জন্য চেষ্টা করে। ইবলিশের এই চেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দেয় ইহুদী-খ্রিষ্টানরা। যেমন—আপনার মেয়ে এখন প্রেম করে, যাকে বর্তমান বাংলাদেশে বলে পরস্পরকে চেনা। প্রেমের নামে পরস্পরকে চিনতে গেলে যিনা হয়। আর যিনা হলে হোটেল ব্যবসা, গর্ভপাত ক্লিনিক এবং পর্নোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রির বিশাল বাজার তৈরি হয়। হারাম বাজারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সবার হাতে মোবাইল ধরিয়ে দেয়। মোবাইলের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করে টেক জায়ান্টরা বিশাল ডেটা সেন্টার খুলে ব্যবসা করে।
৭. মূল্যবোধের নৈতিকতা	আল্লাহর পথে অর্থাৎ আল্লাহর আইন ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেসব মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে যাতে জীবত মুসলমানরা মৃত না বলে। বরং ওই সকল মৃত মুসলমানরা আল্লাহর কাছে জীবিত কিন্তু জীবিত মুসলমানরা তা অনুভব করতে পারে না। আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণকারীদের উপাধি হলো শহীদ। আল্লাহর আইন ও রাসূল (সা.)-এর রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে মুসলমান মারা যান তাকে আল্লাহ শহীদ বলেছেন। আল-কোরআনের আইন অনুসারে যে মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা মানবে না মুসলমানদের দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি হলো সর্বোচ্চ উগ্র ও জঙ্গি।	বাংলাদেশে অনেক সৈন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, যাদেরকে রাষ্ট্র শহীদ বলে। যেই মুসলমান সৈন্য খ্রিষ্টানদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায় সেই সৈন্য কীভাবে শহীদ হয়? বর্তমান সৈন্যরা যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিরাপত্তা না দিত তাহলে বাংলাদেশে এক মাসের মধ্যে আল্লাহর আইন ও রাসূল (সা.)-এর রাষ্ট্রব্যবস্থা বাস্তবায়ন হয়ে যেত। বাংলাদেশের মুনাফিক সৈন্যরা আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারীদের জঙ্গি বলে নির্মম নির্যাতন করে। অথচ খ্রিষ্টান আইনের বিপক্ষে বিদ্রোহকারীদেরকে কাফেররা জঙ্গি বলে।
৮. মূল্যবোধের সৌন্দর্য	ইসলামিক মূল্যবোধসম্পন্ন মুসলমানরা আল্লাহকে বেশি স্মরণ করার উদ্দেশ্যে হাতে তসবিহ রাখে, ডান হাতে খাবার খায়, ডান হাতে খাবার দেয়, বেশি বেশি সালাম দেয়, নিচু স্বরে কথা বলেন, হাঁটুর ওপরে কাপড় পরেন না, সাহাবাদের ন্যায় পোশাক পরিধান করে, সকালে ও দুপুরে বেশি খাবার খায় রাতে কম খায়, পুরুষ-পরনারী একসাথে আড্ডা দেন না, আল-কোরআন নিজ ভাষায় বুঝে পড়ে এবং আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রকাশ্যে জিহাদ করে।	ইবলিশের মূল্যবোধসম্পন্ন মুসলমানরা যেসকল কাজ করে, মোবাইলকে বেশি স্মরণ করে, কাজকর্মে বাম হাতের ব্যবহার করে, সালামে কৃপণতা করে, উঁচু স্বরে কথা বলে, ছোট কাপড় পরিধান করে, অশ্লীল পোশাক পরিধান করে, বিবাহ ব্যতীত পুরুষ-নারী একসাথে চলাফেরা করে, রাতে বেশি খায়, আল্লাহর আইনসমূহ নিয়ে আলোচনা করে না, ফিকহি মাসয়ালা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে এবং কাফের ও ইহুদী-খ্রিষ্টয়ানদের ভয় করে। যেভাবে আল্লাহকে ভয় করার দরকার ছিল।
৯. মূল্যবোধের প্রভাব	মুসলমানদের মধ্যে সবাই মনে করে যেই ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা উনি জন্ম থেকে কোন দিন পাপ কাজ করেন নাই। অথচ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে সর্বোচ্চ আল্লাহওয়ালা হলো সাহাবারা। আর সকল সাহাবা জন্ম থেকে আল্লাহওয়ালা ছিলেন না। জন্ম থেকে আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার বৈশিষ্ট্য থাকে নবী-রাসূলদের।	রাসূল (সা.) বলেছেন তিনি শেষ নবী। অর্থাৎ তাঁর পরে আর কেউ জন্ম থেকে আল্লাহওয়ালা হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখন মুসলমানদের মধ্যে যারা মনে করে আমিরুল মুমিন হতে হলে জন্ম থেকে আল্লাহওয়ালা হতে হবে, তাদেরকে মূলত ইবলিশ ধোকা দিয়েছে যাতে তারা নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে না পারে।

চিকিৎসা: মানুষের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুস্থতার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে চিকিৎসা বলে। মানুষের অসুস্থতা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর, স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্যের উপর, আর খাদ্য আসে জমিন থেকে। খাদ্যে সমস্যা থাকলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে এবং চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। (আন-নাহল: ৬৯)

চিকিৎসার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. চিকিৎসার ভিত্তি	মুসলমানদের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সিনার কথা সবাই জানে। তাঁর চিকিৎসায় অ্যালোপ্যাথিকের মতো রোগ বারবার ফিরে আসত না; তিনি ভেষজ ও উদ্ভিদ জাত ওষুধ তৈরি করতেন। ইবনে সিনা শুধু রোগের চিকিৎসা না করে রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসা করতেন, যার কারণে রোগ বারবার ফিরে আসত না। ইবনে সিনার উদ্ভিদ ভিত্তিক চিকিৎসার ফলে মানুষের প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ছিল। বর্তমানে ইবনে সিনার চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিও এবং ইউনানিতে দেখা যায়।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা নিজেদের আবিষ্কারকে আধুনিক বলে। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিকে আধুনিক চিকিৎসা বলা হয়। তবে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা চিকিৎসার উন্নত সংস্করণ মুসলিম বিজ্ঞানীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ইবনে সিনা তাঁর আল-কানুন ফিত-তিব্ব গ্রন্থে পাঁচ শতাধিক উদ্ভিজ্জ ওষুধের বর্ণনা দিয়েছেন, যা ৮০০ বছর ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়ানো হয়েছে। ইবনে সিনা বিশ্বাস করতেন, দেহ ও মন আলাদা নয়। তবে খ্রিষ্টানরা চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার পরে সেবার পরিবর্তে চিকিৎসাকে আয়ের উৎস বানিয়ে ফেলেছে।
২. রোগ নির্ণয়	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে বাগদাদ ও কর্ডোভার হাসপাতাল গুলোতে রোগ নির্ণয় করার জন্য ত্বকের রঙ, চোখ, শ্বাস-প্রশ্বাস, রোগীর খাদ্যাভ্যাস, রোগী কোথায় বাস করেন, রোগীর পরিবারের কারো এই রোগ আছে কি না, তার মানসিক অবস্থা কেমন—এই সকল বিষয়ের ওপর নির্ভর করে হাসপাতাল গুলো প্রাথমিক চিকিৎসা দিত। তবে প্রাথমিক চিকিৎসায় উন্নতি না হলে মূত্র ও মল পরীক্ষা করা হতো। তখন মুসলমানদের হাসপাতাল গুলোতে ওষুধের পাশাপাশি আল-কোরআনের তিলাওয়াত এবং আধ্যাত্মিক প্রশান্তিকে চিকিৎসার অংশ মনে করা হতো।	খ্রিষ্টানরা চিকিৎসা ব্যবস্থায় আধ্যাত্মিকতাকে অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দেয়। খ্রিষ্টানরা রোগীকে একটি মেশিন মনে করে। ফলে সকল অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার সাধারণ রোগগুলো লক্ষণভেদে চিকিৎসা না দিয়ে মেশিনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। ছোট-বড় রোগের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেওয়ার কারণে মানুষের ভেতর থেকে নৈতিকতা ও ধৈর্য হারিয়ে যায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় রোগ মেশিননির্ভর হওয়ার কারণে বিশ্বে মানসিক রোগীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে এবং ওষুধের ওপর নির্ভরতা মানুষকে ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেয়।
৩. ওষুধের উৎস	মুসলমান চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনা প্রথম ওষুধের সাথে ফলের রসের প্রয়োগ শুরু করেছিলেন। যেমন—আপনি দুই বছরের কম বয়সী বাচ্চাকে হোমিও ওষুধ খাওয়াবেন, সে স্বাভাবিকভাবেই তা খাবে এবং সে বারবার ওষুধ খেতে চাইবে। কারণ প্রাকৃতিক ওষুধের মিষ্টতা ও ঘ্রাণ মানুষের প্রাকৃতিক ফিতরাতের সাথে খাপ খায়। হোমিও ওষুধে প্রাকৃতিক উপকরণ থাকার কারণে বাচ্চারা ওষুধ খেতে অনীহা প্রকাশ করে না।	খ্রিষ্টানদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় শিশুদের জন্মের পর থেকে রাসায়নিক মিশ্রিত সিরাপ ও ড্রপ দেওয়া হয়। কেমিক্যাল মিশ্রিত ওষুধের তিক্ততা শিশুর মনে ভীতি তৈরি করে এবং ওষুধ শিশুর লিভারের ওপর চাপ ফেলে। জোর করে এসব খাওয়ানোর ফলে শিশুর রুচি নষ্ট হয় এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে শিশু খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়ে। কেমিক্যাল মিশ্রিত অ্যালোপ্যাথি ওষুধ শিশুর স্নায়ুতন্ত্রকে অসুরক্ষিত করে তোলে।
৪. টিকার উপকরণ	হযরত উমর (রা.)-এর সময় সিরিয়ায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি সংগনিরোধ ও প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থতার পথ বেছে নেন, যা আজ আধুনিক বিজ্ঞান মানছে। ইসলাম মুসলমানদের শরীরের পবিত্রতা ও রক্তের বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেয়। মুসলমানদের রক্তে কোন অপবিত্র বস্তু প্রবেশ করলে তা ইবাদতের তৃপ্তি নষ্ট করে দেয়। যেমন—মুসলমান শিশুদের ৯ মাস এবং ১৫ মাস বয়সে যে হাম ও রুবেলার টিকা দেওয়া হয়, তার অনেকগুলো ব্র্যান্ডে স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে শুকরের আঠালো প্রোটিন ব্যবহার করে। এমনকি মুখে খাওয়ার পোলিও টিকার তরল মিশ্রণটি স্থিতিশীল রাখার জন্য কিছু ক্ষেত্রে শুকরের প্রোটিন ব্যবহার করা হয়। টিকার সাথে শুকরের হারাম উপকরণ মুসলমানদের শরীরের পবিত্রতা নষ্ট করে।	বর্তমান টিকাদান কর্মসূচির আড়ালে বিষাক্ত পারদ-থিমেরোসল এবং শুকরের জেলাটিন সরাসরি মানুষের রক্তে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে বিষাক্ত পারদ আর অ্যালুমিনিয়াম লবণ মিশ্রিত হয়ে ব্রেইন ফগ তৈরি হয়, যা তরুণ প্রজন্মকে গভীর ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। এবং টিকাতে ফরমালডিহাইড এবং বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএ-র অংশ দেওয়া হয়। এই সকল ক্ষতিকর উপাদান মানুষের রক্তে সরাসরি প্রবেশ করলে মানুষের প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রাকৃতিক বিচার-বুদ্ধিহীন প্রজন্ম কেবল আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে মুসলমান শিশুদের খ্রিষ্টানরা ফ্রি টিকা দেয়। আসলে মুসলমানদের খ্রিষ্টানরা ফ্রি টিকা দেয় কেন তা কি কখনো মুসলমানরা চিন্তা করেছে?

চিকিৎসার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. টিকার প্রভাব	পুরুষ ও নারীর প্রজনন ক্ষমতাকে মুসলমানরা আল্লাহর নিয়ামত মনে করে। মুসলমানদের শাসনামলে মা ও শিশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র থেকে ভাতা দেওয়া হতো। তখন স্বাভাবিক প্রসব ছিল মুসলমানদের সাধারণ নিয়ম। স্বাভাবিক প্রসবের ফলে মা ও সন্তান উভয়েই দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা লাভ করে। মুসলমান নারীরা সুস্থতার ওপর ভিত্তি করে অধিক সন্তান গ্রহণ করে।	বর্তমানে খ্রিষ্টানরা স্বাস্থ্যের নামে নারীদের পিল ও ১২-১৫ বছর বয়সে ইনজেকশন দেয় যা জরায়ুর সংকীর্ণতা তৈরি করে। সংকীর্ণ জরায়ু দিয়ে স্বাভাবিক সন্তান প্রসব করা যায় না। ফলে নারীদের সিজারিয়ান অপারেশন করতে হয়। সিজারের কারণে নারীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং নারীরা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে খ্রিষ্টানদের তৈরি ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
৬. কৃত্রিম খাবার	আল্লাহর সৃষ্টি প্রাকৃতিক ফসলের নিজস্ব প্রজনন ক্ষমতা আছে; প্রাকৃতিক খাবারগুলো পুষ্টিতে ভরপুর এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু জিএমও খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রতিনিয়ত কৃত্রিম অ্যান্টি বায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রবেশ করে। যেমন- ব্রয়লার মুরগি, পাঙ্গাস মাছ, হাইব্রিড ফুলকপি ও বাঁধাকপি। এই সব খাবারের কারণে মানুষের শরীরে সাধারণ ওষুধ কাজ করে না। সাধারণ ওষুধ কাজ না করার কারণে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর জন্য নতুন এবং আরও দামি ওষুধ তৈরির সুযোগ হয়। জিএমও খাবারের নিজস্ব প্রজনন ক্ষমতা নেই বললেই চলে, যার প্রভাবে মানুষের প্রজনন ক্ষমতাও দিন দিন হ্রাস পায়।	বাংলাদেশে ISO মান ঠিক রেখে খাবার কোম্পানিগুলো পণ্য উৎপাদন করে। ISO নীতি এসেছে খ্রিষ্টান দেশ গুলোর ওপর ভিত্তি করে। পৃথিবীতে খ্রিষ্টান দেশগুলো শুকরের মাংস খায়। যার কারণে বাংলাদেশের আইসক্রিম, প্যাকেটজাত খাবার ও ক্যাপসুল ওষুধের প্লাস্টিক জাতীয় খোসা তৈরিতে শুকরের চর্বি বা জেলাটিন (E-Numbers) ব্যবহার করা হয়। শুকরের জেলাটিন ব্যবহারের উদ্দেশ্য কেবল খরচ কমানো নয়, বরং মুসলিমদের শরীরে হারাম খাদ্য প্রবেশ করিয়ে রুহানি শক্তি এবং অন্তরের নূর নষ্ট করা। ফলে মানুষের মধ্যে ইবাদতের নূর চলে যায় এবং মানুষ পশুর মতো প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ শুরু করে।
৭. জন্ম নিয়ন্ত্রণ	রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা বেশি সন্তান গ্রহণ করো, যাতে কিয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতের সংখ্যা বেশি হয়। তবে মুসলমান নারীরা শারীরিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে অধিক সন্তান গ্রহণ করে। মুসলমানদের নিয়ম হলো কোন নারী যদি অধিক সন্তান নিতে অক্ষম হয়, তবে পুরুষ চাইলে একাধিক বিবাহ করতে পারবে।	বর্তমানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয় দেখানো হয়। এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য হলো এপিজেনেটিক্স-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট আদর্শের মানুষের সংখ্যাতাত্ত্বিক শক্তি কমিয়ে দেওয়া। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর একটি বিশাল বৈশ্বিক বাজার তৈরি করা। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—রোগী বানাও, মুনাফা লুটো।
৮. চিকিৎসা সেবা	রাসূল (সা.)-এর যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত রুফায়দা আল-আসলামিয়া (রা.) প্রথম ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপন করেন এবং পর্দার সাথে তিনি আহতদের সেবা দিতেন। রাসূল (সা.) নিজে রোগীর সেবা করতেন এবং তিনি সেবিকাদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছেন। খিলাফতের সময় নারীরা সম্পূর্ণ শালীন ও স্বতন্ত্র পোশাক পরে সেবা দিতেন। তৎকালীন নারীরা আম্মাজান আয়েশা (রা.)-এর কাছে ইসলামিক শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যা এবং আরব্য সাহিত্যের শিক্ষা নিতেন। ফাতেমা (রা.)-এর কাছে নারীরা মূলত ধৈর্য, অল্পে তুষ্টি, লজ্জা এবং পর্দার শিক্ষা গ্রহণ করতেন।	বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে গেলে সেবার জন্য আমরা অনেক নারী দেখি। হাসপাতালে ওই সকল নারী বিশেষ ধরণের পোশাক পরেন। নারীদের পোশাকের যে ডিজাইন তা সরাসরি খ্রিষ্টান মিশনারির সিস্টারদের আদলে তৈরি। খ্রিষ্টানরা সেবার আড়ালে বেপর্দা ও খ্রিষ্টান ধর্মীয় প্রতীকের প্রভাব মুসলমানদের অবচেতন মনে গেঁথে দেয়, যাতে মুসলমানরা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে খ্রিষ্টানদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। মুসলমান নারীদের খ্রিষ্টানরা প্রথমে সেবার নাম দিয়ে বাইরে বের করেছে। পরবর্তীতে সেবাকে শিক্ষার সাথে সংযোগ করে প্রতিটি কর্মে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে।
৯. চিকিৎসার প্রভাব	মুসলমানদের রোগ যত কম হবে, অর্থ ও সময়ের অপচয় তত কম হবে। ফলে মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদতে বেশি সময় দিতে পারবে। ইবনে সিনার মতো বিজ্ঞানীদের চিকিৎসা গ্রহণের ফলে মুসলমানদের রোগ কম হতো। পাশাপাশি মানুষের দুশ্চিন্তা কম ছিল এবং ধৈর্য ছিল অনেক বেশি। তৎকালীন মানুষ দ্রুত সুস্থ হওয়ার চেয়ে রোগ থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি পাওয়াই ছিল প্রধান লক্ষ্য, যাতে বারবার চিকিৎসা নিতে না হয়। এর ফলে মানুষের হাসপাতালের খরচ ও যাতায়াত ব্যয় কম হতো এবং মানুষের হাতে বেশি অর্থ থাকত।	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে চিকিৎসা ছিল একটি জনসেবা। বাগদাদের আল-মানসুরি হাসপাতালে ধনী-দরিদ্র সবার চিকিৎসা ছিল বিনামূল্যে এবং সুস্থ হওয়ার পর তাদের বাড়ি ফেরার ভাড়াও দেওয়া হতো। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা হলো মৃত্যুর ফাঁদ, এখানে সামান্য জ্বরেও অগণিত দামি টেস্ট করানো হয়। বর্তমান চিকিৎসার কাঁচামাল ডলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খ্রিষ্টান শক্তিসমূহ মুসলমান দেশগুলোর অর্থ শুষে নেয় এবং ব্যবসায়িক অবরোধের ভয় দেখিয়ে নিজেদের অনৈতিক আইন মানতে বাধ্য করে।

সংস্কৃতি: মানুষের জীবনের অবসর সময়ের ব্যবহারকে সংস্কৃতি বলে। এই সংস্কৃতিকে ব্যবহার করেই মানুষের চিন্তার-মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। (আল-ইনশিরাহ: ৭)

সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. ধর্মীয় সংস্কৃতি	রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরতের পর জাহেলিয়াতের উৎসব বন্ধ করে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার প্রচলন করেন। সংস্কৃতি কেবল আনন্দ নয়, বরং ইবাদত ও দোয়ার অংশ। মুসলমানদের সংস্কৃতি হলো ঈদ, ওমরা, হজ্জ ও রোজা—এই সকল কার্যক্রম। এই সকল ধর্মীয় সংস্কৃতি রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। তবে পরবর্তীতে রাসূল (সা.)-এর স্মরণে ঈদে মিলাদুন্নবী, বদরের যোদ্ধাদের জন্য দোয়া, কারবালার স্মরণে দোয়া, মুসলমান ভাইদের মিলনের জন্য ইজতেমা, শবে বরাত ও শবে কদর মুসলমানদের দোয়ার সংস্কৃতি হিসেবে পালন করা হয়।	খ্রিষ্টানরা জাহেলিয়াত সংস্কৃতি নাচ, গান এবং মাদককে আনন্দের উৎস বানিয়েছে। বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন বাঙালিদের সংস্কৃতি। যখন সংস্কৃতির মধ্যে দুর্গাপূজা, বুদ্ধ পূর্ণিমা, হোলি ও বড়দিনের উৎসবগুলোর মতো বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল নাচ-গান প্রবেশ করে, তখন পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি থাকে না। কাফেররা নিজেদের উৎসবসমূহে অধিক আনন্দের জন্য বাদ্যযন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন গান-বাজনা ও নারী দিয়ে পতিতাদের মতো নাচের উৎসব করে। অশ্লীল উৎসব ব্যক্তিকে তার রুহানি শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।
২. সংস্কৃতির আগ্রাসন	বর্তমানে মুসলমানরা ওয়াজ মাহফিল দিয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন চালায়। তবে ওয়াজ মাহফিল দিয়ে ব্যক্তিকে ইসলামের উপদেশ দেওয়া যায়। আল্লাহর আইন অনুসারে মানুষকে চালানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রব্যবস্থার। মুসলমানদের জন্য সংস্কৃতি কেবল বিনোদন নয়, বরং এটি একটি আদর্শিক যুদ্ধ। খিলাফতের সময় ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি কিছু শারীরিক সংস্কৃতি ছিল, যা হলো ঘোড়দৌড়, তীরন্দাজি ও কুস্তি—যা শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে।	কাফেররা স্কুল-কলেজে নাচ-গান, নাটক, সিনেমা, দিবস ও চারুকলা দিয়ে সংস্কৃতির আগ্রাসন চালায়। মুসলমানদের ওয়াজের বিপক্ষে এই সকল সংস্কৃতিকে কাফেররা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের কাছে সংস্কৃতি কেবল বিনোদন। তারা নাচ-গান, অশ্লীলতাকে আনন্দের উৎস হিসেবে দেখে। অশ্লীলতার কারণে মানুষ রুহানি শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিপ্রেশনে ভোগে। ডিপ্রেশন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর কৃত্রিম ওষধের বাজার তৈরি করে।
৩. সংস্কৃতির ব্যবসা	মুসলমানদের ওয়াজ মাহফিলের মধ্যে কিছু ইহুদী-খ্রিষ্টান মতাদর্শের ব্যক্তি প্রবেশ করে। ফলে এই ব্যক্তিরা খ্রিষ্টান দেশগুলোকে মডেল মনে করে। তারা ওয়াজে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মতো করে কথা বলতে পছন্দ করে। ইহুদী-খ্রিষ্টান মতাদর্শের ব্যক্তিরা মুসলমানদের ওয়াজ মাহফিলকে আয়ের উৎস বানিয়ে ফেলেছে। এরা মুসলমানদের কাছে আল্লাহর আইনি বিষয়ে কথা না বলে ফিকহি মাসালা নিয়ে তর্কবিতর্ক করে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল সৃষ্টি করে। মুসলমান দের মধ্যে ইহুদী-খ্রিষ্টান মতাদর্শের ব্যক্তিদের আলেম বলা হয়। তবে এদের কেউ মুসলমানদের আহলে সুফফার অনুসারী দেওবন্দ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত নয়।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা সংস্কৃতিকে ব্যবহার করে আয়ের উৎস হিসেবে। নারী যখন নাচ-গান, নাটক, সিনেমা, দিবস-ভ্যালেন্টাইন ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে ফ্যাশনের নাম দিয়ে পতিতাদের পোশাক পরে ব্যভিচারকে উসকে দেয়, তখন দেশের হোটেল, ডেটিং অ্যাপস, রেস্টুরেন্ট এবং গিফট শপগুলোর ব্যবসা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এই ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ নানা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। মানুষ যত বেশি অ্যালগরিদমের মধ্যে সময় দিবে, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তত বেশি বিজ্ঞাপন বিক্রি হবে। খ্রিষ্টানরা সারা বিশ্বে বিজ্ঞাপন দিয়ে কোটি টাকার ব্যবসায়িক ইন্ডাস্ট্রি চালায়।
৪. নামের সংস্কৃতি	আল্লাহ আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। মুসলমানদের জন্য নাম কেবল পরিচয় নয়, নাম পরিচয়ের সাথে একটি আবেগীয় বন্ধন তৈরি করে। মুসলমানরা নামকরণের ক্ষেত্রে কোরআনিক শব্দের ব্যবহার করে, যার কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান দের অনুভূতি আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহমুখী অনুভূতির কারণে কোন জালিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করলে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের এই ক্ষিপ্ততাকেই কাফেররা ভয় পায়।	মুসলমানদের ক্ষিপ্ততা বা তেজকে দূর করার জন্য ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বস্তুকেন্দ্রিক নাম ব্যবহার করে। যখন কোরআনিক নাম বদলে দিয়ে সেখানে বস্তুকেন্দ্রিক নাম ব্যবহার করা হয় তখন সেই জায়গার প্রতি মুসলমানদের ধর্মীয় টান ধীরে ধীরে কমে যায়। অর্থহীন বস্তুকেন্দ্রিক নাম মুসলমানদের চেতনাকে দুর্বল করে দেয়। যেমন— জাহাঙ্গীরনগরের পরিবর্তে ঢাকা, ইসলামাবাদের পরিবর্তে চট্টগ্রাম। এই সকল অর্থহীন নাম মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেয়।

সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৫. নামের পরিবর্তন	রাসূল (সা.) কোন মন্দ নাম শুনলে তা পরিবর্তন করে দিতেন। মুসলমানরা শুরু থেকে ব্যক্তির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থানের নাম সব সময় আল্লাহমুখী রাখত। আল্লাহমুখী নাম মুসলমানদের প্রতিনিয়ত ইসলামের মূল শেকড় ও বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ বা ইসলামাবাদ, তখন ব্যক্তি অবচেতনভাবেই নিজের মাঝে এক ধরনের বিনয় ও আল্লাহর প্রতি সমর্পণের ভাব অনুভব করে। নাম হলো একটি ব্র্যান্ডিং। যখন কোন জনপদ বা প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ডিং ইসলামের নামে হয়, তখন সেটি মানুষের চিন্তা, রুচি এবং আমলের ওপর একটি স্থায়ী ইসলামিক প্রভাব ফেলে। নাম হলো দুনিয়াবি পরিচয়কে আখেরাতের সাথে সংযুক্ত করার একটি অন্যতম মাধ্যম।	মুসলমান জাতির নামগুলো যখন ইসলামের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে প্রাণ ও ব্র্যাক-এর মতো অর্থহীন ও বস্তুবাদী নাম হয়, তখন নতুন প্রজন্মের মাঝে মুসলমান বোধ হারিয়ে যায়। যার ফলে নতুন প্রজন্ম নিজেদের ইতিহাসের চেয়ে জাগতিক চাকচিক্য ও ব্যবসায়িক ব্র্যান্ডের সাথে বেশি একাত্ম বোধ করে। যেমন—ঢাকা শহরের নাম যদি মসজিদাবাদ রাখা হতো, তখন সেই শহরে বসবাসকারী ও সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তির মনে শুরুতেই আল্লাহর ঘরের কথা স্মরণে আসত। ইসলাম কেন্দ্রিক নাম মানুষের অবচেতন মনে পবিত্রতা এবং ইবাদতের প্রতি অনুরাগ তৈরি করে। এর ফলে মানুষ নিজেকে কেবল একজন নাগরিক নয়, বরং আল্লাহর একজন বান্দা হিসেবে অনুভব করতে শুরু করে।
৬. সংস্কৃতির ব্যবহার	সংস্কৃতি যার অর্থ হলো পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসা রীতিনীতি। মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনের মূল্যবান সময় আল্লাহর ইবাদত ও শুকরিয়ায় ব্যয় করার জন্য মুসলমানরা সংস্কৃতির ব্যবহার করে। রাসূল (সা.) থেকে চলে আসা ইসলামিক কর্মকাণ্ডগুলো মুসলমানদের সংস্কৃতি হয়। যেমন—সন্ধ্যা ৬টার পরে নতুন তারিখ শুরু, চাঁদকে বছর গণনার জন্য ব্যবহার করা, শবগুজারি করা, জুমাবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন করা ও জুমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।	রোমান সাম্রাজ্য থেকে চলে আসা কর্মকাণ্ড গুলো মূলত ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতি। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের সংস্কৃতিতে সময়, তারিখ ও বারের মতো ছোট ছোট বিষয়কে ব্যবহার করে। খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতি অনুসারে রাত ১২টার পরে নতুন তারিখ শুরু হয়। তারা সূর্যকে বছর গণনার জন্য ব্যবহার করে। আর সাপ্তাহিক নামগুলো খ্রিষ্টানরা তাদের দেব-দেবীর নাম অনুসারে রাখে। ফলে মানুষ বুঝে না বুঝে তাদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে যায়।
৭. সংস্কৃতির আদর্শ	দুনিয়ার জীবন মানুষের জন্য পুলসিরাতের রাস্তা। এখানে যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে মৃত্যুর পরে তারা জান্নাতি হবে। মুসলমানদের আদর্শ হলো আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নতসমূহ বংশপরম্পরায় চলাকে ইসলামিক সংস্কৃতি বলে। মুসলমানদের সংস্কৃতিতে নারীকেন্দ্রিক কোন বিনোদন নেই। যার কারণে সমাজে কেউ নির্লজ্জ পোশাক পরিধান করতে সাহস পায় না।	আদম ও হাওয়া (আ.)-কে ইবলিশ কুমন্ত্রণা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। ইবলিশের কুমন্ত্রণার কারণে তাঁদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। সেই ইবলিশ এখন পৃথিবীতে আছে; ইবলিশ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে আদম সন্তানদের অশ্লীলতায় মগ্ন রাখতে। যার কারণে ইবলিশ মানুষকে মোবাইল, ইন্টারনেট, গেম ও সিনেমা-নাটকের নেশায় ডুবিয়ে রাখে। ফলে বিনোদনের নামে মানুষ জীবনের সংক্ষিপ্ত সময়ের বিশাল একটি অংশ অপচয় করে ফেলে।
৮. সংস্কৃতির প্রভাব	মানুষের শরীর মাটি থেকে তৈরি। যার কারণে ইসলাম মুসলমানদের শারীরিক খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করে। ফলে মানুষের এই মাটির শরীরে অলসতা আসে না। শারীরিক অলসতা কম থাকার কারণে মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত করতে ও নিজ কর্মে অলসতা করে না। মুসলমানরা যখন আল্লাহর আইন ও রাসূল (সা.)-এর সুন্নত মানবে তখন এই সংস্কৃতি হয়ে যাবে কাফেরদের জন্য দাওয়া। মুসলমানরা কাফের ও মুনাফিকদের দাওয়া করে। আর আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্য মুমিন মুসলমানদের নির্দেশ দেয়।	রাসূল (সা.)-এর পর থেকে ইসলামিক সংস্কৃতি হয়ে গেছে কাফেরদেরকে দাওয়া করো। আর আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্য মুসলমানদের উপদেশ দেওয়া। ইসলামিক এই সংস্কৃতি পরিবর্তন করার জন্য ইবলিশ বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন করেছে মুসলমান নিজেকে দাওয়াত দেবে। মুসলমান যখন নিজেকে দাওয়াত দেয় তখন এর অর্থ হয়ে যায় ওই ব্যক্তি হয় মুনাফিক বা কাফির। সংস্কৃতির এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন হয়ে গেছে ইসলামিক উপদেশ দাও, আল্লাহর নির্দেশের প্রচার পেছনে রাখো।

যোগাযোগ: যেকোন ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়াকে যোগাযোগ বলে। সড়ককেন্দ্রিক যোগাযোগ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে এবং আয় বৃদ্ধি করে। যোগাযোগ যত উন্নত হবে, দেশের উন্নয়ন তত দ্রুত হবে। (আল-আনকাবুত: ২০)

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. যাতায়াত নীতি	ইয়ারমূকের যুদ্ধে রোমানদের পক্ষ থেকে যখন মুসলিম বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল, তখন তাদের এক জন উপদেষ্টা সেনাপতিকে বলেছিলেন যে, এরা এমন এক জাতি যারা দিনের বেলা ঘোড়সওয়ার যোদ্ধা আর রাতের বেলা আল্লাহর ইবাদতকরে। তারা যুদ্ধের ময়দানে তাদের নারীদের অমর্যাদা হতে দেয় না।	যানবাহনে নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণ এবং নারীদের মোটরবাইক চালানোর সংস্কৃতির উদ্দেশ্য, মাহরাম প্রথাকে সেকেলে বানিয়ে সামাজিক লজ্জাবোধ তুলে দেওয়া। নারীদের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থায় পর্দা বা মাহরাম না থাকা তাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়ায় এবং সমাজকে যিনা ও অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেয়।
২. যাত্রী ছাউনি	পবিত্র আল-কোরআন মুসাফিরদের অধিক সম্মান দিয়েছে, যার ধারাবাহিকতায় আমাদের এই মহাদেশে একসময় মুসাফিরখানা ছিল। সেখানে পথিকরা আসতেন, আরাম করতেন, নামায পড়তেন এবং নিজেদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নিয়ে আবার গন্তব্যে চলে যেতেন। বর্তমানে এই ব্যবস্থা থাকলে গাড়ির চালকরাও নিয়মিত নামাজ পড়ার সুযোগ পেতো।	ব্রিটিশরা এই মহাদেশে আসার পর খ্রিষ্টানদের শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুসলমানদের সকল মুসাফিরখানা বন্ধ করে দেয়। যার ফলে এখন কেউ মুসাফিরদের প্রাপ্য অধিকার দেয় না। বর্তমানে গাড়ি চালকরাও পর্যাপ্ত বিশ্রামের জায়গা পান না। আর বিশ্রামহীন অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণে চালকরা প্রায়ই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।
৩. মসজিদ কেন্দ্রিক কার্যালয়	আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের মধ্যে তেল এক বিশেষ দান। এই তেল অনেকের জন্য কান্না বয়ে এনেছে, আবার অনেকের জন্য হাসি। মুসলমানদের কার্যক্রম তৃণমূল মসজিদ কেন্দ্রিক হওয়া বিচারের জন্য মানুষকে দূরের অফিস-আদালতে যেতে হয় না এবং যাকাত ভিত্তিক ব্যবসানীতি হওয়ার কারণে কর্মসংস্থান নিকটেই হয়। যার ফলে যাতায়াতের জন্য খুব কম তেল লাগে এবং সাধারণ মানুষের পকেট ভর্তি টাকা থাকে।	বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অফিস-আদালত ২০-৩০ কিমি দূরে হয়। অন্যদিকে সুদ ভিত্তিক ব্যবসানীতি হওয়ার কারণে কর্মসংস্থানের জন্য মানুষ শহরমুখী হয়। যার ফলে কাঠের পরিবর্তে তেল, গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের ওপর চাপ বাড়ে। এই সকল উপকরণের যোগানের জন্য প্রয়োজন হয় ডলারের। আমরা এই ডলার আয় করার জন্য গার্মেন্টসের বর্জ্য দিয়ে আমাদের নদীর মাছসমূহ ধ্বংস করি।
৪. তেলের চাহিদা	আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত বৃষ্টির পানি, দিনের আলোর, মসজিদকেন্দ্রিক কার্যালয় ও যাকাতভিত্তিক ব্যবসার সঠিক ব্যবহার করে আমরা যদি জীবনযাপন করি, তাহলে মুসলমানদের তেলের প্রয়োজন বর্তমানের তুলনায় মাত্র ৩ ভাগের ১ ভাগ লাগবে। মুসলমানদের তেলের এই স্বল্প চাহিদা ডলারের প্রয়োজনীয়তাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসবে। এর ফলে বাংলাদেশের মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের যেকোন ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে পারবে।	বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কারণে তেলের প্রয়োজন অনেক বেশি, যা ডলারের চাহিদাকে বাড়িয়ে দেয়। এই সুযোগে খ্রিষ্টানরা তাদের রাষ্টব্যবস্থা ও নীতি মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়। কেউ যদি খ্রিষ্টানদের রাষ্টব্যবস্থার বাইরে যেতে চায়, তবে খ্রিষ্টানদের সেই দেশের উপর ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা বা স্যাংশন আরোপ করে। ফলে অনেক দেশ বাধ্য হয়ে খ্রিষ্টানদের কথা শোনে। খ্রিষ্টানরা তেলের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম মানে না।
৫. বৃষ্টির পানি	মানবজাতি ইউসুফ (আ.)-এর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের শিক্ষা পায়। আমরা যদি বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর বৃষ্টির পানি ছাদের মাধ্যমে বিল্ডিংয়ের ট্যাংকিতে ১ লক্ষ কোটি লিটার সংরক্ষণ করি, তাহলে ৬০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস, পাম্প ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পরিচালনা ব্যয় কমে আসবে। একই সাথে আমাদের দেশের ভূ-গর্ভস্থ পানির সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। ভূগর্ভস্থ পানি বৃদ্ধি পেলে আমাদের গাছসমূহের ফল বৃদ্ধি পাবে।	বাংলাদেশের ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য অল্প কিছু বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যার ফলে বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং তেলের ওপর চাপ বাড়ে। বৃষ্টির পানি থেকে বাসার ট্যাংকি সমূহ পূর্ণ করলে ছোট একটা নদীর সমান পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং বন্যায় পলিমাটি ধুয়ে যাওয়াও কমবে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় বালি, নুড়ি পাথর ও বৃষ্টির প্রথম ময়লা পানি সরিয়ে দেওয়ার ভালভ।
৬. আলোর ব্যবহার	মুসলমানের সকাল শুরু হয় সূর্যোদয়ের আগে। সকালে যেমন পাখি খাবারের সন্ধানে বের হয় এবং সন্ধ্যার আগে বাসায় ফেরে, ঠিক তেমনি মুসলমানেরাও সকালে কাজে বের হয় এবং সন্ধ্যায় বাসায় ফেরে। তারা দিনের আলোতে সব কাজ শেষ করে, যার কারণে কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন কম হয়। ফলে প্রতি বছর ১০ হাজার কোটি টাকা কম লাগে।	ব্রিটিশরা ছিল কাফের; তারা রাতভর মদ খেত এবং সকাল ১০টায় ঘুম থেকে উঠত। তারপর কাজ শুরু করত যা চলত রাত ১০টা পর্যন্ত। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে রাত ১২টা পর্যন্ত জাগ্রত থাকার। রাত ১২টা পর্যন্ত জাগ্রত থাকার জন্য প্রয়োজন হয় কৃত্রিম আলোর। কৃত্রিম আলোর জন্য প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৭. তড়িৎ রশ্মি	ইন্টারনেটের উচ্চ গতির বিকিরণ মৌমাছি, পাখি ও উপকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করে। এর ফলে প্রাকৃতিক পরাগায়ন ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ক্ষতি কৃষিতে ধস নামিয়ে দেয়। তখন মানুষকে সরাসরি মাঠের খাবারের বদলে প্যাকেটজাত ও রাসায়যুক্ত খাবার খেতে হয়। তাই মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার জন্য ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণের বিকল্প নেই। বিশ্বের ৭০% অপরাধ এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়। অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বহির্বিশ্বমুক্ত নিজস্ব ইন্টারনেট সার্ভার। এতে মুসলমান জাতি অশ্লীলতা থেকে বেঁচে যাবে।	বর্তমান যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো—মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, ডিজিটাল দাসে পরিণত করা। মানুষ ডিজিটাল দাসে পরিণত হলে টেকজায়ান্টরা মানুষের টাকা হাতিয়ে নিতে পারে। যেমন-ভয়েস কলের দাম বাড়িয়ে মানুষকে হোয়াটস অ্যাপ, মেসেঞ্জার ও ইন্টারনেটের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। এতে টেলিকম কোম্পানিগুলো ডেটা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। মানুষ যত বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করবে, খ্রিষ্টানদের শক্তিগুলো আমাদের গতিবিধি তত সহজে ট্র্যাক করতে পারবে।
৮. ব্যক্তিগত যানবাহন	ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা যত বাড়বে, জ্বালানি তেলের চাহিদাও তত বাড়বে। জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ডলারের প্রয়োজন হয়। এই ডলার দেশকে ইহুদীদের পেট্রো-ডলার ব্যাংকিং ব্যবস্থার দাসে পরিণত করে। আমাদেরকে ডলারের দাসে পরিণত করার জন্য সরকার গনপরিবহনকে উন্নত করে না। ফলে দেশে ব্যক্তিগত গাড়ির সংস্কৃতি চালু হয়। এই সংস্কৃতি মূল লক্ষ্য হয় গাড়ি ও যন্ত্রাংশের বাজার চাঙ্গা রাখা—যার ওপর ভিত্তি করেই জাপানের মতো দেশগুলো উন্নত।	গণতন্ত্রের কৌশল হলো সরকারি কর্মকর্তাদের দামি গাড়ি, বিলাসী বাড়ি দিয়ে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণি তৈরি করা। কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত সুবিধার ফলে তারা সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও গণপরিবহনের বেহাল দশা অনুভব করতে পারে না। বাংলাদেশে এই সুবিধা বাদী শ্রেণির মানুষ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে রক্ষা করে। অতিরিক্ত সুবিধার কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক বিশাল অপচয় হয়। তাদের অপচয়ের অর্থ শেষ পর্যন্ত দেশের মানুষকেই পরিশোধ করতে হয়।
৯. জ্বালানি সাশ্রয়	মুসলমানদের বাংলা নদীমাতৃক দেশ, এখানকার পানি মিষ্টি-মাটি উর্বর। মুসলমানদের বাংলায় অসংখ্য ছোট নদী আছে; এই সকল নদীর মুখে যদি পানি নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়, তখন সব সময়ের জন্য চাষাবাদ ও নৌ চলাচলের জন্য তা ব্যবহার করা যাবে। এতে বাজারে স্বল্পমূল্যে পণ্য পৌঁছানো যাবে, যা মুসলমান দের মাছ, ভাত ও পণ্য পরিবহন সহজ করে দেবে। পরিকল্পনাটি যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তবে বছরে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা যাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র কাফেরদের যেকোন অবরোধ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।	বর্তমানে নদী ও প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার কম হওয়ায় জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পাবলিক পরিবহনের বেহাল দশা হয় এবং ডলারের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সকল চাহিদা মেটাতে বর্তমান সরকার ঋণের জন্য ইহুদীদের কাছ থেকে ডলার নেয়। নদীভিত্তিক সেচ এবং নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা চালু হলে তেলের চাহিদা নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে তেল সরবরাহ নিয়ে কোন দেশ যদি ব্যবসায়িক অবরোধ দিতে চায়, তখন তার অবরোধ কাজ করবে না। প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার মুসলমান দের জাতীয় নিরাপত্তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।
১০. সম্পদের ব্যবহার	খলিফা উমর (রা.) এক রাতে তাঁর কার্যালয়ে বসে সরকারি কাজ করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। খলিফা উমর (রা.) জ্বলন্ত প্রদীপটি নিভিয়ে দিলেন এবং নিজের ঘর থেকে অন্য একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে আনলেন। আগন্তুক অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলে খলিফা উমর (রা.) বললেন, এতক্ষণ যে প্রদীপটি জ্বলছিল, তার তেল ছিল জনগণের টাকায় কেনা। যতক্ষণ আমি রাষ্ট্রের কাজ করছিলাম, ততক্ষণ সেটি ব্যবহার করা জায়েজ ছিল। কিন্তু এখন তুমি তোমার ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলবে, তাই সেই আলোতে ব্যক্তিগত কাজ করা আমানতের খেয়ানত হবে। মুসলমানদের খিলাফতের সময় রাষ্ট্র ছিল জনগণের সেবক, জনগণ ছিল রাষ্ট্রের পাহারাদার।	বর্তমান সরকার ব্যবস্থা বিলাসিতা জন্য টিকে আছে। এখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকলেও সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আলাদা আলাদা গাড়ি ও আবাসন প্রদান করা হয়, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় মাত্র। বর্তমানে বাংলাদেশের ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১,০০৮টি নদী আছে। এই নদীগুলোর অধিকাংশের মুখে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁধ নির্মাণ করা যায়, তবে কৃষি ও নৌ-যোগাযোগে বিপ্লব আসবে। অথচ বর্তমানে ১ হাজার টি সরকারি গাড়ির পেছনে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়; এই টাকা সাশ্রয় করলেই বছরে অন্তত ৩৫০ টি নদীতে বাঁধ দেওয়া সম্ভব। এভাবে কয়েক বছরেই দেশের সকল ছোট নদীকে উৎপাদনমুখী সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব, যা আমাদেরকে প্রতি বছর ৩৬ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করতে সাহায্য করবে।
১১. পলিমাটি	বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১২০ কোটি টন পলি প্রবাহিত হয়। নদীর মুখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাঁধ দিয়ে যদি মাত্র ১০% পলি নদীগর্ভে আটকে রাখা যায়, তবে বছরে প্রায় ১২ কোটি টন পলিমাটি পাওয়া সম্ভব। জমাকৃত এই পলি-বালু যদি নির্মাণকাজে বা জমি ভরাটে ব্যবহার করা হয়, তবে বছরে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা আয় করা যাবে।	বাংলাদেশে প্রতি বছর সার আমদানিতে সরকার প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। পলিমাটি প্রাকৃতিক সার হিসেবে কাজ করে। এই মাটি কৃষিতে ব্যবহার করলে ইউরিয়া ও টিএসপি ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে। পলিমাটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে সারের পেছনে ব্যয় হওয়া অর্থের অন্তত ৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

লিখন পদ্ধতি: মানুষের মুখের শব্দকে যে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে বোঝানো হয় তাকে লেখা বলে। আর সেই লেখার কৌশলকে লিখন পদ্ধতি বলে। (আল-আলাক: ৪-৫)

লিখন পদ্ধতি মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. লিখন পদ্ধতি	মুসলমানদের সংবিধান আল-কোরআনের লেখা ডান দিক থেকে শুরু হয়। রাসূল (সা.)-এর যুগে রোম ও কিসরার আধিপত্য কমাতে পারস্য-ইরান নিজেদের ভাষা ফারসি লিখতে ডানমুখী আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল। খিলাফতের সময় ব্যক্তির মুখের ভাষা ঠিক থাকতো কিন্তু ভাষা প্রকাশের বর্ণ হতো আরবি হরফের মতো, যেমন—ফারসি ও উর্দু ভাষা। মুঘল আমলে ভারত বর্ষে মুসলমানদের বাংলা ভাষা আরবি বা ফারসি হরফে লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল।	বাংলা লেখার প্রচলন ব্রাহ্মী লিপি থেকে শুরু হয়। খ্রিষ্টান ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে ইসলামকে দূর করার জন্য তাদের নিয়মে বামমুখী বর্ণমালা শুরু করে। যার ফলে ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর পরে ভারতবর্ষের প্রভাবে বাংলাদেশের ভাষাবিদগণ হিন্দি বর্ণমালার সাথে মিল রেখে মুসলমানদের জন্য বাম দিক থেকে লেখার পদ্ধতি চালু করে। যার কারণে আজ মুসলমানদের মধ্যে হিন্দি বলার মনোভাব বেশি। এক সময় তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক লিপি পরিবর্তন করেছিলেন।
২. কথার মিল	চিত্র অঙ্কন বা লেখা যেকোন ভাবে প্রকাশ করা যায়। মুসলমান জাতির পথপ্রদর্শক আল-কোরআনের লেখা ডান দিক থেকে হওয়ার কারণে, মুসলমানদের বাংলা ভাষাকে ডান দিক থেকে লেখার জন্য আরবি হরফের ব্যবহার করা দরকার। যেমন—বাংলা = আমি, আরবি হরফ দিয়ে লেখা = "عامي" । লিখার পরিবর্তন করলে মুসলমান বাঙালি জাতির অন্তর থেকে খ্রিষ্টান শাসনের মূল উৎপাটন হবে এবং মানুষ হিন্দু মতাদর্শ থেকে বের হয়ে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে চলে আসবে।	পারস্য ও কামাল আতাতুর্কের লিপি পরিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যায়, লিখন পদ্ধতি মানুষের ধর্মীয় নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিষ্টানরা মুসলমানদেরকে ব্রিটিশ মতাদর্শের দিকে ধাবিত করার জন্য লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন করে। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি বলে হিন্দির সাথে মিল থাকতে হবে এমন নয়। যেমন—ভাষার মিল থাকলেও বর্ণমালা এক হয় না। হিন্দি আর উর্দু উচ্চারণ একই হলেও লেখার পদ্ধতি ভিন্ন। যেমন- বাংলা =সরকার, অসমী=চৰকাৰ।
৩. মুসলমান থেকে ইসলাম	মুসলমান এটি মূলত ফারসি শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। আমাদের এই অঞ্চলে একসময় ফারসির প্রভাব বেশি থাকায় মুসলমান শব্দটিই ছিল প্রধান। ৯/১১ এর পর খ্রিষ্টান মিডিয়া ও রাজনীতিতে ইসলাম শব্দটি একটি কেন্দ্রীয় আলোচনায় পরিণত হয়। সেখানে একজন ব্যক্তির চেয়ে তার ধর্মীয় আদর্শকে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা বেশি ছিল। এর প্রভাবে মুসলিম বিশ্বেও আত্মরক্ষামূলক বা আদর্শিক কারণে ইসলাম শব্দটি বেশি ব্যবহার করে।	ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ধর্মীয় পরিচয়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরি হিসেবে দেখার প্রবণতা শুরু হয়। আগে যেখানে মুসলমান শব্দটি দিয়ে কেবল একদল মানুষকে বোঝানো হতো, সেখানে ব্রিটিশরা ইসলাম শব্দটিকে একটি সুনির্দিষ্ট সিস্টেম বা রিলিজিয়ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে। বিশেষ করে ১৮৮১ সালের আদমশুমারির পর থেকে ধর্মকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় হিসেবে দেখার চল বাড়ে।
৪. শব্দের রাজনীতি	বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে মুসলমান বা মোসলমান শব্দের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। এমনকি কাজী নজরুল ও ফররুখ আহমদের কবিতাতেও মানুষের পরিচয়ই মুখ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের প্রচারের ফলে ইসলামিক আইন, ইসলামিক সংস্কৃতি বা ইসলামিক ব্যাংকিং-এর মতো শব্দগুলো দৈনন্দিন ভাষায় এত বেশি মিশে গেছে যে, মুসলমান শব্দের চেয়ে ইসলাম শব্দের ব্যবহার এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান।	বর্তমানে খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের আইন না বলে ইসলামিক আইন বলে। যার কারণে মুসলমানদের মধ্যে যারা খ্রিষ্টান পন্থি তারা ইসলামিক আইন বলে অহেতুক বিতর্ক করে। যখন মুসলমান ব্যবহার না করে ইসলাম ব্যবহার করা হয়, তখন ইসলাম একটি সিস্টেম হয়ে যায়। ইসলাম সিস্টেম হওয়ার কারণে অনেক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করেও ইসলামের আইনকে মানবতা বিরোধী বলে তর্ক করে। আবার অনেকে মুসলমান হয়েও নিজের দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যায়।
৫. উচ্চারণের পরিবর্তন	আল্লাহ বলেছেন, তোমরা একে অন্যকে বিকৃত নামে ডেকো না; এই কাজ করা গুনাহ। কোন শব্দের মূল উচ্চারণ যখন বদলে দেওয়া হয়, তখন সেই শব্দের আধ্যাত্মিক ওজন কমে যায়। যদি বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখা হতো, তখন আমরা সরাসরি আল-কোরআনের শব্দগুলো আরবিতে লিখতে পারতাম; এতে শব্দের উচ্চারণ ও বানান ঠিক থাকত, যা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করত। পাশাপাশি আমরা এক উম্মাহতে পরিণত হতাম।	আরবিকে বাংলা উচ্চারণ করা অনেক কঠিন। বাংলা একাডেমি এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রকৃত আরবি উচ্চারণকে বিকৃত করছে। বাংলা একাডেমি উচ্চারণ গত পরিবর্তন করে। সুকৌশলে মুসলমানদেরকে মূল আল-কোরআন থেকে মানসিকভাবে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন— কোরআন-এর পরিবর্তে কুরআন ব্যবহার, ইসলামিক-এর পরিবর্তে ইসলামী ব্যবহার, যাকাত-এর পরিবর্তে জাকাত ব্যবহার করা, কিংবা যিনা-এর পরিবর্তে জেনা ব্যবহার করা।

লিখন পদ্ধতি মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৬. শব্দের রূপ	শব্দের রূপ পরিবর্তনটি কেবল ভাষাগত নয় বরং এটি একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের অংশ। আগে ধর্মীয় নেতাদের সম্মানসূচক সম্বোধন ছিল মৌলভী বা মোল্লা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টানরা ধর্ম বিহিন রাজনীতিতে মোল্লা শব্দটিকে কিছুটা তুচ্ছার্থে ও ব্যাকডেটেড বোঝাতে ব্যবহার শুরু করে। এর ফলে খ্রিষ্টান আদর্শে শিক্ষিত মুসলমানরা মোল্লার পরিবর্তে ইসলামিক স্কলার বা আলেম শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। বর্তমানে এই স্কলারা মাদ্রাসার পরিবর্তে ইসলামিক স্কুল বা একাডেমি শব্দগুলো ব্যবহার করে।	কাফেররা শব্দের রূপ পরিবর্তন করে মুসলমানদেরকে চেনা রূপ থেকে বের করে নতুন রূপে নিয়ে আসে। যেমন— আগে যিনা লেখা দেখলে আপনি বুঝে যেতেন এই ব্যক্তি অনেক খারাপ কাজ করেছে যা ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু যখন যিনা না লিখে জিনা লেখা হয়, তখন আপনার মনে আগের সেই ঘৃণাটা কাজ করে না। একইভাবে হিজড়া শব্দটি গালি বা তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে তাদের সামাজিক মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য খ্রিষ্টানরা দাপ্তরিক কাজে এখন তৃতীয় লিঙ্গ বা ট্রান্সজেন্ডার শব্দগুলো ব্যবহার করে।
৭. শব্দার্থের ব্যবহার	মুসলমানরা ব্যবসার ক্ষেত্রে অর্থনীতি না বলে ব্যবসা নীতি বলে, ব্যাংক না বলে আমানত বলে। এই শব্দ গুলো মানুষের মনে ও মাথায় বেশি প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— যখন বলা হয় আমেরিকা কিউবার ওপর ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তখন মানুষের মনে ক্ষোভ জন্মাবে। আর যখন বলা হয় আমেরিকা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তখন এই শব্দটি কঠোর সত্যকে নরম শব্দে ঢেকে দেয়।	খ্রিষ্টানরা যখন ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা না বলে অর্থ নৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলে। তখন মানুষ নিষেধাজ্ঞার ভেতরের শোষণ বা কঠোরতা সহজে বুঝতে পারে না। খ্রিষ্টানরা প্রকৃত সত্য লুকানোর জন্য নিজস্ব শব্দের ব্যবহার করে, যাতে মানুষ তার নিজের লাভ-ক্ষতি সরাসরি অনুভব করতে না পারে। খ্রিষ্টানরা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কথা বলে সুদভিত্তিক ব্যবসানীতি এই সত্য কথাটিকে লুকায়।
৮. শব্দের ব্যবহার	বর্তমানে খিলাফত শাসন শব্দটিকে মানুষের কাছে পুরাতন বা সেকেলে হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, শরিয়াহ শব্দটিকে স্বাধীনতার বিপক্ষে দাঁড় করানো হয়। সমান্তরালভাবে এই প্রচার চালানোর কারণে সাধারণ মানুষ ইসলামিক শাসনব্যবস্থা চাইতে ভয় পায়। বর্তমান সময়ে খিলাফত শব্দের ব্যবহার কমিয়ে যদি কর বা খাজনামুক্ত শাসন বলা হয়, তখন তা সাধারণ মানুষের মনে বেশি প্রভাব ফেলবে।	মুসলমানদেরকে বইয়ে ও মিডিয়ার মাধ্যমে খ্রিষ্টান শাসন না শিখিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন শেখানো হয়। কারণ খ্রিষ্টান শাসন বললে আমরা মুসলমানরা তা গ্রহণ করতাম না। ফলে বর্তমানে খ্রিষ্টানদের শাসনব্যবস্থাকে পশ্চিমা সভ্যতা বা গণতন্ত্র নাম দিয়ে আমাদের ওপর চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই শব্দ দুটি মুসলমানদের মনকে শীতল রাখতে কাজ করে। যার কারণে মুসলমানরা আজ কাফেরদের আইনে চলে।
৯. শব্দ গোপন	মুসলমানদের আধুনিক ইসলামিক স্কলার আলেমগণ ওয়াজে বলেন মুসলমানরা যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। অথচ এই শব্দের প্রকৃত অর্থ হবে মুসলমানরা সুদ মুক্ত যাকাতভিত্তিক ব্যবসা নীতি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। আলেমগণ যদি যাকাতভিত্তিক ব্যবসানীতি এই শব্দটি ব্যবহার করে তাহলে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে।	বর্তমান সময়ে আমরা অর্থনীতি শব্দটির সাথে বেশি পরিচিত। মূলত অর্থনীতি ও ব্যাংক—এই দুটি শব্দ দিয়ে আমাদের চোখের সামনে প্রকৃত ব্যবসানীতিকে আড়াল করছে। এই শব্দ দুটির কারণে আমরা ব্যবসানীতির দিকে দৃষ্টি দেই না। অথচ গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানি নামে যে ব্যবসায়িক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা।
১০. শব্দের সংস্কৃতি	মুসলমানরা সব সময় আল-কোরআনের সবগুলো ব্যবহার করে। আল-কোরআনের শব্দগুলো কাফের দের মনে ভয় সৃষ্টি করে। আর কাফেররা মুসলমানদের আল-কোরআনের শব্দকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন-ঐতিহাসিকভাবে পুঁথি সাহিত্যে বিদ্যমান ছিল। পুঁথি সাহিত্যে মুছে ফেলার উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা। মুসলমানরা শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে মসজিদে ইমমা সাহেব জুমার খুতবা দিলে সাধারণ মুসলমান আরবি খুতবার কিছুই বুঝে না। খুতবার না বুজার কারণে দিন দিন মুসলমান দের মন থেকে ইসলাম দূরে সরে যায়। মনের এই শূন্য স্থানে জায়গা পায় খ্রিষ্টানদের ইংরেজি শব্দগুলো।	বাম দিক থেকে লেখা এবং ইংরেজির ব্যাপক ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের অবচেতন মনে এটি গেঁথে দেওয়া যে—খ্রিষ্টানদেশ গুলো হলো শ্রেষ্ঠ। যখন একটি শিশু ছোটবেলা থেকেই শুকরান-এর বদলে থ্যাংকস শেখে, তখন সে মানসিকভাবে মুসলমানদের স্বর্ণযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খ্রিষ্টানদের ভোগবাদী নিয়মের অনুসারী হয়ে পড়ে। খ্রিষ্টানরা ইংরেজিকে আভিজাত্যের প্রতীক বানিয়ে দিয়েছে, এতে মুসলমানরা নিজের ধর্মীয় ঐতিহ্যের চেয়ে খ্রিষ্টানদের জীবনধারাকে বেশি পছন্দ করে। খ্রিষ্টানদের কারণে মুসলমানরা আজ বলে আস্তাগফিরুল্লাহ পরিবর্তে সরি বলে, ইনশাআল্লাহ পরিবর্তে ওকে বলে।

লিখন পদ্ধতি মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১১. লিখার রাজনীতি	মুসলমানদের কার্যক্রম আল-কোরআন অনুসারে কেমন হবে তা নির্ণয়ের জন্য একটি সংস্থা থাকা দরকার। এই সংস্থার নাম হবে MSO- মুসলমান মান নির্ণয় সংস্থা। এই সংস্থা শুরার গঠন ঠিক করবে, পণ্যের গায়ে আরবির ব্যবহার বৃদ্ধি করবে, খাদ্যের মান ও পুষ্টি নিশ্চিত করবে এবং মুসলমানদের আল-কোরআনের আলোকে পথ প্রদর্শন করবে। মুসলমান দের এই ধরনের সংস্থা থাকলে খ্রিষ্টানদের ISO আজ মুসলমানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত না।	বর্তমানে ISO শব্দটি বেশি দেখা যায়। ISO-কে বলা হয় আন্তর্জাতিক মান নির্ণয় সংস্থা। ISO-এর কাজ হলো সকল দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পণ্যের গায়ে লেখা ও খাবারের উপাদানের মান ঠিক করা। এই আন্তর্জাতিক মান নির্ণয় সংস্থা ISO-এর নিয়ম ঠিক করা হয় খ্রিষ্টান দেশসমূহের ওপর ভিত্তি করে। ISO মূলত খ্রিষ্টানদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করে। খ্রিষ্টানরা ISO দিয়ে লেখার সেন্সরশিপ দেয়, যা মুসলমানদের আরবি থেকে বের করে ইংরেজিতে প্রবেশ করায়।
১২. লিখার যুদ্ধ	আরবি লিখন পদ্ধতি ও বর্ণমালা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। আরবি লেখা একটি শিশু খুব দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে। যেমন—মসজিদের হুজুর একটি বাচ্চাকে কয়েক পারা আল-কোরআন শিক্ষা দিলে বাকি অংশটুকু সে নিজে নিজে পড়তে পারে। আমরা মুসলমানরা যদি দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দগুলো আল-কোরআন থেকে ব্যবহার করি, তখন দেখবেন একটি বাচ্চা নিজেই আল-কোরআনের অনুবাদ করতে পারবে। পাশাপাশি মসজিদের আরবি খুতবা বোঝাও সহজ হবে।	ইংরেজি একটি কঠিন ও জটিল ভাষা। ইংরেজি শিখতে গিয়ে একজন ছাত্র ছোট থেকে কোচিং ও প্রাইভেট করে। শুধু খ্রিষ্টানদের এই ভাষার গ্রামার শিখতে একজন ছাত্রকে জীবনের অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। অথচ জীবনের এই সময় ও অর্থ দিয়ে একজন ছাত্র আধুনিক বিজ্ঞান শিখতে পারত। বিজ্ঞান শিখতে হলে যে ইংরেজি জানতে হবে এই ধরনের চিন্তা ঠিক না। মূলত মুসলমান জাতিকে মেধাগতভাবে অলস করার জন্য খ্রিষ্টানরা বিজ্ঞানকে জটিল করেছে।
১৩. লিখার আর্দশ	আল্লাহ বলেন আমি প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করেছি পরে তার সঙ্গিনীকে। সৃষ্টির এই ধারাবাহিকতায় মুসলমান দের লেখার আদর্শ হয় পুরুষ-নারী এইভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রম অনুসারে আগে পুরুষ এবং পরে নারীকে উল্লেখ করা হয়। লেখার এই আদর্শ একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ পারিবারিক গঠনের পদ্ধতি বর্ণনা করে।	আল্লাহর সাথে ইবলিশ ওয়াদা করেছে যে সে আদম সন্তানকে সমূলে ধ্বংস করবে। আদম সন্তানকে ধ্বংস করতে ইবলিশ নারীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ইবলিশের আদর্শ অনুসারে খ্রিষ্টানরা লেখার সময় আগে নারী এবং পরে পুরুষকে উল্লেখ করে। খ্রিষ্টানদের নারী-পুরুষ লেখার এই ধরনের আদর্শ পারিবারিক কাঠামোর ভারসাম্য নষ্ট করে।
১৪. AI লিখা	আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানরা যাতে এতিম দেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকে। আল্লাহর এই নির্দেশ পরিচয়কে অধিক স্পষ্ট করে। ঠিক তেমনিই মুসলমানরা যখন AI-কে AI সফটওয়্যার বা কোড হিসেবে উল্লেখ করবে, তখন এই পরিচয় বস্তুর মূল ভিত্তিকে অধিক স্পষ্ট করবে। বস্তুর পরিচয় যখন স্পষ্ট থাকবে, তখন মানুষের অবচেতন মন AI-কে রবের সমকক্ষ মনে করবে না।	ইবলিশের আদর্শ হলো প্রকৃত পরিচয়কে গোপন করা। বর্তমান সময়ে ইবলিশের আদর্শের অনুসারীরা AI সফটওয়্যারকে AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বললে মানুষের অবচেতন মনে AI-কে রবের সমকক্ষ বানিয়ে দেয়। তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যাতে মানুষ এর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নিজের বিবেক ও খোদভীতি হারিয়ে AI-কেই চূড়ান্ত সমাধানদাতা মনে করে।
১৫. লিখার প্রভাব	মুসলমানদের কাছে লেখা কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয়, বরং লেখা একটি আমানত এবং রুহানি শক্তি। আল-কোরআনের লিখন পদ্ধতি ও শব্দচয়ন এমন যে, এটি পাঠ করলে বা দেখলে মানুষের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল হয়। আল-কোরআনের লেখার প্রভাব সরাসরি মানুষের আত্মাকে স্পর্শ করে, যা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে বের করে আখেরাতমুখী করে তোলে। আরবি হরফ দিয়ে লেখা আরব মুসলমানদের মধ্যকার ভাষাগত দেয়াল ভেঙে বাঙালি মুসলমানদের ইসলামের আদলে এক দেহে পরিণত করে।	আল্লাহ সূরা নিসার ৪৬ নং আয়াতে বলেছেন ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক ধর্মীয় শব্দগুলোকে মূল অর্থ থেকে বিকৃত করে ফেলে। যেমন—তারা জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ, পর্দাকে নিপীড়ন এবং সুদকে ইন্টারেস্ট নাম দিয়ে শব্দের আধ্যাত্মিক ও আইনি গুরুত্বকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলে। লেখার এই প্রভাব দিয়ে ইবলিশের অনুসারীরা মুসলমানদের স্বর্ণযুগকে অন্ধকার যুগ হিসেবে তুলে ধরে। তারা বই-পুস্তকে সুকৌশলে এমন শব্দ ব্যবহার করে যাতে নতুন প্রজন্মের মনে নিজের ধর্ম ও পূর্বপুরুষদের প্রতি ঘৃণা জন্মায়।

সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন: ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আসমানি গ্রন্থের সঠিক অনুসরণ করাকে ধর্ম বলে। মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তাকে পৃথিবী উপযোগী শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। পৃথিবী উপযোগী শিক্ষার জন্য ব্যক্তির সঠিক অনুসরণ করাকে সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন বলে। আর মুসলমান জাতি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ করে। -আল-আহযাব: ২১

ধর্মীয় দর্শনের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
১. ধর্মীয় কিতাব	আল্লাহ তাআলা আল-কোরআন হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর নাজিল করেন। আল্লাহর নির্দেশ বাদ দিয়ে মানুষ যখন পূজা ও অশ্লীলতায় মগ্ন হয়ে গিয়েছে, তখন মানুষকে সঠিক ও শান্তির পথে নিয়ে আসার জন্য রাসূল (সা.) ইসলাম নিয়ে আসেন। এই ইসলামের মাধ্যমে মুসলমানগণ তাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। মুসলমানগণ ইসলাম ব্যতীত যদি ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের অশ্লীল আইন মানে, তাহলে মুসলমানরা কোন দিন শান্তি পাবে না। ইসলামের জন্য মুসলমান নয় বরং মুসলমানদের জন্য ইসলাম; যখন মুসলমানরা ইসলাম মানবে, তখন মানবজাতির কল্যাণ হবে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য মুসলমানদের আল্লাহর আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে।	হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে ইবরাহিম (আ.)-এর অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আসমানি কিতাব পাঠান। আসমানি কিতাব আসে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর, কিন্তু এই দুই জাতি আল্লাহর আসমানি কিতাবের আইন লঙঘন করে এবং আসমানি কিতাবকে বিকৃত করে তাদের মনগড়া অশ্লীল আইন বানায়। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এই সকল আইন ইবলিশের অপকর্ম হিসাবে আল-কোরআন বর্ণনা করেছে। যার কারণে আল্লাহ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে গজবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি বলেছেন এবং মুসলমানদেরকে এদের থেকে দূরে থাকার জন্য সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ আজ মুসলমানরা আল্লাহর আইন ছেড়ে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আইনের অনুসরণ করছে।
২. ধর্মীয় বিশ্বাস	আল-কোরআনের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের রিজিক ও জীবিকা নির্ধারিত। মানুষ যখন মনে করে জীবিকা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত তখন মানুষ অন্য কারো দাসত্ব মেনে নিতে চায় না। অন্যের দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর ওপর ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলে। আল্লাহর ওপর মানুষ যখন তাওয়াক্কুল করা শুরু করে তখন মানুষকে অন্য কেউ শোষণ ও নির্যাতন করতে পারে না। যেমন—মানুষ যখন নিজের রিজিকের জন্য নিজ ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল হয় তখন মানুষ আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে এবং সেই মানুষ কারো চাপ ও শোষণ মেনে নিতে চায় না।	মানুষকে ইবলিশ দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয় যাতে মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা না করে নিজের কর্মের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ইবলিশের দর্শন প্রচার করার জন্য ব্যবসার পরিবর্তে চাকরিকে সামনে নিয়ে আসে। চাকরিকে সামনে আনার পেছনে পুঁজিবাদী বাজারের বিশাল অর্থনৈতিক শোষণ রয়েছে। যেমন—মানুষ যখন রিজিকের ভয়ে অস্থির থাকে তখন সেই অস্থির ব্যক্তি চাকরি হারাবার ভয়ে তার মালিকের চাপ ও শোষণ মেনে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। এই মানসিক ভয় মানুষকে মানুষের গোলামিতে পরিণত করে।
৩. ধর্মীয় মাপকাঠি	আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত আল-কোরআন অনুসারে রাসূল (সা.) মদিনার সাহাবী দলকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। মদিনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাহাবীগণ পরবর্তীতে সকল মুসলমানের জন্য ইসলাম পালনের মাপকাঠি হয়ে যান। সাহবীগণকে মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করার কারণে পরবর্তী মুসলমানরা আল-কোরআনের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন—আল্লাহ বলছেন তোমরা ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করো। এই ঢিলেঢালা পোশাক কেমন হবে, তা রাসূল (সা.) সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাই মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি ঢিলেঢালা পোশাক নিয়ে বিতর্ক করে তখন ওই ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে বিতর্ক করছে বলে গণ্য হয়।	ইবলিশের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত অশ্লীলতার অনুসরণ করে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা। ইবলিশ তার অশ্লীলতার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেছে খ্রিষ্টান দেশগুলোকে। অশ্লীলতার মাপকাঠি খ্রিষ্টান দেশগুলো হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে যারা ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুসারী তারা খ্রিষ্টান দেশগুলোর পোশাক পরিধান করে এবং খ্রিষ্টান পোশাককে মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিক করার জন্য ঢিলেঢালা পোশাক নিয়ে বিতর্ক করে। যেমন—আপনি দেখবেন বর্তমান রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করে তাদের প্রায় সকলে খ্রিষ্টান ধাঁচের কোট-টাই ও শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে এবং সকল সরকারি চাকরিজীবী এই খ্রিষ্টান মডেলকে প্রাতিষ্ঠানিক মাপকাঠি হিসেবে মেনে চলে। কারণ খ্রিষ্টানরা এই পোশাক পছন্দ করে।

ধর্মীয় দর্শনের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৪. ধর্মীয় দল	আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে মতভেদ তৈরি করো না। আল্লাহর নির্দেশের কারণে ইসলামের শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে কোন দলাদলি ছিল না। কিন্তু ইবলিশের প্ররোচনায় সাহাবায়ে কেরামের সময় মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে একদল মদিনা রাষ্ট্রের প্রকৃত ইসলামকে অনুসরণ করে, আর অন্য দল মদিনা রাষ্ট্রের প্রচলিত ইসলামের মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। মদিনা রাষ্ট্রের ইসলামিক নিয়মের মধ্যে পরিবর্তন হওয়ার কারণে পরবর্তীতে মুসলমানরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যায়।	মুসলমানদের এই বিভক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা মদিনা রাষ্ট্রের ইসলামকে আরও খণ্ডিত করতে শুরু করে। যার ফলে সাধারণ মুসলমানরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে যে, প্রকৃত ইসলাম কোনটি। মুসলমানদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রাখতে খ্রিষ্টানরা কাদিয়ানি মতবাদের সৃষ্টি করে। ইসলামিক শিক্ষার শিকড় থেকে বিচ্যুত মাওলানা মওদুদীর মতবাদকে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ইসলামিক দল বলে উৎসাহিত করে এবং পীরের নামে মাজার পূজাকে প্রশ্রয় দেয়। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের এই সকল চক্রান্তের কারণে বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে আমরা নানা ফেরকা ও মতাদর্শ দেখি।
৫. ধর্মীয় সম্প্রীতি	সম্প্রীতি হলো মিলেমিশে থাকা, যা ইসলাম সমর্থন করে। কিন্তু বর্তমানে সম্প্রীতিকে এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন সব ধর্মই সমান এবং সব ধর্মই সত্য। ধর্মীয় এই সম্প্রীতির ফলে মুসলমানদের মনে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে সন্দেহ থাকার কারণে মুসলমান আর কাফেরের যে দূরত্ব আল-কোরআন তৈরি করে দিয়েছে তা কমে যায়। ধর্মীয় দূরত্ব কমার কারণে মুসলমানরা কাফেরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যায় আবার কাফেররা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আসে। সম্প্রীতির নামে মেলামেশা মুসলমানদের আদর্শিক শ্রেষ্ঠত্ব দূর করে দেয়। ফলে কাফেররা মনে করে মুসলমানরা তো আমাদের মতো।	আল্লাহ মুসলমানদের অবস্থান জান্নাত আর কাফেরদের অবস্থান জাহান্নাম নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারণের মাধ্যমে মুসলমান আর কাফেরের মধ্যে চিরস্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে। চির স্থায়ী দূরত্বের ফলে মুসলমান আর কাফের এক হতে পারে না এবং তাদের অবস্থান জাহান্নাম হওয়ার কারণে তাদের ধর্ম সত্য হতে পারে না। কিন্তু ইবলিশ চায় মুসলমানদেরকে কাফের বানাতে যাতে সবাই জাহান্নামী হয়ে যায়। ইবলিশের এই সম্প্রীতি বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু আলেমকে খ্রিষ্টানরা বিশেষ সুবিধা দেয় যাতে এই আলেমরা বাকি মুসলমান দেরকে সম্প্রীতির নামে ইবলিশের অনুসারী করে।
৬. ধর্ম নিরপেক্ষ	ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শ থেকে বের হয়ে এমন কিছুকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যাতে কোন ধর্মীয় ছোঁয়া নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করবে তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূল (সা.)-এর আদর্শের ছোঁয়া থাকবে। মুসলমানদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মুসলমানরা অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল; কিন্তু নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আদর্শের ব্যাপারে আপসহীন। যার কারণে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার বলে ধর্ম নিরপেক্ষ যে প্রচার করা হয় তা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানদের জন্য ইসলাম স্পষ্টভাবে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য তুলে ধরেছে। আল্লাহর আইন মানাকে মুসলমানরা আদর্শ মনে করে।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যখন সম্প্রীতির নাম দিয়ে সকল ধর্মের লোকজনকে এক করে ফেলে, তখন ধর্মনিরপেক্ষতা নাম দিয়ে তারা ভিন্ন এক আদর্শ নিয়ে আসে। মানুষ যেহেতু মানুষের জন্য আদর্শ ঠিক করতে পারে না, তাই ইহুদী-খ্রিষ্টানরা ধর্মনিরপেক্ষতা নামে ইবলিশের আদর্শ দিয়ে মানুষকে পরিচালনা করে। ইবলিশের আদর্শ হলো ধর্ম কেবল ব্যক্তিগত বিষয়, রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই। যখন মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় জীবনে ইবলিশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ও আইন গ্রহণ করে, তখন তারা সরাসরি আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করে। আর ইবলিশের অনুসারী ইহুদী-খ্রিষ্টানরা চায় মুসলমানরা যাতে আল্লাহর আইন অমান্য করে।
৭. ধর্মীয় কেন্দ্র	মসজিদ হলো মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। মসজিদে মুসলমানরা বিচার করে ও যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (সা.)-এর সময় থেকে মুসলমানরা বিপদে-আপদে মসজিদমুখী হয়। মুসলমানদেরকে মসজিদ থেকে বের করার জন্য কাফেররা মসজিদকে শুধু নামাজ পড়ার ঘর বানিয়ে দেয়। মসজিদে নামাজ পড়া ব্যতীত রাজনীতি ও যুদ্ধ নিয়ে কথা বলাকে তারা উগ্রবাদ বলে। যেহেতু মুসলমানরা মসজিদে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়, সেহেতু কাফেরদের দৃষ্টিতে এটি উগ্রবাদ। তবে যে সকল মুসলমান এটিকে উগ্রবাদ বলবে, তারা কাফেরদের অনুসারী হয়ে যাবে।	রাসূল (সা.)-এর সময় বাইতুন নাদওয়া ছিল কাফেরদের প্রাণকেন্দ্র। আল্লাহ বলেন কাফেরা বাইতুন নাদওয়াতে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরোধী চক্রান্ত করে এবং যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। রাসূল (সা.)-এর সময়ের সেই বাইতুন নাদওয়াকে বর্তমান কাফেরা নাম দিয়েছে জাতিসংঘ। যত দেশ ইবলিশের ধর্মনিরপেক্ষ আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করে, এই জাতিসংঘ হলো তাদের সকলের মিলনকেন্দ্র। এই জাতিসংঘের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি দেশ জুমার খুতবা ও ওয়াজ মাহফিল নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে কাফেরদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুসলমানরা কোন বিদ্রোহ করতে না পারে।

ধর্মীয় দর্শনের মাধ্যমে মানবজাতিকে পরিচালনা করার পদ্ধতি:

বিষয়	মুসলমানদের নিয়ম	খ্রিষ্টানদের নিয়ম
৮. ধর্ম ব্যবসা	যখন কোন ধর্মীয় আদর্শকে পুঁজি করে আয় করা হয় তখন তাকে ধর্ম ব্যবসা বলে। বাংলাদেশে মাজার কেন্দ্রিক ধর্ম ব্যবসাকে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা পরোক্ষভাবে সমর্থন দেয়। মানুষ যখন কবরে সিজদা করে বা মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চায়, তখন তার শিরক হয়। আর শিরককারী জাতি কখনোই আল্লাহর সাহায্য পায় না। ফলে শিরককারী মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখা সহজ হয়। অনেক মুসলমান এই শিরকে ইসলাম বলে।	বাংলাদেশের টিভি চ্যানেল ও অনলাইন সমূহ ইহুদী-খ্রিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণে। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা অনলাইনের জন প্রিয়তার নাম দিয়ে কিছু মুসলমানকে ইসলামিক স্কলার হিসেবে তৈরি করে। এই ইসলামিক স্কলাররা অন লাইনে নিজেদের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ইসলামের কঠোর ও বিপ্লবী আইনগুলো এড়িয়ে কেবল মিষ্টি কথা বলে। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তৈরি ইসলামিক স্কলাররা মূলত ধর্মের নামে কাফেরদের অনলাইন ব্যবসা চাঙ্গা রাখে।
৯. মডারেট মুসলমান	মুসলমানদের মধ্যে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের তৈরি কিছু মুসলমান আছে যারা নামাজ-রোজা করবে কিন্তু সুদের বিরুদ্ধে বলবে না। কাফেরদের তৈরি মডারেট মুসলমানরা সুদকে পরিস্থিতি হিসেবে মেনে নিতে বলে। এই মডারেটরা সুদকে বাদ দিয়ে কীভাবে যাকাত আসবে সেই ফতোয়া দেয় না; বরং সুদের মধ্যে কীভাবে চলবে তার ফতোয়া দেয়। ফলে সাধারণ মুসলমান সুদের মারপ্যাঁচে পড়ে সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। মডারেট মুসলমানরা পর্দা নিয়ে ছাড় দেবে এবং ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সংস্কৃতি মেনে নেয়। আর ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আদর্শ নিয়ে পরিচালিত মানুষকে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মিডিয়া ভালো মুসলমান হিসেবে প্রমোট করে।	ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যেই মুসলমানকে ভালো মুসলমান হিসেবে প্রমোট করবে মনে করতে হবে সেই মুসলমান ইসলামের ক্ষতি করেছে। যেমন— আপনি দেখবেন আফগানিস্তানের কোন আলেম খ্রিষ্টান দেশে ওয়াজ করতে পারে না। কিন্তু অনেক আলেম খ্রিষ্টান দেশের কাছে সম্মানিত। যারা কোরআনের প্রতিটি আইন হুবহু মানতে চায়, তাদেরকে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা উগ্রবাদী হিসেবে মডারেট মুসলমান দিয়ে প্রচার করে। ফলে সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢুকে যায়। এতে সাধারণ মানুষ ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আইন মানতে গেলেই মনে করে তারা উগ্র হয়ে যাচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ ভয়ে নিজের ইসলাম ধর্মকেই ছোট করতে শুরু করে।
১০. মানবাধিকার	আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই ভালো জানেন মানুষকে কীভাবে শাস্তি দিলে তারা পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে। মানুষ যাতে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে তার জন্য আল্লাহ বেতের আঘাত ও অঙ্গকর্তন করার মতো শাস্তি রেখেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে এই সকল শাস্তি সঠিক ন্যায়বিচার আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় যা মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।	আল্লাহর আইনের উপর মানবাধিকারের নামে যখন মানুষের তৈরি আইনকে স্থান দেওয়া হয়, তখন মানুষের আইন একটি সূক্ষ্ম শিরক হয়ে দাঁড়ায়। মানবাধিকারের মাধ্যমে আপনাকে বোঝানো হয়— চোরকে শাস্তি দেওয়া নিষ্ঠুরতা, এর চেয়ে মানবিক তাকে সংশোধন করা। মানবিকতার নাম দিয়ে আল্লাহর আইনকে অমানবিক প্রমাণ করে কাফেররা মানুষের মগজ থেকে আল্লাহর ভয় সরিয়ে দেয়।
১১. ধর্মীয় দোয়া	আল্লাহর কাছে আমরা সবাই নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাই। এই চাওয়ার জন্য সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ দোয়া করার কৌশল মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন— সূরা ফাতিহার তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ হলো আল্লাহর প্রশংসা করা। দ্বিতীয় অংশ হলো আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক। তৃতীয় অংশ হলো নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাওয়া। এই সূত্র অনুসারে মানুষ যখন বলবে—হে আল্লাহ আপনি আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। হে আল্লাহ আমি আপনার সৃষ্টি, আপনি আমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে সুস্থতা দান করুন, আমাকে সচলতা দান করুন—এইভাবে দোয়া করলে মানুষের মনে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষ চাইতেছে।	বাংলাদেশের মানুষ গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে নেতাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ যে পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই নেতার কাছে চায়। মানুষ নেতার কাছে চাওয়ার ফলে নেতা সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ হয়ে যায়। যেমন—আমরা নেতাকে বলি, আপনার জনপ্রিয়তা বেশি, আপনি অনেক উন্নয়ন করেছেন। আমি আপনার কর্মী, আমি আপনার প্রচারণা করি। হে নেতা, আমার ফ্যামিলি কার্ড লাগবে, আমার একটা ব্যবসা লাগবে। এখানে খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র নেতাকে প্রভু বানিয়ে দেয়। এই সকল মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আদিয়াতে বলেন—একটি ঘোড়াকে তার মালিক শুধু খাওয়ায়, তাতেই সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে; অথচ মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি কতই না অকৃতজ্ঞ!
১২. ধর্মীয় প্রভাব	আল্লাহর নির্দেশের প্রভাব হলো মানুষের বিবেক ও রুচির পরিবর্তন করা। যখন একজন মানুষ প্রকৃত ইসলামিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস গেঁথে যায় যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ দেখছেন। ফলে নির্জনেও সে আমানত রক্ষা করে এবং ঘুষ ও দুর্নীতির মতো কাজে লিপ্ত হয় না।	ইবলিশের দর্শনের প্রভাব হলো মানুষের পাশবিক স্বার্থপরতাকে উসকে দেওয়া। ইবলিশের বস্তুবাদী ব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের জীবনে দুনিয়াটাই সব, তাই যতটা পারো ভোগ করো। ভোগের নেশায় মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। ফলে মানুষের নৈতিকতার চেয়ে নিজের ক্যারিয়ার এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বড় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ থেকে মুসলিম বঙ্গ গঠনের রূপরেখা (মদিনা রাষ্ট্র)

ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলমানরা আল্লাহ কর্তৃক যে নির্দেশ পায়, তা হলো-রাসূল (সা.) যেন মানুষের মাঝে আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেন এবং রাসূল (সা.) যেন মানুষের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না করেন; আর রাসূল (সা.) যেন মানুষের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন যাতে মানুষেরা রাসূল (সা.)-কে আল্লাহর নাযিলকৃত কোন আইন থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। অতঃপর যদি মানুষেরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে রাসূল (সা.)-এর জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ মানুষের কিছু পাপের কারণে মানুষকে শাস্তি দিতে চান; আর মানুষের মধ্যে অধিকাংশ আল্লাহর আইন ত্যাগী।আল-মায়িদাহ: ৪৯

আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম বঙ্গ পরিচালিত হবে। মুসলিম বঙ্গ কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে না। আমরা উপরে সভ্যতার বারোটি বিষয়ের আলোকে মুসলমানদের নিয়মের সাথে খ্রিষ্টানদের নিয়মের পার্থক্য দেখেছি। এখন সভ্যতার বারোটি-১২ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ থেকে মুসলিম বঙ্গ গঠনের একটি প্রাথমিক বাস্তব চিত্র নিচে দেখবো। মুসলমানরা চৌদ্দশত বছর আগের মদিনা রাষ্ট্রের ইতিহাস জানে। বর্তমান সময়ে মদিনা রাষ্ট্রভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্র কেমন হবে এবং কোন কোন বিষয়গুলো মিল রেখে পরিবর্তন আনা হবে, পরিবর্তনের পরে নতুন মদিনা রাষ্ট্র কেমন হবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

মুসলিম বঙ্গের জন্য মুসলমানদের এখন থেকেই রাষ্ট্রব্যবস্থার কার্যক্রম শুরু করতে হবে। যুদ্ধে বিজয়ের পরে সকল কার্যক্রম একসঙ্গে শুরু করা সম্ভব হবে না। বিজয়ের পরে কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হলে জনগণ নিজ মন মতো পরিচালিত হবে; যার ফলে জনগণ নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা মেনে নিতে চাইবে না।

মজলিস-উস-শূরা (সরকার): রাসূল (সা.) মসজিদে নববী থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। এই জন্য মসজিদভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করার কেন্দ্রকে ইসলামিক সরকার বলে। মুসলমানরা মসজিদ ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। মুসলমানরা সরকার নির্বাচন করে শূরা পদ্ধতিতে। আল-কোরআনে শূরা নামে একটি সূরা আছে, যার কারণে মুসলমানরা এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করে। মুসলমানরা শূরা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কারণ নির্বাচিত শূরা সদস্যগণ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করে।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের শূরা সদস্য নির্বাচনের মাপকাঠি: -সহিহ বুখারি: ৬৭৮

১. মুসলিম বিবাহিত পুরুষ হতে হবে, যাঁর থাকবে পাঞ্জাবি, দাড়ি, পাগড়ি।
২. দেওবন্দকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় আল-কোরআন ও হাদিসের ওপর পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত হতে হবে।
৩. আল্লাহর সব আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ মানতে হবে।
৪. ব্যক্তির মধ্যে সুন্নাহসমূহ থাকতে হবে।
৫. মুজাহিদ হতে হবে। নিজ সন্তান বা পিতা মৃত মুজাহিদ হলে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।
৬. ব্যক্তির মধ্যে দানশীল মনোভাব থাকতে হবে।
৭. সপ্তাহে দুটি রোজা, তাহাজ্জুদ ও একাধিক বিবাহের আমল যাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে, তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের মসজিদ ভিত্তিক প্রশাসনিক-সরকার কাঠামো: -তাবলীগ

১. শূরা সদস্য নির্বাচনের মাপকাঠি দিয়ে প্রতিটি মসজিদের জন্য পাঁচ-৫ জন করে শূরা সদস্য নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত শূরা সদস্যদের পদবিগুলো হবে যথা:
   ক. মসজিদ আমির ও প্রাথমিক বিচারক-ইমাম সাহেব।
   খ. সহকারী আমির-একজন সমাজি।
   গ. অর্থবিষয়ক আমির-মুয়াজ্জিন সাহেব।
   ঘ. সমাজ উন্নয়ন আমির-একজন সমাজি।
   ঙ. নামায কায়েম আমির-একজন সমাজি।

২. পঁয়ত্রিশ-৩৫ টি মসজিদ নিয়ে একটি মারকায গঠিত হবে। মারকায মসজিদের শূরা সদস্য সংখ্যা হবে সাত-৭ জন।
৩. সাত-৭ টি মারকায নিয়ে একটি মডেল মসজিদ হবে। মডেল মসজিদের শূরা সদস্য সংখ্যা হবে এগার-১১ জন।
৪. এগার -১১ টি মডেল মসজিদ নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ হবে। কেন্দ্রীয় মসজিদের শূরা সদস্য সংখ্যা হবে পনেরো-১৫ জন।

৫. সকল কেন্দ্রীয় মসজিদের শূরা সদস্যগণের মধ্য থেকে যাচাইবাছাই করে মন্ত্রণালয়ের জন্য মন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হবে। মন্ত্রণালয়ে সর্বোচ্চ মন্ত্রীর সংখ্যা তেত্রিশ-৩৩ জন হবে। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সংখ্যার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের কথা চিন্তা করে মন্ত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যায়।
৬. মন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মুজাকারা করে রাষ্ট্রীয় প্রধান আমির নির্বাচন করবেন।
৭. মন্ত্রীগণ আমিরুল মুমিনীন-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবেন।
৮. মন্ত্রীগণ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে বা পরে রাষ্ট্রীয় খরচে হজ বা ওমরাহ পালন করবেন।
৯. মন্ত্রণালয় কম হলে এবং মন্ত্রী বেশি হলে, অতিরিক্ত মন্ত্রীগণ সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
১০. প্রতিটি মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রম মসজিদ, মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানার মাধ্যমে পরিচালনা করবে।
১১. প্রত্যেক মারকায মসজিদ, মডেল মসজিদ ও কেন্দ্রীয় মসজিদ এক একটি মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং মাদ্রাসার বিচার বিভাগ জনগণের বিচারকার্য পরিচালনা করবে। যাতে মুমিনদের একটি দল বিচার প্রত্যক্ষ করতে পারে।
১২. প্রাথমিক বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির চূড়ান্ত বিচার কেন্দ্রীয় মসজিদের তত্ত্বাবধানে থাকা মাদ্রাসা করবে।
১৩. এক মসজিদের শূরা সদস্য অন্য মসজিদের শূরা সদস্য হতে পারবে না।
১৪. প্রয়োজনে মসজিদ শূরা সদস্যের সংখ্যা কমানো-বাড়ানো যাবে।

১৫. যে সকল কারণে বিদ্যমান মন্ত্রী বা শূরা সদস্যকে অবসর প্রদান করা হবে এবং নতুন মন্ত্রী বা শূরা সদস্য দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, মন্ত্রী বা শূরা সদস্যের অবসরের কারণ: -তাবলীগ

১. মন্ত্রী বা শূরা সদস্য কোন ফরজ আইন অমান্য করলে।
২. আমিরুল মুমিনিন নির্দেশ প্রদান করলে।
৩. সদস্যের বেশি বয়স হলে বা ১০০ বছর অতিক্রম করলে।
৪. মন্ত্রী বা শূরা সদস্য শারীরিকভাবে অক্ষম হলে।
৫. মন্ত্রী বা শূরা সদস্য পাগল হলে।
৬. মন্ত্রী বা শূরা সদস্য সুন্নাহসমূহ ত্যাগ করলে।

মন্ত্রী বা শূরা সদস্যকে সঠিক কারণে অবসর প্রদান করলে দেশ কখনো মুনাফিক দ্বারা পরিচালিত হবে না। বয়সের কারণে অবসর গ্রহণকারী সকল মন্ত্রী বা শূরা সদস্যগণ রাষ্ট্রের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্বে পালন করবেন।

বাস্তবিক প্রভাব: মসজিদভিত্তিক মন্ত্রণালয়ের কার্যকর হলে নতুন সচিবালয়, অফিস, বিলাসবহুল গাড়ি ও প্রটোকলের প্রয়োজন হবে না। মসজিদ ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে প্রশাসন চলায় প্রতি বছর প্রশাসনিক খরচ ৮০ হাজার কোটি টাকা, নির্বাচন ব্যয় ৫ বছরে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, এডিপির-ADP উন্নয়ন খরচ ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ ও আবাসন খরচ ২০ হাজার কোটি টাকা মিলে, মোট আনুমানিক প্রতি বছর ২ লক্ষ কোটি টাকা রাষ্ট্রের সাশ্রয় হবে। সাশ্রয়কৃত টাকা দিয়ে প্রতি বছর ৫টি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যাবে। এবং প্রোটোকল জ্বালানি, যাতায়াত, জেনারেটর, এসি মিলে প্রতি বছর ১২৯ কোটি লিটার তেল বেঁচে যাবে। এই তেল দিয়ে প্রায় ১ কোটি একর জমিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেচ দেওয়া যাবে। পাশাপাশি সমাজে কোন গরিব থাকবে না। যেমন—প্রতিটি মসজিদের অর্থবিষয়ক আমির-মুয়াজ্জিন সাহেব স্থানীয় যাকাত, ওশর এবং সদকা সংগ্রহ করে স্থানীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারবেন। এতে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের প্রবণতা ব্যাপকভাবে কমে যাবে। প্রতিটি মাদ্রাসায় বিচার বিভাগ থাকার কারণে স্থানীয় মামলাগুলো স্থানীয়ভাবেই মীমাংসা হবে। এতে কয়েক বছরের মামলার বিচার হবে কয়েক দিনে, যা মানুষের ভোগান্তি ও উকিল খরচ কমিয়ে দেবে। নামাজ কায়েম আমির এবং সমাজ উন্নয়ন আমির সরাসরি জনগণের সাথে মিশে থাকার কারণে সমাজে মাদক, জুয়া ও যিনা বন্ধ হয়ে যাবে। সর্বোপরি, মসজিদ-মাদ্রাসাভিত্তিক প্রশাসন একটি আধ্যাত্মিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী ইনসাফপূর্ণ মদিনা রাষ্ট্র উপহার দেবে। আর মসজিদভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো হলে প্রায় ১৫ লক্ষ কওমি মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র নতুন করে চাকরি পাবে।

আদল (বিচার): আল্লাহর আইন দিয়ে রাসূল (সা.) রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। এই জন্য মুসলমানদের সংবিধান আল-কোরআন এবং মুসলমানদের আইন সুন্নাহ সমূহ। আল-কোরআনের আইনের আলোকে অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ নিশ্চিত করে শরিয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান করাকে ইসলামিক বিচার বলে। আল-কোরআনের আইন দিয়ে বিজ্ঞ ফকিহ, মুফতি ও মুহাদ্দিসগণ মুসলমানদের বিচার করেন। বিজ্ঞ বিচারকগণ মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন। এককথায় বিজ্ঞ মোল্লাগণ মুসলমানদের বিচারক ও আইনজীবী হন।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের বিচার ব্যবস্থার আইন সমূহ:

১. সুদ- রিবা: মুসলমানদের জন্য হারাম সুদের লেনদেন করা। যে মুসলমান সুদের লেনদেন করবে সেই মুসলমান আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করছে বলে গণ্য হবে। আল্লাহ ও রাসূলের (সা.) সাথে যুদ্ধ করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। -বাকারা: ২৭৫-২৭৯

২. ইসলাম অবমাননাকারী-শাতেম: কোন মুসলমান যদি আল্লাহকে নিয়ে বা রাসূল (সা.)-কে নিয়ে খারাপ কথা বলে তখন সেই মুসলমান ব্যক্তির জন্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হয়। এবং মুসলমান শাতেমের তওবা গ্রহণ করা হয় না। -আহজাব: ৫৭, হাদিস

৩. ইসলাম ত্যাগী-মুরতাদ: কোন মুসলমান যদি আল্লাহকে ত্যাগ করে বা শিরক করে তখন আল-কোরআনের আইন তাকে মুরতাদ বলে। ইসলাম ত্যাগী মুরতাদ ব্যক্তির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। -নিসা: ৪৮, মায়িদা: ৭২, সহীহ বুখারী: ৩০১৭

৪. মূর্তি-আওসান: মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি তৈরি করা। মুসলমানদের উপর নির্দেশ রয়েছে ইব্রাহিম (আ.)-এর ন্যায় ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার। -হজ্জ: ৩০, আল-আম্বিয়া: ৫৮, আন-নাহল: ১২৩, সহীহ মুসলিম: ৯৬৯

৫. প্রতিশোধ-কিসাস: কোন মুসলমান যদি অন্য কোন মুসলমানকে আঘাত করে। তখন আল-কোরআনে সমপরিমাণ আঘাত ফেরত দেওয়ার ইসলামিক আইন রয়েছে। এবং কোন মুসলমান যদি অন্যায়ভাবে অন্য কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তখন আল-কোরআনে জীবিত ব্যক্তির শাস্তির রায় হলো মৃত্যুদণ্ড; তবে নিহতের পরিবার চাইলে রক্তমূল্য-দিয়াত গ্রহণ করতে পারবে অথবা ক্ষমা করে দিতে পারবে। -আল-বাকারা: ১৭৮-১৭৯

৬. চুরি ও ডাকাতি-সারিকা ও হিরাবাহ: কোন মুসলমান যদি চুরি করে, তখন আল্লাহর আইন অনুসারে মুসলিম বিচারকগণ চুরির কারণ ও ধরনের উপর নির্ভর করে হাত কাটার শাস্তি দিতে পারবেন। এবং কোন মুসলমান যদি ডাকাতি করে তখন অপরাধের ধরন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেওয়ার শাস্তি দিতে পারবেন। -মায়িদাহ: ৩৮, ৩৩

৭. ব্যভিচার-যিনা: মুসলিম অবিবাহিত পুরুষ-নারী যিনা করলে, ১০০টি বেত্রাঘাত করতে বলেছেন। এবং মুসলিম বিবাহিত পুরুষ-নারী যিনা করলে, পাথর নিক্ষেপ-রজম করে মৃত্যুদণ্ড দিতে বলেছেন। -নূর: ২, সহীহ বুখারী: ৬৮৭৮

৮. নারীর অশ্লীলতা-তাবাররুজ: আল্লাহ মুসলমান নারীদের পর্দা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যে মুসলমান নারী পর্দার আইন অমান্য করবে, তাকে মুসলমান বিচারকগণ শাস্তি জরিমানা-বেত্রাঘাত দিতে পারবেন। -নূর: ৩১, আহজাব: ৩৩, ৫৯

৯. পোশাক-লিবাস: রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন মুসলমানদের পোশাক স্বচ্ছ ও সংকীর্ণ হতে পারবে না। মুসলমানদের পোশাক অবশ্যই সতর আবৃত করবে। কোন মুসলমান পোশাকের আইন লঙঘন করলে বিচারক অশ্লীলতার ধরন অনুসারে শাস্তি দিতে পারবেন। মুসলমান পুরুষের ক্ষেত্রে গোড়ালির নিচে পোশাক পরা হারাম। -আরাফ: ২৬

১০. নেশা-খামর: মুসলমানদের জন্য হারাম নিজের ক্ষতি করা। মাদক শারীরিক ক্ষতি করে। যদি কোন মুসলমান মাদক সেবন করে তখন আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সেই মুসলমানকে হদ্দে শরব ৮০ টি বেত্রাঘাত করার। সিগারেট যেহেতু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও অপচয় তাই সিগারেট হারাম। -মায়িদা: ৯০, বাকারা: ১৯৫

১১. কষ্ট-উফ: আল্লাহ পিতা-মাতাকে উফ শব্দও বলতে নিষেধ করেছেন। তাই মুসলমানদের জন্য হারাম পিতা-মাতাকে মারধর করা। কোন মুসলমান যদি মারধর করে তখন বিচারক অপরাধের ধরন অনুসারে শাস্তি দিতে পারবেন। -বনী ইসরাঈল: ২৩

১২. উত্তরাধিকার-ফারায়েজ: আল্লাহ মৃত মুসলমানের সম্পদ বণ্টনের আইন দিয়েছেন। মুসলমানদের জন্য কবিরা গুনাহ আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সম্পত্তির নির্ধারিত অংশ না দেওয়া। সম্পত্তি দখল করার জন্য মুসলিম বিচারক শাস্তি-জরিমানা ও দখলকৃত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন। -নিসা: ৭,১১-১২, ১৭৬

১৩. সমকামিতা-ফাহিশাত: মুসলমানদের জন্য হারাম পুরুষ-পুরুষ ও নারী-নারী যিনা করা। সমকামিতার শাস্তি হিসেবে হানাফী ফকীহগণ মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তবে মুসলমান বিচারক পাপের ধরন অনুসারে কঠোর শাস্তি দিতে পারবেন। -আরাফ: ৮০

১৪. সম্পদ আত্মসাৎ-আকলুল মাল: আল্লাহ এক মুসলমানের সম্পদ অন্য মুসলমানের আত্মসাৎ করা হারাম করেছেন। মুমিন ব্যক্তি যেন অন্য মানুষের ধন-সম্পত্তির অংশ আছে জেনেও বিচারকদের কাছে মিথ্যা মামলা নিয়ে না যায়। যদি আত্মসাৎ প্রক্রিয়া চুরি-ডাকাতির শর্তাবলি পূরণ করে তবে মুসলমান বিচারক চুরি-ডাকাতির শাস্তি দিতে পারবেন। -বাকারা: ১৮৮

১৫. ওজনে কম-তাতফীফ: আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ওজনে কম দেওয়া হারাম করেছেন। ওজনে কম দেওয়ার মাধ্যমে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের হক নষ্ট করে। যে মুসলমান এই কাজ করবে তাকে মুসলমান বিচারক শাস্তি দিতে পারবেন এবং ক্ষতিপূরণ ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারবেন। -আল-মুতাফ্‌ফিফীন

১৬. মিথ্যা অপবাদ-কযফ: আল্লাহ সচ্চরিত্রবান মুসলমানের ওপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়াকে হারাম করেছেন। যদি কোন মুসলমান অন্য মুসলমানের নামে অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে না পারে, তবে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে অপবাদদানকারীকে মুসলমান বিচারক ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং পরবর্তীতে ওই ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার হারাম হয়ে যাবে। -আন-নূর: ৪

১৭. এতিমের সম্পদ-আকলু মালিল ইয়াতীম: আল্লাহ মুসলমানদের জন্য এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করাকে হারাম করেছেন। যেই মুসলমান এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে সেই মুসলমান নিজের পেটে আগুন ভর্তি করবে। মুসলমান বিচারক এতিমের সম্পদ আত্মসাত করার অপরাধে মুসলমান অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দিতে পারবেন। -নিসা: ১০

১৮. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি—ফাসাদ ফিল আরদ: কোন মুসলমান যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায়, তখন মুসলমান বিচারক অপরাধের ধরন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দিতে পারবেন। -মায়েদাহ: ৩৩

১৯. দাম্পত্য বিচার-লিআন: যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে কিন্তু চারজন সাক্ষী দিতে না পারে, তবে আল্লাহর আইন অনুসারে বিচারকের সামনে স্বামী ও স্ত্রীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে শপথ করতে হবে। এই বিচারিক প্রক্রিয়ার পর তাদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবে এবং তারা একে অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। -নূর: ৬-৯

২০. যাকাত অস্বীকার-মানিউয যাকাত: আল্লাহর নির্দেশিত যাকাত দিতে কোন সামর্থ্যবান মুসলমান যদি অস্বীকার করে, তখন মুসলমান বিচারক তার বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। -তওবা: ৫, ১০৩

বিঃ দ্রঃ এখানে উল্লিখিত আইন ছাড়াও ফিকহি কিতাব অনুসারে মুসলমানদের জন্য আরও কিছু আইন রয়েছে।

বাস্তবিক প্রভাব: যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবি করবে তার ওপর আল্লাহর আইন মানা ফরজ হয়ে যায়। মুসলমানদের জন্য নামাজ যেমন আল্লাহর নির্দেশ, তেমনি উপরোক্ত আইন মানাও আল্লাহর নির্দেশ। কোন ব্যক্তি নামাজকে অস্বীকার করলে যেমন কাফের হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহর আইন অস্বীকার করলে সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদেরকে সংসদীয় আইন বলে যে সকল আইন মানতে বাধ্য করা হয়, তার সব আইনই খ্রিষ্টানদের তৈরি করা। যেমন—রোমানদের জাস সিভিল থেকে ১৮৭২ সালের চুক্তি আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ও অর্পিত দায়িত্ব আইন নেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের কমনল থেকে দণ্ডবিধি-১৮৬০, ফৌজদারি, টর্ট ও সাক্ষ্য আইন নেওয়া হয়েছে। খ্রিষ্টান বাইবেল থেকে ক্যাননল বিবাহবিচ্ছেদ আইন-১৮৬৯, উইল আইন ও শপথ গ্রহণ আইন নেওয়া হয়েছে। মানুষের তৈরি সংসদীয় আইন হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। বাংলাদেশের আইনগুলো খ্রিষ্টানদের থেকে নেওয়ার কারণে মুসলমানরা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে গেলে খ্রিষ্টান আইনে মুসলমানরা জঙ্গি হয়ে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত মিলিয়ে ২ হাজার মুসলমান খ্রিষ্টানদের আইনে বিচার করে। বাংলাদেশে এই অল্প সংখ্যক বিচারকের কারণে প্রায় ৪২-৪৫ লক্ষ মামলা ঝুলে আছে। একজন বিচারকের ওপর গড়ে ২ হাজার -এর বেশি মামলার চাপ থাকার কারণে মামলার রায় হতে ১০-১৫ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। যদি মুসলমানদের আইনে বিচার করা হতো, তখন প্রতিটি মসজিদে ইমাম সাহেব প্রাথমিক বিচারক হতেন এবং প্রতিটি মারকাজ, মডেল ও কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে মাদ্রাসাভিত্তিক বিচার বিভাগ থাকার কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষ বিচারক থাকত। ফলে এখন যে বিচার পেতে ১০ বছর লাগে, তখন তা ১০-১৫ দিনে বা বড়জোর কয়েক মাসে শেষ হয়ে যেত।

তিজারা (ব্যবসা-বাণিজ্য): আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন, সুদকে হারাম করেছেন। মুসলমানরা প্রতি বছর ব্যবসার অংশ থেকে যাকাত প্রদান করে। যাকে যাকাত ভিত্তিক ব্যবসানীতি বা যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি বলে। আর কাফেররা যাকাত দেওয়াকে জরিমানা মনে করে। কাফেররা যাকাত ভিত্তিক ব্যবসানীতি মানে না। মুসলমানরাও সুদভিত্তিক ব্যবসানীতি মানে না। রাসূল (সা.) পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সুখে মদিনার যাকাত ভিত্তিক ব্যবসানীতি রেখে গেছেন। নিচে মুসলমানদের যাকাত ভিত্তিক ব্যবসানীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের ব্যবসানীতি বা অর্থনীতি:
১. আল্লাহ তিনটি আইন দিয়েছেন মুসলমানদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে:
ক. সম্পদ জমা করার আইন সূরা হাশর-৭: আল্লাহ সর্বপ্রথম সূরা কাসাসে কারুনের গল্প বলে মুসলমানদের বুঝিয়েছেন সম্পদ জমা করার পরিণতি কী হবে। পরবর্তীতে আল্লাহ সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন সম্পদ যেন ধনী মুসলমানদের মধ্যে ঘুরপাক না খায়। কিন্তু বাংলাদেশে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানির সুদভিত্তিক ব্যবসানীতির কারণে সম্পদ গুটি কয়েকজন ব্যক্তির কাছে ঘুরপাক খায়। -কিয়াস

খ. উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন আইন সূরা আন-নিসা-১১,১২: আল্লাহ মৃত মুসলমানের সম্পদ বণ্টন করার জন্য আইন দিয়েছেন। বাংলাদেশের মুসলমান ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার সম্পদ বণ্টন করে। কিন্তু বাংলাদেশে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের যে সুদভিত্তিক গ্রুপ ও লিমিটেড কোম্পানির আইন আছে তাতে আল্লাহর সম্পদ বণ্টন আইন প্রয়োগ হয় না। কারণ খ্রিষ্টানদের আইন অনুসারে কোম্পানি একটি কৃত্রিম ব্যক্তি। কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তি হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠাতা মৃত্যুবরণ করলেও কোম্পানি মৃত্যুবরণ করে না। কোম্পানি মৃত্যুবরণ না করার কারণে মানুষের মধ্যে অর্থের প্রবাহ কমে যায়। -কিয়াস

গ. যাকাত দেওয়ার আইন সূরা আল-বাকারা-৪৩: আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যাকাত দেওয়ার আইন দিয়েছেন। মুসলমানরা প্রতিবছর তার ব্যবসা থেকে যাকাত দান করে। আর কাফিররা যাকাত দেওয়াকে জরিমানা মনে করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কাফিরদের সুদভিত্তিক ব্যবসায়িক আইন থাকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কিছু কোম্পানি ও ব্যক্তি দিন দিন ধনী হচ্ছে, আর দেশের বাকি মুসলমানরা দিন দিন গরিব হচ্ছে। -কিয়াস

২. উপরের তিনটি আইনের উপর ভিত্তি করে সুখে মদিনার নিয়মে মুসলমানদের ব্যবসানীতি দেখানো হলো:
ক. সাগির: খুচরা বিক্রেতা একই দোকানে চাল, ডাল, তেলসহ সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। খুচরা বিক্রেতার সীমাবদ্ধতা, তারা ব্যবসার পরিধি বাড়াতে পারবেন অর্থাৎ দোকান বড় করতে পারবেন, কিন্তু শাখা বিস্তৃত করে চেইন শপ করতে পারবেন না। এতে স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা টিকে থাকবে। -সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৩৭

খ. মুতাওয়াসসিত: পাইকারি বিক্রেতা পণ্য উৎপাদন করবেন না, শুধু নির্দিষ্ট একটি পণ্যের ব্যবসা করবেন-যেমন- চাল বা তেল। পাইকারি বিক্রেতার সীমাবদ্ধতা, পাইকারি বিক্রেতা একাধিক পণ্যের পাইকারি ব্যবসা করতে পারবেন না। তবে পাইকারি বিক্রেতারা একটি নির্দিষ্ট বিভাগের অধীনে জেলাগুলোতে ব্যবসা বিস্তার করতে পারবেন। -আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: খণ্ড ৭-৯১

গ. কাবির: উৎপাদনকারী বিক্রেতা পণ্য উৎপাদন করবেন এবং সারাদেশে তা সরবরাহ করবেন। উৎপাদনকারী বিক্রেতাদের সীমাবদ্ধতা হলো একজন ব্যক্তির একটি প্রতিষ্ঠান হবে, এবং প্রতিষ্ঠান কেবল একটি নির্দিষ্ট পণ্যগুচ্ছ উৎপাদন করতে পারবে। যেমন- ধান থেকে উৎপন্ন চাল ও তুষ বিক্রয় করতে পারবে, ডিম নয়। উৎপাদনকারী বিক্রেতা লট ধরে পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রয় করবে। এতে খুচরা বাজার নষ্ট হবে না এবং বড় কোম্পানির একাধিপত্য ভাঙতে সাহায্য করবে। সহিহ মুসলিম: ১৬০৫

৩. ব্যাংক: রাসূল নিজে আমানত রাখতেন আবার তা ফিরিয়ে দিয়ে ব্যংকের কাজ করতেন। মুসলিম দেশে ১টি মাত্র সুদবিহীন আমানত ব্যাংক থাকবে যা নিয়ন্ত্রণ করবে ইসলামিক সরকার। আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার সুবিধা নেওয়ার জন্য ফি প্রযোজ্য হবে। সরকার ব্যাংক থেকে আয়কৃত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে। -সীরাতে ইবনে হিশাম: ১ম খণ্ড

৪. ব্যক্তিগত বিনিয়োগ: কোন ব্যক্তির উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকলে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপনে তা নষ্ট না করে সরাসরি রাষ্ট্রীয় মেগা প্রজেক্টে বিনিয়োগ করতে পারবেন। যেমন- সেতু, বন্দর, সড়ক। -সহিহ বুখারি: ২৭৭৮

৫. বাজার তদারকি: সরকার কাবির ব্যবসায়ি গণের পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা-সাপ্লাই চেইন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে। -সহিহ বুখারি: ২১৬২

৬. রেমিটেন্স: আন্তর্জাতিক সুদি ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে ইসলামিক সরকার হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স আদান-প্রদান করবে। অর্থাৎ, সকল দেশে ইসলামিক সরকারের এজেন্ট থাকবে; প্রবাসীরা তাদের কাছে অর্থ দিলে তারা দেশের ব্যাংকে জানিয়ে দেবে এবং ব্যাংক সেই পরিমাণ অর্থ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা করে দেবে। অন্যদিকে, সরকারি এজেন্টের ওই দেশের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমাকৃত রেমিটেন্স দিয়ে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি করবে। -সহিহ বুখারি: ২২০১

৭. মুদ্রানীতি: বর্তমান সময়ে আমরা বিনিময় প্রথা কিংবা স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রথায় ফিরে যেতে পারছি না। তবে মুসলমানরা সম্পদ ও স্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে কাগজের টাকার মান নির্ধারণ করবে। -সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৪৭

৮. রাষ্ট্রীয় সম্পদ: সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিভাজন-অযোগ্য ব্যবসা ইসলামিক সরকার পরিচালনা করবে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত রাজস্ব রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে। যেমন- লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল প্রকার তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, মোবাইল কল, কেমিক্যাল, বন্দর, বিমান, রেল ও গণপরিবহন। -সুনানে আবু দাউদ: ৩০৬৪

৯. যাকাত বণ্টন: মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদকেন্দ্রিক যাকাত ও উশর আদায় করে উক্ত সমাজে তা বণ্টন করে দেবেন। যে মসজিদে উদ্‌বৃত্ত থাকবে, তা অন্য মসজিদে হস্তান্তর করে দেবেন। যাকাত ও উশর বাইতুল মাল তহবিলে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারপরও উদ্‌বৃত্ত হলে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। -কিতাবুল আমওয়াল: পৃষ্ঠা ৫৯৬

১০. সাদাকা: ইসলামিক সরকারের কেন্দ্রিয় কোষগারকে বাইতুল মাল বলা হয়। ইসলামিক সরকার বাইতুল মাল পূরণের জন্য জনগণের নিকট অনুদান চাইবে, যা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। -সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭৭

১১. আমদানিকৃত শস্য: সরকারের হাতে থাকা সকল মৌলিক সম্পদ ও আমদানিকৃত পণ্য সরকার পাইকারি ও উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করবে। -তারীখুত তাবারী

১২. ইসলামিক রাষ্ট্রের বাজেট হবে এমন:
ক. রাষ্ট্রের আয় = (খনিজ ও মৌলিক শিল্পের মুনাফা) + (ব্যাংকিং সেবা চার্জ) + (পরিবহন ও লজিস্টিক মুনাফা) + (বাইতুল মাল অনুদান) + (রেমিটেন্সের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয়লব্ধ আয়)

খ. রাষ্ট্রের ব্যয় = (জনসেবা) + (বেতন ও প্রশাসন) + (অবকাঠামো উন্নয়ন) + নিরাপত্তা

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশে গুটিকয়েক বড় কোম্পানি চাল, ডাল থেকে শুরু করে জাহাজ নির্মাণ পর্যন্ত সব নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রুপ কোম্পানি আইন বাদ হলে দেশে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়বে, ফলে সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। গ্রুপ কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে যখন মদিনা রাষ্ট্রের নিয়মে ব্যবসা আইন চালু হবে, তখন সুপারশপ ও চেইন শপগুলো যেই ৫ হাজার কোটি টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, তা বন্ধ হয়ে ৩-৪ লাখ ক্ষুদ্র দোকানদার স্বাবলম্বী হবে। বর্তমানে বড় বড় চেইন শপ যেমন— স্বপ্ন, আগোরা একটি বিশাল এলাকার বাজার দখল করে মাত্র ১০-১৫ জন কর্মী দিয়ে কাজ চালায়। কিন্তু চেইন শপ নিষিদ্ধ হলে প্রতি এলাকায় চেইন শপের বদলে অন্তত ১০টি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দোকান এবং ৫টি পাইকারি দোকান গড়ে উঠবে; তখন সরাসরি ৪৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। প্রতিটি দোকানে গড়ে ৩ জন করে বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে। এই দোকানদারদের থেকে বর্তমান জিডিপি এবং ব্যক্তি খাতের সম্পদ অনুসারে প্রতি বছর ৬০-৭০ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করা যাবে। আদায়কৃত যাকাত ও উশর দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের সকল দরিদ্র পরিবারকে স্বাবলম্বী করা সম্ভব হবে। যাকাত ও উশর আদায় করলে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বাবদ ১.২৬ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। বাংলাদেশে চাষযোগ্য জমি প্রায় ২ কোটি একর; গরিবরা স্বাবলম্বী হলে ১ কোটি একর জমিতে যদি বিনামূল্যে সেচ ও সরকারি উদ্যোগে বীজ সরবরাহ করা হয়, তবে সেখানে বছরে অন্তত ৩টি ফসল ফলানো সম্ভব হবে। প্রতি একর জমিতে অতিরিক্ত নিবিড় চাষাবাদের জন্য অন্তত ২ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ফলে কৃষি খাতে ২ কোটি মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে এবং কৃষিপণ্যের দাম ৩০-৪০% কমে আসবে। এতে গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা শূন্যে নেমে আসবে। মানুষ শহরমুখী না হলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বেসরকারি কেন্দ্রগুলোকে যে ক্যাপাসিটি চার্জ ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি দিতে হয়, তা শূন্যে নেমে আসবে। জ্বালানির জন্য অর্থের চাহিদা যখন কমে যাবে, তখন হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আদান-প্রদানের ফলে ডলারের কৃত্রিম সংকট থাকবে না। কৃত্রিম সংকটমুক্ত ব্যবস্থায় বাংলাদেশে যেই ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে, তার সব যদি রাষ্ট্রীয় একটি ব্যাংক হয়। তখন জন সেবার মাধ্যমে আয় ১৮ হাজার কোটি টাকার লভ্যাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।

তালিম (শিক্ষা): মানুষ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার কারণে মানুষকে পৃথিবী-উপযোগী শিক্ষা গ্রহন করতে হয়। পৃথিবী-উপযোগী শিক্ষা গ্রহন করার জন্য রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করাকেই ইসলামিক শিক্ষা বলে। এই শিক্ষা মুসলমান জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কওমি ও ডিপ্লোমা—এমন নানা ভাগে বিভক্ত হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য দেখা যায়। মুসলমানদের জন্য ইসলামে প্রাথমিক শিক্ষা হলো আল-কোরআন। মুসলমানদের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হয় ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা:

১. মানুষের প্রথম শিক্ষা শুরু হবে আল-কোরআন কেন্দ্রিক। -আল-আলাক: ১-৫
২. মানুষকে শিক্ষার পূর্বে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শেখানো হবে। -ইমাম মালিক (র.)
৩. মানুষকে জন্মের ৫-১০ বছর বয়সের মধ্যে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার এবং আল-কোরআন শেখানো হবে। -ইজমা
৪. শিক্ষার্থীদের ১১-১৭ বছর বয়সের মধ্যে ইসলামিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হবে। -সুনানে তিরমিজি: ২৭১৫
৫. পুরুষ শিক্ষার্থীদের ১৮-২০ বছর বয়সের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়া হবে। -সহিহ বুখারি: ১৯৬৬
৬. পুরুষ শিক্ষার্থীরা ২১-২৩ বছর বয়সের মধ্যে তাদের পছন্দমতো বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পাবে। -বাইতুল হিকমাহ
৭. সাধারণ শিক্ষার পর নারীরা আমিরের পরামর্শ সাপেক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। -সুনানে আবু দাউদ: ৩৮৮৭
৮. প্রতিটি ছাত্র ১৮ বছর বয়সে তিন মাস মেয়াদী আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ নেবে। -সুনানে আবু দাউদ: ২৫১৩
৯. মুসলমান পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। -সহিহ বুখারি: ১০১
১০. আহলুল জিম্মা নাগরিকদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। -মদিনার সনদ: ২৫
১১. রাসূল (সা.)-এর সময় মদিনার আহলে সুফফার শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য ছিল। -সুনানে আবু দাউদ: ৩৪১৬
১২. বর্তমানে দেওবন্দ মাদ্রাসা আহলে সুফফার শিক্ষা ধারাকে অনুসরণ করে। -কাসেম নানুতুবী (র.)
১৩. মুসলমানদের বর্তমান শিক্ষা সিলেবাস দেওবন্দকে ভিত্তি করে হবে। -কিয়াস
১৪. মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি অভিন্ন ইসলামিক শিক্ষা কাঠামোতে সমন্বিত করা হবে।। -কিয়াস
১৫. যাকাতভিত্তিক ব্যবসানীতি বা অর্থনীতির শিক্ষা দেওয়া হবে। -আল-বাকারা: ২৭৬
১৬. শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। -আল-মুজামুল আওসাত: ৬১৮৪
১৭. মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য নির্দিষ্ট শারীরিক শিক্ষা থাকবে। -সহিহ মুসলিম: ২৬৬৪
১৮. শিক্ষার্থীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিখানোর জন্য বর্জ্যব্যবস্থার শিক্ষা থাকবে। -সহিহ মুসলিম: ২২৩

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবার আয়ের প্রায় ৩০-৪০% সন্তানদের পড়াশোনা, কোচিং এবং প্রাইভেট টিউশনে ব্যয় করে। মুসলমানদের মসজিদ ও মাদ্রাসা ভিত্তিক একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা হলে কোচিং সেন্টারের প্রয়োজন থাকবে না। এতে দেশের জনগণের বার্ষিক ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যয় সাশ্রয় হবে। বর্তমানে বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল বনাম মাদ্রাসা সমাজে যে মনস্তাত্ত্বিক বিভেদ তৈরি করেছে, একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা তা নির্মূল করবে। গবেষণায় দেখা যায়, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে মাদকাসক্তি ও সহিংস অপরাধের হার অন্তত ৫০-৬০% কম হয়। অপরাধ কম হলে কারাগার ও পুলিশি ব্যবস্থার পেছনে রাষ্ট্রের ব্যয় কমবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বাড়বে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য ১৮ বছর বয়সে ৩ মাসের আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ দিলে ৫ বছরে ১ কোটি তরুণ প্রশিক্ষিত হবে। এই প্রশিক্ষিত তরুণ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে এক অজেয় শক্তিতে পরিণত করবে। এই শক্তি বিশাল সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ৩৮-৪০ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে আনবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী ১৬-১৮ বছর পড়াশোনা করে কোন পেশাদার দক্ষতা ছাড়া বের হয়, যাদের মধ্যে ৪০% স্নাতক পাস করা বেকার। ইসলামিক সমন্বিত শিক্ষার ফলে ছাত্ররা ২১ বছর বয়সের আগেই দেশের ৯৮% যুবক উৎপাদনশীল হবে। এর ফলে বছরে নতুন করে প্রায় ২০-৩০ লক্ষ দক্ষ জনবল শ্রমবাজারে যুক্ত হবে, যারা বিসিএস ও চাকরির পেছনে ১০ বছর নষ্ট করবে না।

নিকাহ (বিবাহ): অবিবাহিত নারীর জন্য হালাল পুরুষের ওপর নির্ধারিত অর্থের-দেনমোহর বিনিময়ে নারীর অভিভাবকত্ব হস্তান্তর করাকে ইসলামিক বিবাহ বলে। বিবাহের মাধ্যমেই একটি আদর্শ পরিবারের সূচনা হয়।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের বিবাহ:

১. মুসলমানদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ সম্পাদন করা হবে। -আন-নূর: ৩২
২. অবিবাহিতদের বিবাহ শারীরিক, মানসিক পরিপক্বতা ও অভিভাবকের সম্মতির ওপর নির্ভর করে হবে। -সহীহ বুখারী: ৫০৬৬
৩. মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্বতা বয়স পুরুষে ১৫ বছর ও নারীর ১৩ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। -ইজমা
৪. অবিবাহিত পুরুষ-নারীর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গণবিবাহের আয়োজন করা হবে। -সীরাত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ
৫. মুসলমান পুরুষ দেনমোহরের বিনিময়ে বিবাহ করবে। -আন-নিসা: ৪
৬. মুসলিম বঙ্গে কোন মানুষ রক্তের সম্পর্কিত ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারবে না। -আন-নিসা: ২৩
৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা হলে সালিশ নিযুক্ত করা হবে। -আন-নিসা: ৩৫
৮. সালিশে আল্লাহর নির্ধারিত কসমের আইন প্রচলিত থাকবে। -আন-নূর: ৬-৯
৯. স্বামী তার স্ত্রীকে অপরাধের কারণে প্রহার করতে পারবে নির্ধারিত আইন অনুসারে। -আন-নিসা: ৩৪
১০. পুরুষদের চারটি পর্যন্ত বিবাহ প্রথাকে স্বাভাবিক করা হবে। -আন-নিসা: ৩
১১. মুসলমান নারীরা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করবে। -সুনানে আবু দাউদ: ২০৮৫
১২. অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বাতিল হবে। -তিরমিজি: ১১০২
১৩. বাতিল বিবাহসমূহ যিনার আইনে বিচারযোগ্য অপরাধ। -আন-নূর: ২
১৪. পুরুষের সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত দেনমোহর চাওয়া যাবে না। -সুনানে তিরমিজি: ১১১৪
১৫. মুসলমানদের সকল বিবাহ-আকদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। -সুনানে তিরমিজি: ১০৮৯
১৬. মুসলিমদের বিবাহ অনুষ্ঠানে কোন প্রকার কাফেরদের সংস্কৃতিমূলক কাজ করা যাবে না। -সুনানে আবু দাউদ: ৪০৩১
১৭. বিবাহের পর সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষকে খাওয়ানো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। -সহীহ বুখারী: ২০৪৯
১৮. পুরুষকে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে ৪ মাসের বেশি দূরে রাখা যাবে না। -তারীখে তাবারী
১৯. নারী ডিভোর্স বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় ইদ্দত পালন করে বিবাহ করবে। -আল-বাকারা: ২৩৫
২০. মুসলমান নারী কাফের পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। -আল-বাকারা: ২২১; আল-মায়েদাহ: ৫
২১. মুসলমানদের জন্য হারাম, দুই বোনকে একত্রে স্ত্রী হিসেবে রাখা। -আন-নিসা: ২৩

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং ধর্ষণের হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো বিবাহের উচ্চ ব্যয় এবং দেরিতে বিবাহ করা। মুসলমানদের শারীরিক পরিপক্বতায় বিবাহ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গণবিবাহের ফলে ২০-২৫ বছর বয়সের আগেই অধিকাংশ যুবক-যুবতীর বিবাহ হবে। দ্রুত বিবাহের ফলে সমাজে সিজার, যিনা ও অবৈধ সম্পর্কের হার ৮০-৯০% কমে যাবে। এতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রয়োজনীয়তাও কমে আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর মেয়ের বিবাহের সময় গড়ে ৩-১০ লক্ষ টাকা ডেকোরেশন, গিফট ও অনুষ্ঠানের পেছনে ব্যয় হয়। মসজিদ কেন্দ্রিক বিবাহ হলে এবং কাফেরদের সংস্কৃতি বর্জন করলে বিবাহের খরচ ৮০% কম হবে। বাংলাদেশে বছরে যদি ১০ লক্ষ বিবাহ হয় এবং প্রতিটি বিবাহে গড়ে ২ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়, তবে জাতীয়ভাবে বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা অপচয় থেকে মানুষ বাঁচবে। আর্থিক অপচয় কম হলে সামর্থ্যবান পুরুষ একাধিক বিবাহ করলে বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা এবং অধিক বয়সী অবিবাহিত নারীদের সংখ্যা গাণিতিক হারে কমবে। ফলে সমাজে অভিভাবকহীন নারীর সংখ্যা কমে আসবে এবং সামাজিক সুরক্ষা বাড়বে। পুরুষকেন্দ্রিক অভিভাবক থাকলে রাষ্ট্রীয় বিধবা ভাতা ও দুস্থ ভাতার ওপর ৫০% চাপ কমবে। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটির বেশি প্রবাসী রয়েছেন যারা বছরের পর বছর পরিবারের বাইরে থাকেন। এর ফলে পরকীয়া ও পারিবারিক ভাঙন বাড়ছে। পুরুষকে ৪ মাসের বেশি স্ত্রী থেকে দূরে রাখা যাবে না—এই আইন কার্যকর হলে প্রবাসীদের দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদ বন্ধ হবে। ফলে রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের পারিবারিক স্থায়িত্ব বাড়বে এবং সন্তানদের ওপর এর ইতিবাচক মানসিক প্রভাব পড়বে।

আল-আহল (পরিবার): বিবাহের মধ্য দিয়ে যে পবিত্র সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিবার বলে। একটি শিশু জন্মের পর পরিবার থেকে ভালো-মন্দ এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়। মুসলমানদের সন্তানরা যাতে আল-কোরআনের আলোকে সঠিক ইসলামের চর্চা পরিবার থেকে করতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের পরিবার গঠন:

১. পিতা-মাতা সন্তানকে প্রহার করতে পারবে, পিতা-মাতার বিপক্ষে কোন অন্যায় অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না, কারণ তারা সন্তানের জন্য অসীম কষ্ট করে। -লোকমান: ১৪
২. পরিবার শুধু শাসনের ওপর চলে না বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা এবং মায়া-মমতা থাকা অপরিহার্য। -আর-রূম: ২১
৩. নারীরা তাদের মাহরাম পুরুষ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নিজের সাজসজ্জা ও রূপ প্রকাশ করবে না। -আন-নূর: ৩১
৪. মুসলমানের জাতীয় পোশাক পাঞ্জাবি-পায়জামা ও পাগড়িকে নির্ধারণ করা হয়েছে। -আল-আরাফ: ২৬
৫. সকল নারী পর্দার বিধান মেনে চলবে এবং কোন প্রকার অশ্লীল পোশাক পরিধান করবে না। -আল-আহযাব: ৫৯
৬. নারীদের ঢিলেঢালা পোশাক হিসেবে গোল জামাকে সুন্নতি পোশাক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। -সহীহ মুসলিম: ২১২৮
৭. পর্দার মর্যাদা রক্ষার্থে নারীরা উচ্চস্বরে কথা বলবে না। -আল-আহযাব: ৩২
৮. পুরুষরা নারীদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলবে। -আল-আহযাব: ৫৩
৯. মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীরা বাইরে বের হবে না। অতি জরুরি প্রয়োজনে আইন শিথিলযোগ্য হবে। -সহীহ বুখারী: ১৮৬২
১০. অন্যের গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুমতি নিতে হবে। -আন-নূর: ২৭-২৮
১১. তিন সময় শয়নকক্ষে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। -আন-নূর: ৫৮
১২. পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুরুষের অভিভাবকত্বে পরিবার গঠন হবে। -আন-নিসা: ৩৪
১৩. মুসলমান পরিবারের দস্তরখানায় খাবার খাওয়ার সুন্নাহ চালু থাকবে। -সহীহ বুখারী: ৫৪১৫
১৪. মুসলমানের মুখে দাড়ি গজালে তা সুন্নাহ হিসেবে থাকবে। -সহীহ বুখারী: ৫৮৯২
১৫. পারিবারিক শিক্ষার জন্য সূরা লোকমানের চর্চা থাকবে। -সূরা লোকমান
১৬. পুরুষরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে। -আন-নিসা: ১৯
১৭. পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা হবে মেহমান এলে খুশি হতে হয়। -সহীহ বুখারী: ৬০১৮
১৮. প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। -সহীহ মুসলিম: ২৬২৫
১৯. পরিবারে ছোটখাটো ভুল ও দোষ গোপন রাখার চর্চা থাকবে। -সহীহ বুখারী: ২৪৪২
২০. পারিবারিকভাবে হালাল-হারাম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। -আল-বাকারা: ১৬৮
২১. স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। -আল-ইমরান: ১৩৪

বাস্তবিক প্রভাব: পুরুষের অভিভাবকত্ব এবং নারীর গৃহকেন্দ্রিক অবস্থানের ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভূমিকা স্পষ্ট থাকবে। বর্তমানের খ্রিষ্টানদের আধুনিক সমাজে পরিবার ভাঙার হার ৩০-৪০% প্রায়। পরিবারে নবীর সুন্নাহসমূহ চর্চার ফলে পারিবারিক বন্ধন ১০০% শক্তিশালী হবে। তখন বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি শেষ হয়ে যাবে। কারণ পিতা-মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ না করার আইন এবং সুন্নতি শিক্ষার ফলে সন্তানরা ঘরেই তাদের সেবা করবে। এতে রাষ্ট্রের সামাজিক সুরক্ষা খাতের শত শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীর বাইরে যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করলে পুরুষ-নারীর অবাধ মেলামেশা বন্ধ হবে এবং ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মতো অপরাধগুলো শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। জাতীয় পোশাক হিসেবে পাঞ্জাবি-পায়জামা, পাগড়ি এবং নারীদের গোল জামা নির্ধারণ করার ফলে দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পে আমূল পরিবর্তন আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি সংস্কৃতি ও ফ্যাশন আমদানিতে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। যখন নির্দিষ্ট সুন্নতি পোশাকের চাহিদা তৈরি হবে তখন দেশীয় সুতি ও খাদি কাপড় শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এতে স্থানীয় তাঁতি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় ৩০০% বৃদ্ধি পাবে।

আল-আখলাক (মূল্যবোধ): আল-কোরআন অনুসারে ভালো-মন্দ এবং সঠিক-ভুল সম্পর্কে সঠিক ধারণাকেই ইসলামিক মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে ভালোকে মন্দ বা মন্দকে ভালো করা যায়। মুসলমান জাতির আখলাকে পরিবর্তন করার জন্য ইহুদী-খ্রিষ্টানরা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ব্যবহার করেছে। যার ফলে মুসলমান জাতি আজ ইসলাম থেকে অনেক দূরে অথচ মুসলমানরা এক আল্লাহর ইবাদতকারী।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের মূল্যবোধ:

১. সকল মুসলমানকে আল-কোরআনের আলোকে সঠিক-ভুল বোঝানো হবে। -আল-বাকারা: ১৮৫
২. মুসলমানদেরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়ার অভ্যাস করানো হবে। -আন-নূর: ৬১
৩. আল্লাহর স্মরণে মুসলমানরা তসবিহ ব্যবহার করবে। -আর-রাদ: ২৮; আল-আহযাব: ৪১
৪. বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাবার খাওয়া ও ডান হাতে খাবার দেওয়ার চর্চা থাকবে। -সহীহ বুখারী: ৫৩৭৬
৫. মুসলমানরা সকালে ও দুপুরে বেশি খাবে এবং রাতে কম খাবে। -সুনানে তিরমিযী: ২৩৮০
৬. মুসলমান পুরুষ টাকনুর উপরে ও হাঁটু নিচে পর্যন্ত কাপড় পরিধান করবে। -সহীহ মুসলিম: ২০৮৭
৭. মুসলমানদেরকে আমানত সম্পর্কে সচেতন করা হবে। -আন-নিসা: ৫৮
৮. মুসলমানরা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করবে। -আল-ফুরকান: ৬৩
৯. মুসলমানদেরকে গীবত ও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা থেকে দূরে রাখা হবে। -আল-হুজুরাত: ১২
১০. আল্লাহকে ভালোবাসে এমন মুসলমানরা অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদের খাবার খাওয়াবে। -আল-ইনসান: ৮
১১. মুসলমানরা একে অন্যকে ভালোবাসবে আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। -আত-তাওবাহ: ৭৩
১২. মুনাফিকদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে মুসলমানরা তার জানাজা পড়বে না। -আত-তাওবাহ: ৮৪
১৩. মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রচলন থাকবে। -আল-আনফাল: ৬৫
১৪. মুসলমানদের মধ্যে গায়রে মাহরাম পুরুষ-নারী একসাথে আড্ডা দেওয়া নিষিদ্ধ থাকবে। -সহীহ বুখারী: ৫২৩৩
১৫. মুসলমানদের মধ্যে প্রেম, যিনা, সমকামিতা ও পরকীয়া নিষিদ্ধ থাকবে। -বনী ইসরাঈল: ৩২; আল-আরাফ: ৮০-৮১
১৬. মুসলিম বঙ্গে সকল মদের দোকান, জুয়ার আসর ও পতিতালয় বন্ধ হবে। -আল-মায়িদা: ৯০
১৭. মুসলমানরা তাদের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকবে। -আন-নিসা: ৩৬
১৮. মুসলমানরা জীবনের প্রতিটি ব্যস্ততার মাঝেও সময়মতো সালাত আদায় নিশ্চিত করবে। -আন-নিসা: ১০৩
১৯. মুসলমানরা কোন লেনদেনে বা ব্যবসায় মাপে কম দেবে না এবং সততা বজায় রাখবে। -আল-মুতাফফিফিন: ১-৩
২০. যেকোন বিপদ-আপদে মুসলমানরা ধৈর্য ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা রাখবে। -আল-বাকারা: ১৫৩
২১. মুসলমানরা সর্বদা শারীরিক পবিত্রতা ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে। -আল-বাকারা: ২২২
২২. মুসলমানরা সকল প্রকার শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার থেকে দূরে থেকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। -লুকমান: ১৩
২৩. মুসলমানদের মধ্যে লেনদেন লিখে রাখার প্রচলন থাকবে। -আল-বাকারা: ২৮২
২৪. মুসলমানরা তাদের দেওয়া ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করবে। -বনী ইসরাঈল: ৩৪
২৫. মুসলমানরা জমিনে দম্ভভরে বা অহংকারের সাথে চলাফেরা করা থেকে বিরত থাকবে। -লুকমান: ১৮
২৬. মুসলমানরা খাদ্য ও জীবিকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র উপার্জনের নীতি অনুসরণ করবে। -আল-বাকারা: ১৬৮
২৭. মুসলমানরা তাদের প্রতিটি দায়িত্ব বা কাজ নিখুঁত ও নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করবে। -আল-মুলক: ২

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেনে অস্বচ্ছতা ও মিথ্যার কারণে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ হয়। দেশে সততা ও সঠিক মাপ নিশ্চিত হলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ২৫-৩০% বৃদ্ধি পাবে। লেনদেন লিখিত থাকায় ব্যবসায়িক বিরোধ মামলা ৯০% কমে যাবে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৭০% অপরাধের মূলে থাকে মাদক, জুয়া এবং যিনা। আল্লাহর আইন কার্যকর হলে দেশে ফৌজদারি অপরাধ অন্তত ৭৫% হ্রাস পাবে। ফলে পুলিশ ও কারাগার রক্ষণাবেক্ষণে রাষ্ট্রের বার্ষিক ৫,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। জনগণের অর্থ সাশ্রয়ের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে, রাতে কম খাওয়া এবং নিয়মিত শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখলে জীবনঘাতী রোগ ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, চর্মরোগ হওয়ার ঝুঁকি ৪০-৫০% কম হবে। এর ফলে জনগণের ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বাজেটে বছরে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। জনগণের পকেটে অর্থ থাকলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভিক্ষুকমুক্ত দেশ গড়ার জন্য আলাদা প্রকল্পের প্রয়োজন হবে না। মূল্যবোধ একটি জাতির সফটওয়্যার পরিবর্তনের মতো। যখন মানুষের চিন্তাধারা ও আচরণ কোরআনিক নীতিতে চলবে, তখন অন্য ব্যবস্থাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সফল হবে।

ইলাজ (চিকিৎসা): মানুষের অসুস্থতার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সুস্থতা অর্জনের জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাকে চিকিৎসা বলে। অসুস্থতা নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর, আর স্বাস্থ্য নির্ভর করে খাদ্যের উপর। খাদ্যে ভেজাল থাকার কারণে বর্তমান সময়ে মানুষ বেশি অসুস্থ হয়। মানুষ বেশি অসুস্থ হওয়ার কারণে তাকে বারবার হাসপাতালে যেতে হয়।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের চিকিৎসা ব্যবস্থা:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে অসুস্থতা একটি পরীক্ষা, তাই মুসলমানদের অসুস্থতার সময় ধৈর্য ধারণ শেখানো হবে। —আল-বাকারাহ: ১৫৫-১৫৬
২. মুসলমানদের মধ্যে ধৈর্যশীল চিকিৎসার জনক ছিলেন ইবনে সিনা। —আল-কানুন ফিত-তিব্ব
৩. ইবনে সিনার লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসার দর্শন হোমিওপ্যাথির মূলনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। —আল-কানুন ফিত-তিব্ব
৪. মুসলমানদের মধ্যে কেমিক্যাল চিকিৎসা কমিয়ে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা বৃদ্ধি করা হবে। —কিয়াস
৫. সরকার কর্তৃক চিকিৎসার সকল সুযোগ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবা জনসাধারণের জন্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত থাকবে। —সহিহ বুখারি: ৭১৩৮
৬. সকল হাসপাতালে রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষার মূল্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। —সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৭৭
৭. ওষুধ কোম্পানিদের জন্য রোগীর স্বাস্থ্য নির্দেশনা বা প্রেসক্রিপশন দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। —কিয়াস
৮. ওষুধ কোম্পানিরা চিকিৎসকদের সাথে কোন প্রকার ব্যবসায়িক চুক্তি করতে পারবে না। —কিয়াস
৯. মানুষের সুস্থতার জন্য প্রতি বছর ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের মান ও কার্যকারিতা যাচাই করা হবে। —কিয়াস
১০. হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হবে। —কিয়াস
১১. নারীদের সিজার করা বন্ধ হবে। ডাক্তার সিজার করতে চাইলে যথাযথ কারণ রাষ্ট্রের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। -কিতাবুল ফিতান
১২. সিজার-বিহীন সন্তান জন্মদানের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। —আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৫/৩২৬
১৩. নারীদের উপর পরীক্ষামূলক সকল প্রকার ভ্যাকসিন-টিকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। —আল-বাকারাহ: ৪৯
১৪. শিশুদের উপর পরীক্ষামূলক সকল প্রকার ভ্যাকসিন-টিকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে। —কিয়াস
১৫. শারীরিক অলসতা ও চর্বি রোধে খাদ্য তালিকা থেকে ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার কমিয়ে আনা হবে। —সহিহ বুখারি: ২৮৯৩
১৬. খাদ্যে ভেজাল দূর করতে ফরমালিন ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা হবে। —সুনানে তিরমিজি: ২৩৮০
১৭. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় প্যাকেটজাত খাবার উৎপাদন ও ব্যবহার কমানো হবে। —মুসনাদে আহমাদ: ১২৯০২
১৮. দেশীয় ছোট মাছ রক্ষায় পুকুর ও জলাশয়ে ক্ষতিকর সাবান ও রাসায়নিক ব্যবহার কমানো হবে। —সুনানে আবু দাউদ: ২৬
১৯. অকেজো, নিম্নমান ও ক্ষতিকর ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। —সহিহ মুসলিম: ১০২
২০. অসুস্থতা নিরাময়ে কেবল ঔষধ নয়, বরং আল-কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। —বনী ইসরাঈল: ৮২
২১. চর্বি ও বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধে ক্ষুধার এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য গ্রহণের সুন্নাহর প্রচার করা হবে। —সুনানে তিরমিজি: ২৩৮০
২২. শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মায়ের দুধ পান করানোর বিষয়ে প্রচারণা চালানো হবে। —সূরা আল-বাকারাহ: ২৩৩
২৩. মহামারি রোগ ছড়িয়ে পড়লে আক্রান্ত এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ এবং দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।সহিহ বুখারি: ৫৭২৮
২৪. রোগের উৎস নির্মূল করতে রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতাকে জাতীয় কর্মে রূপ দেওয়া হবে।সহিহ মুসলিম: ২২৩

বাস্তবিক প্রভাব: বাংলাদেশে ওষুধ বাজারের একটি বিশাল অংশ প্রায় ২০-৩০% খরচ হয় চিকিৎসকদের উপহার এবং কমিশন খাতে। ওষুধ কোম্পানির সাথে চিকিৎসকদের ব্যবসায়িক চুক্তি বন্ধ হলে ওষুধের দাম সরাসরি ৩০% কমে যাবে। দেশে অপ্রয়োজনীয় টেস্ট এবং ডায়াগনস্টিক কমিশনের সিন্ডিকেট বন্ধ হলে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে বছরে অন্তত ১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে সিজারের হার প্রায় ৪৫-৫০%। সিজার বন্ধের কঠোর নীতিমালা এবং স্বাভাবিক প্রসবের বিশেষ প্রশিক্ষণের ফলে সিজারিয়ান হার ৮০% কমে যাবে। এর ফলে সাধারণ পরিবারগুলোর সিজার বাবদ খরচ হওয়া প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে এবং দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক জটিলতা কমবে। আমাদের খাদ্যে ভেজাল কমলে এবং ক্ষুধার এক-তৃতীয়াংশ খাবার গ্রহণ করলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং গ্যাস্ট্রিকের রোগীর সংখ্যা ৫ বছরে ৫০% কমে যাবে। রোগী কমলে হাসপাতালের ওপর রোগীর চাপ অর্ধেকে নেমে আসবে, তখন হাসপাতালসমূহ উন্নত মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করতে পারবে। আমাদের নারী ও শিশুদের ওপর পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন বন্ধ করলে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং পুকুরে-নদীতে রাসায়নিক ব্যবহার কমলে এবং প্যাকেটজাত খাবার কমলে পরিবেশ দূষণ কমবে। ফলে দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন ৩০০% বৃদ্ধি পাবে, যা জনগণের প্রোটিনের চাহিদা মেটাবে এবং চর্মরোগের প্রকোপ কমাবে।

আ-দা-ব (সংস্কৃতি): মানুষের জীবনের অবসর সময়ের ব্যবহারকে সংস্কৃতি বলে। সংস্কৃতি ঠিক করে জাতি কর্মব্যস্ত সময় শেষ করার পরে কীভাবে অবসর সময় ব্যয় করবে। মুসলমানরা সংস্কৃতি থেকে আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণ করে। যেমন- ইসলামিক সংস্কৃতিতে মাদক খাওয়া হারাম, অন্যদিকে লালনগীতিতে মাদক খাওয়া এক ধরনের সংস্কৃতি।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের সংস্কৃতি:

১. মুসলমানদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা একে অপরকে সালাম করে এবং দুই হাতে মুসাফাহা করে। -আন-নিসা: ৮৬
২. মুসলমানরা কারো সাথে রুক্ষভাবে কথা বলে না এবং সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলে। -বনী ইসরাঈল: ৫৩
৩. মুসলমানদের চলন হয় অত্যন্ত মার্জিত; তারা অকারণে তর্কে জড়ায় না। -আল-ফুরকান: ৬৩
৪. মুসলমানরা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। -আল-মুমিনুন: ৩
৫. মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলে না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। -আল-ফুরকান: ৭২
৬. মুসলমানরা রাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হয়। -আল-ইমরান: ১৩৪
৭. মুসলমানরা খরচ করার ক্ষেত্রে কৃপণতাও করে না, আবার অপব্যয়ও করে না। -আল-ফুরকান: ৬৭
৮. মুসলমানরা পানাহার করে, কিন্তু অপচয় করে না। -আল-আরাফ: ৩১
৯. মুসলমানরা মাদক ও তামাকজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার করে না। -আল-বাকারাহ: ১৯৫
১০. মুসলমানদের জন্য নাচ, গান, সিনেমা এবং নাটক সম্পূর্ণ হারাম। -সহীহ বুখারী: ৫৫৯০
১১. মুসলমানদের গণমাধ্যমে এবং বিজ্ঞাপনে নারীর ছবি থাকা হারাম। -আল-আহযাব: ৩৩
১২. মুসলমানরা শালীনতা বজায় রাখতে গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পোশাক গোপনে বিক্রয় করে। -সহীহ বুখারী: ৯
১৩. মুসলমানরা ঈমানকে মজবুত করতে সপ্তাহে অন্তত এক রাত শবগুজারি করে। -আল-মুযযাম্মিল: ৬
১৪. মুসলমানদের মধ্যে সামর্থ্যবানরা হজ্জ ও ওমরাহ পালন করে। -আল-ইমরান: ৯৭
১৫. যারা অসামর্থ্যবান তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য অনুদান প্রদান করে। -খলিফা উমর (রা.)
১৬. মুসলমানরা জুমাবারকে সম্মেলনের দিন এবং সপ্তাহের প্রধান দিন হিসেবে নির্ধারণ করে। -আল-জুমা: ৯
১৭. মুসলমানদের জুমার প্রস্তুতির জন্য বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস এবং জুমাবার পূর্ণ দিবস সরকারি ছুটি থাকে। -কিয়াস
১৮. মুসলমানরা দৈনিক কার্যক্রম ফজরের পর শুরু করে এবং আসরের আজানের পূর্বে সমাপ্ত করে। -সুনানে তিরমিজি: ১২১২
১৯. মুসলমানরা বর্ষপঞ্জি হিসেবে হিজরি সনকে প্রাধান্য দেয় এবং চন্দ্রপঞ্জি অনুসারে রোজা ও হজ্জ পালন করে। -আল-বাকারাহ: ১৮৯
২০. মুসলমানরা বিনোদন হিসেবে সুন্নাহর চর্চা করে এবং ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস প্রচার করে। -সুনানে আবু দাউদ: ৪০৭৮
২১. মুসলমানরা আল-কোরআন প্রতিযোগিতা এবং সুন্নাহসম্মত শারীরিক খেলাধুলা করে। -সহীহ বুখারী: ৭৫২৯
২২. মুসলমানরা সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার এবং আল্লাহর আইনের প্রচারণা করে। -আল-ইমরান: ১১০
২৩. মুসলমানরা শত্রুদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে কাফের শব্দ ব্যবহার করে। -আল-কাফিরুন: ১-২

বাস্তবিক প্রভাব: বাংলাদেশে অফিস সময় সাধারণত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা, যা পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনের সাথে সাংঘর্ষিক। ফজরের পর কাজ শুরু করলে এবং আসরের আগে শেষ করলে দিনের আলো সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে। মানুষ ভোরে কাজ শুরু করলে তার কর্মদক্ষতা ২৫% বৃদ্ধি পায়। অফিস-আদালত আসরের সময় শেষ হলে এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমালে বাসাবাড়ি ও কর্মস্থলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় হবে ১৫-২০%। দেশ থেকে নাচ, গান, সিনেমা এবং মাদক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলে বিনোদনের ধরন বদলে যাবে। তখন মাদকাসক্তি এবং পর্নোগ্রাফি আসক্তির যুবসমাজের বড় অংশ মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ হবে। দেশে আল্লাহর আইন কার্যকর হলে কিশোর অপরাধ এবং চারিত্রিক স্খলন ৮০-৯০% কমে যাবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিনোদন খাতে ব্যয় হওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা হজ্জ, ওমরাহ এবং সুন্নাহসম্মত শারীরিক খেলাধুলায় ব্যয় করলে একটি সুস্থ জাতি গঠন হবে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১.২৭ লক্ষ মানুষ হজ্জে যান। রাষ্ট্রীয় অনুদান এবং মসজিদভিত্তিক অর্থায়নে এই সংখ্যা ৩০০% বৃদ্ধি পাবে। মানুষ হজ্জ করলে জনগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা এবং আমিরের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করবে, যা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার অর্ধদিবস এবং জুমাবার পূর্ণ ছুটি থাকলে জুমার নামাজের প্রস্তুতি ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। বর্তমানের শুক্র-শনিবার ছুটির তুলনায় জুমার দিনের গুরুত্ব অনেক বাড়বে। এই গুরুত্ব স্থানীয় শুরার সাথে জনগণের যোগাযোগ ১০০% বৃদ্ধি করবে। সমাজের প্রচারমাধ্যমে নারীর ছবি নিষিদ্ধ হলে নারীজাতি বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা পাবে। বর্তমানে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলো নারীত্বের অবমাননা করে পণ্য বিক্রয় করে। আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন হলে নারীর মর্যাদা সামাজিকভাবে ২০০% বৃদ্ধি পাবে।

ইন্তি-সাল (যোগাযোগ): যেকোন ব্যক্তি বা বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়াকে যোগাযোগ বলে। নির্দিষ্ট স্থানে আসা ও যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ঠিকানা বা স্থানের নামের। বর্তমানে স্থানসমূহের অর্থবিহীন নাম বা বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বেশি ব্যবহার করা হয়।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের যোগাযোগ ব্যবস্থা:

১. আল্লাহ মানুষের জন্য পৃথিবীকে শয্যা বানিয়েছেন এবং চলার জন্য পথ দিয়েছেন। -ত্বহা: ৫৩
২. আল্লাহ মানুষের জন্যে সৃষ্টি করেছেন নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু যাতে আমরা আরোহণ করি। -আয-যুখরুফ: ১২-১৩
৩. যানবাহনে আরোহণ পবিত্রতার স্বার্থে মুসলমানরা মাহরাম ব্যতীত পুরুষ-নারী একসাথে বসে না। -সহিহ বুখারি: ৫০৯৬
৪. মুসলমানদের পর্দা ও নিরাপত্তার স্বার্থে নারীদের যানবাহন চালানো বন্ধ থাকবে। -আল-আহযাব: ৩৩
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় এবং ব্যক্তিগত যানবাহনের চাপ কমাতে বাহন নীতিমালা থাকবে। -বনী ইসরাঈল: ২৭
৬. যানজটমুক্ত চলাচলের জন্য মূল সড়কের পাশে বাজার থাকবে না। -সহিহ বুখারি: ২৪৬৫
৭. সড়ক দুর্ঘটনা রোধে চালকদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুম নিশ্চিত করতে মুসাফিরখানা থাকবে। -আল-বাকারা: ১৯৫
৮. জনদুর্ভোগ ও অপচয় কমাতে বারবার রাস্তা খনন বন্ধ করে সকল সেবার কাজ একসাথে শেষ হবে। -সহিহ মুসলিম: ৩৫
৯. মুসলিম বঙ্গের পণ্য পরিবহনে খরচ কমাতে নদীপথের সংস্কার ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। -আন-নাহল: ১৪
১০. পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়তে দিনের আলো, নদীপথ ও বৃষ্টির পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। -ক্বাফ: ৯
১১. প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরাগায়ন রক্ষায় ইন্টারনেটের ক্ষতিকর তড়িৎ প্রবাহ কমিয়ে আনা হবে। -আর-রূম: ৪১
১২. ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধে সকল প্রকার নির্লজ্জ ও অনৈসলামিক সংস্কৃতি প্রচার বন্ধ থাকবে। -বনী ইসরাঈল: ৩৬
১৩. মুসলমানদের সকল স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামসমূহ আল-কোরআন কেন্দ্রিক অর্থবহ নামকরণ হবে। -আল-হুজুরাত: ১১
১৪. বরকতের উদ্দেশ্যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথে মাশাআল্লাহ লেখা থাকবে। -কাহাফ: ৩৯
১৫. বরকতের উদ্দেশ্যে সকল যানবাহনে কালিমা লেখা থাকবে। -আল-আহযাব: ৪১
১৬. সুন্নাহর অনুসরণে সকল প্রকার যানবাহন এবং সড়কসমূহকে ডানমুখী করা হবে। -সহিহ মুসলিম: ২৬৮
১৭. মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝার জন্য সকল সরকারি কর্মকর্তা গণপরিবহন ব্যবহার করবে। -তিরমিজি: ১৩৩২
১৮. শুধু মুসলিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করবে। -আনফাল: ৬০

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি কেনা এবং রক্ষণাবেক্ষণে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। মসজিদভিত্তিক প্রশাসন চালু হলে পরিবহন খাত থেকে বছরে প্রায় ১০-১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। যখন ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমবে তখন জ্বালানি তেলের আমদানি খরচ ৩০-৪০% কমে আসবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ঢাকা শহরে যানজটের কারণে প্রতিদিন প্রায় ৩২ লক্ষ কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। মূল সড়কের পাশে বাজার নিষিদ্ধ করলে এবং সেবামূলক খননকাজ একবারেই শেষ করার আইন চালু করলে প্রতি বছর ৪০ হাজার কোটি টাকা রাষ্ট্রে লাভ হবে। সড়কপথের তুলনায় নদীপথে ও রেলপথে পণ্য পরিবহন করলে খরচ প্রায় ৬০-৭০% কমে আসবে। নদীপথের সংস্কার ও ব্যবহারের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাজারে ১০-১৫% কম হবে। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ চালকের ক্লান্তি ও ঘুম। ইসলামিক নিয়মে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত হলে সড়ক দুর্ঘটনা ৭০% কমে যাবে। সড়ক দুর্ঘটনা কমলে পঙ্গুত্ব ও অকাল মৃত্যুজনিত সমস্যা কমবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি ৫ হাজার কোটি টাকা কম হবে। মোবাইলের অনিয়ন্ত্রিত টাওয়ার রেডিয়েশন মৌমাছি ও অন্যান্য পতঙ্গের পরাগায়ন ব্যাহত করে, যা কৃষি ফলন কমিয়ে দেয়। রেডিয়েশন নিয়ন্ত্রণ করলে কৃষিজ উৎপাদন ১০-১৫% বৃদ্ধি পাবে। বরকতের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে মাশাআল্লাহ, যানবাহনে কালিমা লেখা এবং স্থানসমূহের ইসলামিক নামকরণ করলে নাগরিকদের মধ্যে সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতির কথা স্মরণ থাকবে। যার ফলে চালক ও পথচারীদের মধ্যে জেদ ও প্রতিহিংসার বদলে ধৈর্য ও সহমর্মিতা কাজ করবে। নামের পরিবর্তনের কারণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে মানুষের মধ্যে ট্রাফিক আইন মানার প্রবণতা ৪০% বৃদ্ধি পাবে।

নিযামুল কিতাবাহ (লিখন পদ্ধতি): মুখের ভাষাকে চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে লেখা বলে। আল-কোরআনের লিখন পদ্ধতি ডান দিক থেকে শুরু হয়, তাই ইসলামিক সরকার বই লেখার ক্ষেত্রে ডানমুখী বর্ণমালার ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। হিন্দুদের ব্রাহ্মীলিপির প্রভাবমুক্ত হয়ে আরবি বর্ণকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে জনগণকে আল-কোরআন ও সুন্নাহর ভাষার সাথে সম্পৃক্ত করাই মুসলিম বঙ্গের মূল লক্ষ্য।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের লিখন পদ্ধতি:

১. আল-কোরআন বরকতময় কিতাব, মুসলমানরা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে। -ছোয়াদ: ২৯
২. মুসলমানরা আল-কোরআনের উত্তম অনুসরণ করে। -আয-যুমার: ৫৫
৩. আল-কোরআনের উত্তম অনুসরণের জন্য মুসলমানদের বাংলা লিখন পদ্ধতি বামের পরিবর্তে ডানমুখী হবে। -সহিহ বুখারি: ১৬৮
৪. বাংলা ভাষাকে ডানমুখী করার জন্য আল-কোরআনের আরবি হরফ ব্যবহার করা হবে। -আল-ওয়াকিয়া: ৮
৫. বাংলা ভাষা থেকে বাক্য গঠনের অস্পষ্টতা দূর করতে সর্বনামের ব্যবহার কমানো হবে। -আন-নিসা: ৪৬
৬. বাংলা ভাষায় প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের পরিবর্তে আল-কোরআনের শব্দ ব্যবহার হবে। -আল-বাকারা: ১০৪
৭. মুসলিম বঙ্গের দাপ্তরিক ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রাধান্য কমিয়ে আল-কোরআনের ভাষাকে ব্যবহার করা হবে। -ইউসুফ: ২
৮. মুসলিম বঙ্গের রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সকল গ্রন্থ এবং নথিপত্র ডান দিক থেকে লেখা হবে। -সহিহ বুখারি: ১৬৮
৯. মুসলমানদের আদর্শিক সুরক্ষায় কী ধরনের বই সংরক্ষিত হবে, তা রাষ্ট্র কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করা হবে। -মুসনাদে আহমাদ: ১৪৮৫০
১০. বর্তমান পাঠ্যপুস্তক থেকে সকল কাফের লেখকের রচনা ও দর্শন সম্পূর্ণ অপসারণ করা হবে। -আল-মায়িদাহ: ৪৮
১১. কাফের লেখকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইসমূহ যাচাই-বাছাই করে মুসলমান লেখক দ্বারা সংশোধন করা হবে। -আল-হুজুরাত: ৬
১২. মুসলিম বঙ্গে দৈনন্দিন কার্যক্রমে ব্যবহৃত ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের পরিবর্তে ইসলামিক শব্দ ব্যবহার হবে। যেমন- থ্যাঙ্কস-এর পরিবর্তে জাযাকাল্লাহ, সরি-র পরিবর্তে আস্তাগফিরুল্লাহ, মিটিং-এর পরিবর্তে মুজাকারা, সভাপতির পরিবর্তে আমির, কমিটির পরিবর্তে শুরা, গুডমর্নিং-এর পরিবর্তে সালাম এবং গুডবাই-এর পরিবর্তে আল্লাহ হাফেজ। -আল-বাকারা: ১৫২
১৩. মুসলমানরা লিখার সময় আগের পুরুষ পরে নারী লেখে, যেমন—পুরুষ-নারী। -আল-আহযাব: ৩৫
১৪. মুসলিম বঙ্গে AI বলার পরিবর্তে AI সফটওয়্যার বা কোড বলার প্রচলন থাকবে। -আল-আহযাব: ৫

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের একটি বড় অংশ আল-কোরআন পড়তে জানলেও তার অর্থ বোঝে না। কারণ লিপির ভিন্নতা, যদি বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখা শুরু হয়, তবে দেশের ১০০% মানুষ যারা বাংলা পড়তে পারে, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরবি হরফ চিনে ফেলবে। এর ফলে আল-কোরআন তিলাওয়াত শেখার সময় অন্তত ৭০-৮০% কম লাগবে। এই শিক্ষার জন্য জনগণ কোন আলাদা পরিশ্রম ছাড়াই কোরআনের ভাষার সাথে লৈখিকভাবে পরিচিত হবে। দাপ্তরিক কাজে ইংরেজির প্রাধান্য কমলে বিদেশি সংস্কৃতির ওপর মানসিক নির্ভরশীলতা ৯০% কমে যাবে। জাতীয় নথিপত্র ডান দিক থেকে লেখার ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে ভাষাগত সংযোগ দৃঢ় করবে। বর্তমানে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকের একটি বড় অংশ বিদেশি দর্শন ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে লেখা। তাদের লেখা পরিবর্তন করলে প্রকাশনা শিল্পে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হবে। প্রকাশনা শিল্পে প্রায় ৪-৫ কোটি নতুন পাঠ্যবই ছাপানোর প্রয়োজন হবে, যা অভ্যন্তরীণ কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পকে অভাবনীয় গতি দেবে এবং নতুন প্রজন্মের মনোজগৎ থেকে হীনম্মন্যতা দূর হবে। মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তার চিন্তাধারা সেই ভাষার আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইসলামিক পরিভাষা ব্যবহারের ফলে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ৩০০% বৃদ্ধি পাবে। এটি একটি অভিন্ন ইসলামিক পরিচয় তৈরি করবে যা বিভেদ দূর করতে সাহায্য করবে। লেখার ক্ষেত্রে পুরুষের নাম আগে রাখা এটি পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোতে পুরুষের দায়িত্বশীলতাকে লৈখিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং AI-কে সফটওয়্যার বা কোড বললে AI-কে অতিপ্রাকৃত কিছু না ভেবে মানুষের তৈরি কোড মনে হবে যার ফলে প্রযুক্তির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট থাকবে। লেখার ভাষা থেকে সর্বনামের ব্যবহার কমিয়ে বাক্য গঠনের স্পষ্টতা আনলে আইনি নথি এবং বিচারিক রায়ে অস্পষ্টতা দূর হবে। এতে মামলার ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার সুযোগ ৫০% কমে যাবে, যা বিচার বিভাগে দ্রুত রায় প্রদানে সহায়ক হবে। নিজামুল কিতাবাহ কেবল একটি লিখন পদ্ধতি নয়, বরং এটি একটি জাতির মানসিকতা পুনর্গঠনের হাতিয়ার।

আল-আক্বীদাহ (সুস্পষ্ট ধর্মীয় দর্শন): মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আসমানি গ্রন্থের সঠিক অনুসরণ করাকে ধর্ম বলে। মুসলমান জাতি আল্লাহর অনুসরণ এবং রাসূল (সা.)-এর অনুকরণ করে। রাসূল (সা.)-এর সঠিক অনুকরণ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে দলগত মতপার্থক্য দেখা যায়। ইসলামিক সরকারের মূল লক্ষ্য হলো মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করে রাসূল (সা.)-এর দেখানো পথে মুসলমান জাতিকে ফিরিয়ে আনা। ইসলামে মানুষের মনগড়া কোন নিয়ম তৈরির সুযোগ নেই।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মুসলমানদের ধর্মীয় দর্শন:
১. মুসলমানরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না। -আল-ইমরান: ১০৩
২. মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে না। -আল-আনফাল: ৪৬
৩. যারা ইসলামকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। -আনআম: ১৫৯
৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যেভাবে ইসলাম পালন করেছেন মুসলমানরা তা অনুসরণ করে। -সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭
৫. মুসলমানরা আহলুল জিম্মাদের অধিকার ও ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের নীতি ও চুক্তির অনুসরণ করে। -তারিখুর তাবারী: ২/৪৪৯
৬. যারা মন্দের ভালো বলে কাফেরদের সাথে আপস করে মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দেয়। -আন-নিসা: ৯১
৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দেয়। -আল-মায়িদাহ: ৩৩-৩৪
৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের মধ্যে কাফের কাদিয়ানী মতভেদ সৃষ্টি করেছে। -আত-তাওবাহ: ১০৭
৯. মুসলমানরা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এবং তাদের প্রতি কঠোর হয়। -আত-তাওবাহ: ৭৩
১০. মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি দূর করতে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও ফিরকার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। -আল-আনফাল: ৭৩
১১. কাফির ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে ইসলামের যে বিষয়গুলো বিকৃত করা হয়েছে তা সংশোধন হবে। -সুনানে আবু দাউদ: ৪২৯১
১২. সাধারণ মুসলমানদের সংশোধনের জন্য সাত-৭ দিনব্যাপী অজু ও নামাজ প্রশিক্ষণ থাকবে। -সহীহ বুখারী: ৬৩১
১৩. মুসলমানদের আকিদাগত ও ধর্মীয় মতপার্থক্য নিরসন করার জন্য দারুল ইফতা-ফতোয়া বিভাগ থাকবে। -ইজমা
১৪. মৃত ব্যক্তির পূজার সংস্কৃতি দূর করতে মাজার থেকে স্থাপত্যসমূহ অপসারণ করা হবে। -সহীহ মুসলিম: ৯৭০
১৫. মুসলমানদের কবরসমূহ শুধুমাত্র পুরুষরা জিয়ারত করবে এবং নারীদের জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। -সুনানে তিরমিযী: ১০৫৬
১৬. কাফির বিশ্ব যে কাজগুলোকে চরম পন্থা বলে, মুসলমানরা সেগুলোকে উত্তম পন্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। -সহিহ বুখারি: ৫৮৯২
১৭. মুসলমানদের মধ্যে যারা ইবাদতে মুমিন কিন্তু রীতিনীতিতে ইহুদী-খ্রিষ্টানদের অনুসারী তারা চিহ্নিত হবে। -সহিহ বুখারি: ৭৩২০

বাস্তবিক প্রভাব: বর্তমানে বাংলাদেশে শত শত রাজনৈতিক দল এবং ধর্মীয় উপদল বিদ্যমান, যার ফলে প্রায়ই সহিংসতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়। বাংলাদেশে সকল রাজনৈতিক দল ও ফিরকা বিলুপ্ত করলে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সহিংসতা ১০০% কমে যাবে। দল বাদ হওয়ার কারণে নির্বাচনের পেছনে ৫ বছরে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় সাশ্রয় হবে এবং জনগণের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক তৈরি হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে দারুল ইফতার মাধ্যমে সঠিক ফতোয়া প্রচার হলে ধর্মীয় বিভ্রান্তিজনিত অপরাধ ও সামাজিক অস্থিরতা ৯০% কমে যাবে এবং দেশে কাদিয়ানীসহ অন্যান্য কাফের মতবাদ তখন স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সহজ হবে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে আকিদাগত অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে। বাংলাদেশে কয়েক হাজার মাজার রয়েছে যেখানে প্রতি বছর সাধারণ মানুষ কোটি কোটি টাকা নজর-নিয়াজ হিসেবে ব্যয় করে। মানুষের এই অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপচয় ও অনৈসলামিক কাজে ব্যবহার করা হয়। মাজারের এই টাকাগুলো বায়তুল মাল তহবিলে স্থানান্তর হলে স্থানীয় দারিদ্র্য বিমোচন ৪০% দূর করা সম্ভব হবে। দারিদ্র্য দূর হলে সাধারণ মুসলমানদের জন্য ৭ দিনব্যাপী বাধ্যতামূলক অজু ও নামাজ প্রশিক্ষণ নাগরিকদের মধ্যে চারিত্রিক সততা বাড়াবে এবং কর্মস্থলে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ৫০% কমে আসবে। সর্বোপরি মুসলিম বঙ্গ গঠন হলে প্রশাসনিক, বিচারিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। দেশে শূন্য বেকারত্ব, শূন্য ভিক্ষুক এবং সর্বনিম্ন অপরাধ হারের একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ গঠিত হবে। লেখার মাধ্যমে খ্রিষ্টান ও হিন্দুবাদী প্রভাবমুক্ত একটি বিশুদ্ধ বঙ্গআরব লিপি ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটি মসজিদ হবে একটি প্রশাসনিক ও প্রতিরক্ষা কেন্দ্র, যা রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর জন্য দুর্ভেদ্য করে তুলবে।

মুসলিম বঙ্গ কর্তৃক প্রাথমিক নির্দেশনাসমূহ (মদিনা রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার)

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গ যখন পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তখন নিরাপত্তাহীনতা, ব্যবসায়ীক মন্দা, শিক্ষাব্যবস্থার ধস, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় মতবিরোধ থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে মদিনা রাষ্ট্রের ভিত্তিতে প্রাথমিক কিছু নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, আশা করি এই সকল নির্দেশনা মোতাবেক দেশ পরিচালনা করলে, জাতি একসময় আল-কোরআনের আইন অনুসারে পরিচালিত হবে। মুসলিম বঙ্গের প্রাথমিক দিক নির্দেশনা সমূহ।

মুসলমানদের নিরাপত্তা জনিত নির্দেশনা:
১. সকল মুসলমানকে আল্লাহর আইন মেনে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
২. আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে যে মুসলমান খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক সরকারের আইন মানবে তাকে মুরতাদ হিসেবে গণ্য করা হবে।
৩. মুরতাদ ব্যক্তির জান বা মালের ক্ষতি হলে মুসলমানদের ইসলামিক সরকার দায়ী থাকবে না।
৪. সকল মাদ্রাসার মুফতি মুহতামিমকে নিকটস্থ মডেল মসজিদের বিচারক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. প্রত্যেক মসজিদের ইমাম সাহেবকে সমাজে আমিরের (মেম্বার) দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৬. দেশের জরুরি অবস্থায় সকল মাদ্রাসার ছাত্রকে সামরিক বাহিনীর ন্যায় দেশকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৭. দেশের জরুরি অবস্থায় সকল সরকারি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পুলিশের ন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৮. মুসলমানদের মধ্যে গুপ্তহত্যা, গুম ও হত্যা বন্ধের জন্য সকল বিদেশি সংস্থার প্রবেশ ও অবস্থান দেশে নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. মুসলমানদের নিরাপত্তার স্বার্থে নারীর যানবাহন চালানো নিষিদ্ধ করা হলো।
১০. মুসলমানদের শিশু ও নারীদেরকে দুই চাকা বিশিষ্ট যানবাহনে আরোহণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১১. সকল মুসলমান নারী ও শিশুকে প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. গণতান্ত্রিক সরকারের সকল সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশকে কর্মবিরতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৩. সকল ডাক্তার সিজার করার পূর্বে তার যথার্থ কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করে সিজার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৪. জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু ও নারীদেরকে যে টিকা দেওয়া হয় সেই সকল টিকা ল্যাব পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৫. সকল বিবাহ, মাহফিল ও গণসমাবেশ সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠান মাগরিবের পূর্বে শেষ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১৬. গণতান্ত্রিক সরকারের সকল নথি নিকটস্থ মসজিদে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।

মুসলমানদের ব্যবসানীতি (অর্থনীতি) পুনরুদ্ধারমূলক নির্দেশনা:
১. যাদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে, তাঁদেরকে সম্পূর্ণ যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
২. যাকাতের সঠিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সকল যাকাত মসজিদের মুয়াজ্জিনকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৩. সকল ইমামকে দান ও যাকাতের সম্পদ আল-কোরআন অনুসারে ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. বাংলাদেশে দুই প্রকার (ডিজিটাল ও কাগজের) মুদ্রা ব্যবস্থা থাকার কারণে মুসলিম বঙ্গের অর্থনীতিতে সমন্বয় করার জন্য যারা সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অন্যায়ভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অর্থের মালিক হয়েছেন, তাদের সম্পদ সরকারের "হারাম তহবিলে" জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. মুসলমানদের জন্য সকল প্রকার সুদ ব্যবসা নিষিদ্ধ করা হলো।
৬. মুসলমানদেরকে ইসলামিক সরকারের নতুন মুদ্রা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হলো।
৭. প্রয়োজন ব্যতিরেকে বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিটেন্স পাঠানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। অন্যথায়, গণতান্ত্রিক সরকার মুসলমানদের রেমিটেন্স আমেরিকায় পাচার করে দিবে।
৮. বিদেশি সকল কোম্পানিকে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৯. উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সকল চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১০. সকল পণ্য আড়তদারকে ১০-৩০ দিন অন্তর অন্তর মজুদ পণ্য খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১১. গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট সকল প্রকার শস্য বিক্রয় বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. পুরুষ বেকারত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে, যে সকল নারীর স্বামী বা পিতা আছে, সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হলো। দ্বিতীয় ধাপে, যে সকল নারী বিবাহ করেনি (কুমারী, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত), সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হলো। অথবা নারীর পুরুষ অভিভাবককে চাকরি প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

মুসলমানদের শিক্ষানীতি সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আহলে সুফফার অনুসারী দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাস অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
২. খ্রিষ্টানদের অনুসারী কমানোর উদ্দেশ্যে, সকল স্কুল-কলেজকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসাতে রূপান্তরিত করার হলো।
৩. চাহিদা ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, সকল নারীকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. সকল প্রকার শিক্ষা সফর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. সকল মুসলমানের আদর্শ পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে, সকল সভা শুরু হবে সূরা ফাতিহা দিয়ে এবং সকল সভা শেষ হবে দোয়ায়ে কুনুত দিয়ে, যা মুসলমানদের শপথবাক্য হিসেবে গণ্য হবে।

মুসলমানদের থেকে অশ্লীলতা দূরীকরণ ও পারিবারিক সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. সকল মুসলমান পুরুষকে মুখে দাড়ি রাখার জন্য ও পাঞ্জাবি পরিধান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২. সকল মুসলমানকে নিজ বাড়িতে, দোকানে ও অফিসের মধ্যে মাশাআল্লাহ লেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩. মুসলমান পরিবারে প্রেম-যিনা ও পরকীয়া বন্ধ করতে সকল নারীকে বিশ বছরের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. মুসলমানদের বিবাহে নাচ, গান থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. অশ্লীলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ও নিরাপত্তার স্বার্থে, সকল নারীকে বোরকার মাধ্যমে পর্দা করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৬. সমাজে প্রেম, যিনা ও পরকীয়ার বিস্তার বন্ধ করার জন্য মাহরাম ব্যতীত পুরুষ-নারী একসাথে চলাচল নিষিদ্ধ করা হলো।
৭. যিনা বন্ধের উদ্দেশ্যে, সকল প্রকার বিউটি পার্লার, মদের বার, পতিতালয়, কনসার্ট, জুয়ার আসর, সিনেমা হল ও নাট্যশালা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৮. নারীদের লজ্জাস্থানের পোশাকসমূহ গোপনে বিক্রয় করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৯. নারীর ছবিযুক্ত সকল বিজ্ঞাপন ও পণ্য তৈরি করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
১০. হিজড়াগণকে, পুরুষ পুরুষের ন্যায় এবং নারী নারীর ন্যায় জীবন যাপন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১১. ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক তড়িৎ রশ্মি কমানোর উদ্দেশ্যে, মোবাইল ভয়েস কলের মূল্য ০.৫০ পয়সা করে, মোবাইল ইন্টারনেটকে ৩জি-তে এনে তার মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. মুসলিম বঙ্গের বিভাগসমূহের অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে, ইসলামিক অর্থবহ নামকরণ করা হলো: ঢাকা থেকে মসজিদাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে আউলিয়াবাদ, রাজশাহী থেকে বরকতপুর, খুলনা থেকে তাওহীদাবাদ, সিলেট থেকে পীরপুর, বরিশাল থেকে বাহরাইন, রংপুর থেকে রহমতপুর, ময়মনসিংহ থেকে হাক্কানি।

মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারমূলক নির্দেশনা:

১. যেই সকল মুসলমানের উপর নামাজ ফরজ হয়েছে, তাঁদের সকলকে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
২. যেই সকল মুসলমানের উপর রোজা ফরজ হয়েছে, তাঁদের সকলকে রোজা রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৩. হালাল উপার্জনকারী সচ্ছল ব্যক্তিগণকে হজ্জ পালন করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
৪. মুসলমান-মুসলমানকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৫. সকল মসজিদে খ্রিষ্টানদের সভাপতি ভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতি বাদ দিয়ে, মুসলমানদের শূরা পদ্ধতি চালু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৬. সকল মুসলমানের মামলা ও অভিযোগ স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবকে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
৭. খ্রিষ্টানদের আইন দিয়ে পরিচালিত সকল জেলা আদালতের কার্যক্রম নিকটস্থ মডেল মসজিদের ইমাম সাহেবকে করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৮. মুসলিম বঙ্গে সমকামিতা, লিঙ্গ পরিবর্তন ও পরকীয়া নিষিদ্ধ করা হলো।
৯. মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মেলনের দিন জুমাবার (শুক্রবার)। জুমাবার সম্মেলনের দিন হওয়ার কারণে সকল বর্ষপঞ্জিকাতে (ক্যালেন্ডার) সপ্তাহের প্রথম দিন জুমাবার করে ছাপানোর (প্রিন্ট) জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১০. শিরক থেকে বাঁচার জন্য সকল প্রকার প্রকাশ্য মূর্তি অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো।
১১. মাইকে আযান ও আল-কোরআন ব্যতীত বাদ্যযন্ত্র ও অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো।
১২. সকল আলেমকে তদন্ত সাপেক্ষে ইসলামিক সরকারের ব্যাপারে বক্তব্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

মুসলিম বঙ্গের মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম (মদিনা রাষ্ট্র পুনর্গঠন)

আমরা উপরে মুসলমানদের সভ্যতার আলোকে ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের যে রূপরেখা প্রকাশ করেছি, সেই রূপরেখা অনুসারে দেশ ও জাতিকে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন হয়। এক কথায় বলা যায়, সভ্যতা ও জাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়গুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে চলার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা হাতে থাকতে হয়। যেহেতু বর্তমান সময়ে ইসলামিক সরকারের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নেই, তাই সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে ইসলামিক সরকারকে সকল ক্ষমতা বুঝে নিতে হবে। কারণ, বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটালে তারা ইসলামিক সরকারকে ক্ষমতা বুঝিয়ে দেবে না। প্রাথমিকভাবে ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের মন্ত্রণালয় গুলো কী কী কাজ করবে ও তারা কীভাবে ক্ষমতা বুঝে নেবে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

****ইজতিবা মন্ত্রণালয় (শূরা সদস্য (মন্ত্রী) নির্বাচন ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. ইজতিবা মন্ত্রণালয় সরাসরি আমিরুল মুমিনীনের পরামর্শে কাজ করবে।
২. আমিরুল মুমিনিন সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধান নিয়োগ করবে।
৩. মুসলমানদের মধ্য থেকে আল-কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যোগ্য শূরা সদস্য বাছাই করবে।
৪. একই পরিবারের দুইজন শূরা সদস্য হতে পারবেন না।
৫. মারকায মসজিদের শূরা সদস্যগণ স্থানীয় মসজিদের শূরা গঠন করবেন।
৬. মারকায থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত শূরা কমিটি গঠন ও তার তদারকির কাজ করবে।
৭. শূরা সদস্যদের ফরজ বিধান পালনের তথ্য সংরক্ষণ করবে।
৮. একশত (১০০) বছর বয়স বা অক্ষম শূরা সদস্যদেরকে অবসর প্রদান করবে।
৯. অবসর মন্ত্রিগণকে ইসলামিক সরকারের পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
১০. মারকায থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত শূরা সদস্যদের হজ্জ বা ওমরাহ পালন নিশ্চিত করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. প্রতিটি মডেল মসজিদের জন্য এগার-১১ সদস্যের শূরা গঠন করা।
২. প্রতিটি মডেল মসজিদের জন্য সাত-৭ টি করে মারকায মসজিদ নির্বাচন করা।
৩. এগার-১১ টি মডেল মসজিদ নিয়ে পনেরো-১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় মসজিদ শূরা গঠন করা।
৪. সকল কেন্দ্রীয় মসজিদের শূরা সদস্যগণের মধ্য থেকে যাচাই করে মন্ত্রণালয়ের জন্য তেত্রিশ-৩৩ জন মন্ত্রীর নির্বাচন করা।
৫. মডেল মসজিদের শূরা সদস্যগণ সাহাবাদের আদর্শে রাজনীতি করে জনগণের নিকট প্রিয় হচ্ছেন কি না, তার তদারকি করা।

****উলিল আমর (প্রধান আমিরের কার্যালয়) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবেন।
২. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদেশ প্রদান করবেন।
৩. সকল অর্থের অনুমোদন প্রদান করবেন।
৪. সকল বাজেটের অনুমোদন প্রদান করবেন।
৫. প্রধান আমিরের নিজস্ব আল-মারসাদ গোয়েন্দা শাখা পরিচালনা করবেন।
৬. সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রধানকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
৭. দেশের সকল প্রধানদের নিয়ে গঠিত আল-মালাউ নামে একটি পরিষদ পরিচালনা করবেন।
৮. দেশের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু করার তদারকি করা।
৩. মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও মাশওয়ারা ফজরের পর শুরু করা।
৪. মুসলিম বঙ্গের জন্য নতুন রাজধানীর স্থান নির্বাচন করা।

**** ইসলাহ মন্ত্রণালয় (জনপ্রশাসন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. রাসূল (সা.)-এর শ্রম আইন বাস্তবায়ন করবে এবং মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসন করবে।
২. সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য দেওবন্দ শিক্ষা কাঠামো থেকে মুমিন দক্ষ পুরুষ কর্মী নিয়োগ প্রদান করবে।
৩. দেশের সকল অদক্ষ ও বেকার পুরুষের তালিকা তৈরি করে যোগ্যতানুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৪. মাদ্রাসার ছাত্র ও সাধারণ যুবকদের আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে দক্ষ করবে।
৫. পুরুষ বেকারত্ব দূর করতে কর্মরত নারীদের চাকরি থেকে প্রত্যাহার করবে।
৬. নারীর পরিবর্তে তাদের পুরুষ অভিভাবকদের চাকরির ব্যবস্থা করবে।
৭. দুর্নীতি ও ঘুষ বন্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি করবে।
৮. সকল কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, বদলি, তথ্য সংরক্ষণ ও অবসর প্রদান করবে।
৯. সকল কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার অনুমোদন নিবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. মন্ত্রী ব্যতীত ইসলামিক সরকারের হয়ে যে সকল মুমিন ব্যক্তি কাজ করবে তাঁদের তথ্য সংরক্ষণ করা।

****হুকমুল্লাহ মন্ত্রণালয় (আল্লাহর আইন ও বিচার বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. সংবিধান ও আইনের ভিত্তি হিসেবে আল-কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন সংরক্ষণ করবে।
২. মারকায থেকে কেন্দ্রীয় মসজিদ পর্যন্ত মুফতি, মুহাদ্দিস ও ফকিহগণকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবে।
৩. দারুল ইফতা-ফতোয়া বিভাগ পরিচালনার মাধ্যমে আইনগত মতভেদ নিরসন করবে।
৪. সরাসরি মুসলমানদের অভিযোগ বা মামলা গ্রহণ করবে।
৫. প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিচার মারকায মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসাগুলো সম্পন্ন করবে।
৬. প্রাথমিক বিচারে অমীমাংসিত মামলাগুলো পর্যায়ক্রমে উচ্চতর আদালত তদারকি করবে।
৭. আল-কোরআনের আইন অনুযায়ী মাদ্রাসার মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করা হবে।
৮. হদ ও কিসাস: সুদ, শাতেমে রাসূল (সা.), শিরক, যিনা (ব্যভিচার), চুরি, হত্যা (কিসাস), সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিবর্তনের অপরাধে অপরাধীকে অপরাধের ধরন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড, রজম, বেত্রাঘাত, হস্তচ্ছেদ ও হিরাবাহর (ডাকাতি/সন্ত্রাসবাদ) শাস্তি কার্যকর করবে।
৯. সকল বেত্রাঘাতের দণ্ড মডেল মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসা কার্যকর করবে।
১০. মৃত্যুদণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদের দণ্ড কেন্দ্রীয় মসজিদের অধীনে থাকা মাদ্রাসা কার্যকর করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. প্রাথমিকভাবে কারা ইসলামিক সরকারের মডেল মসজিদ ভিত্তিক বিচারকার্য পরিচালনার করবে তাদের তালিকা তৈরি করা।
৩. মুসলমানদের ইসলামিক আদালত চালু করা এবং অভিযোগ ও মামলা গ্রহণ করা।
৪. মুসলমানদের ইসলামিক আদালতে জমাকৃত মামলার ভিত্তিতে আল্লহার আইনে বিচার করে। বিচারের রায় জনগণকে শুনিয়ে দেওয়া। যেমন- রাখাল রাহার মৃত্যুদণ্ড, সমকামিতার জন্য অমুকের মৃত্যুদণ্ড।

**উসওয়াতুন হাসানা মন্ত্রণালয় (ফরজ ও সুন্নাহ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. প্রতিটি স্থানীয় মসজিদের নামায কায়েম আমির (সমাজি)— উসওয়াতুন হাসানা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে।
২. মুসলমানদের মধ্যে ফরজ আইনগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেমন- নামাজ, রোজা, এবং পুরুষের টাখনুর উপরে কাপড় পরা।
৩. মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাহর আমলগুলো বাস্তবায়ন করবে। যেমন- পুরুষের দাড়ি রাখা, পাঞ্জাবি-পাগড়ি পরিধান করা, দস্তরখানায় খাওয়া, দুই হাতে মুসাফাহা করা, তাসবিহ পাঠ ও কোরবানি করা। এছাড়া ব্রিটিশদের দ্বারা বন্ধ হওয়া সকল সুন্নত পুনরায় চালু করবে।
৪. সকল মুসলমানের জন্য সাত-৭ দিনের অজু ও নামায প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
৫. হজ্জ ও ওমরাহ পালনের জন্য ৩০ শতাংশ সরকারি প্রণোদনা প্রদান করবে।
৬. হজ্জ ও ওমরাহ পালনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৭. রাষ্ট্রে হিজরি সনের দাপ্তরিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
৮. চান্দ্র পঞ্জিকা অনুসারে চাঁদ দেখে রোজার সময় নির্ধারণ করবে।
৯. যাকাত ও ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
১০. সাধারণ মুসলমানদেরকে সকল প্রকার ফতোয়া প্রদান করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, নির্বাচন কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন) ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. হজ্জ এজেন্সির তালিকা তৈরি করা এবং হজ্জের যাতায়াত সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ করা।
৩. মদিনা রাষ্ট্রের ইসলামের মধ্যে কাদিয়ানী ও শিয়াদের যে সকল ভ্রান্ত মতবাদ প্রবেশ করেছে, তার তালিকা তৈরি করা।
৪. মুসলমানদের ঈমান উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা করা।

**আমর বিল মারুফ মন্ত্রণালয় (সৎ কাজের প্রচার ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মুসলমানদের মদের দোকান, পতিতালয়, জুয়ার আসর, মাদকদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয় ও সেবন কঠোরভাবে বন্ধ করবে।
২. মুসলমানদের মধ্যে প্রেম, যিনা এবং পরকীয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৩. ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সকল বিনোদন ও দোকানপাটে নাচ-গান বন্ধ করবে।
৪. মুসলমানদের সকল বিবাহ মসজিদে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে।
৫. মুসলমানদের মধ্যে চার-৪ বিবাহ প্রথা চালু রাখবে এবং গণবিবাহের আয়োজন করবে।
৬. মুসলমানদের পারিবারিক কলহ নিরসন এবং স্বামী দ্বারায় স্ত্রীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করবে।
৭. মুসলমানদের তালাক সংক্রান্ত মধ্যস্থতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।
৮. মাহরাম পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মুসলমান মহিলাদের একা দূরপাল্লায় ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. নারীদের গোপন অঙ্গের পোশাক গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১০. মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত ও স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করবে।
১১. ধর্মত্যাগকারী মুরতাদ ও ভণ্ড কাদিয়ানিদের কার্যক্রম দেশ থেকে বিলুপ্ত করবে।
১২. হিজড়াদের তাঁদের শারীরিক গঠন অনুযায়ী (পুরুষ/নারী) জীবনযাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৩. নারীদের মাজার জিয়ারতে প্রবেশাধিকার বন্ধ করবে।
১৪. মুসলমানদের মধ্য থেকে কুফরি তাবিজ, মাজার পূজা এবং ভণ্ড পীরদের কার্যক্রমসহ সকল প্রকার কুসংস্কার নির্মূল করবে।
১৫. মানসিক রোগী ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ওপর নজরদারি করবে এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করবে।

**আমওয়াল মন্ত্রণালয় (অর্থ ও বাইতুল মাল বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু করবে এবং টাকাকে স্বর্ণের মানে রূপান্তর করবে।
২. স্বর্ণনির্ভর নতুন ইসলামিক মুদ্রার প্রচলন করবে এবং মুসলমানদের জন্য নতুন মুদ্রার ইসলামিক নকশা করবে।
৩. ইলেকট্রনিক মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রার মধ্যে সমন্বয় করবে এবং হারাম তহবিলের অর্থ স্বর্ণমান নির্ভর মুদ্রার মূলধন হবে।
৪. মুসলমানদের সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজি করে গড়া সকল সম্পদ সরকারের হারাম তহবিলে জমা করবে।
৫. সকল প্রকার সুদি ব্যবসা নিষিদ্ধ করবে এবং রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে একটি আমানত কেন্দ্র বা ব্যাংক পরিচালনা করবে।
৬. সুদমুক্ত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য নতুন আমানত কেন্দ্রের-ব্যাংকিং আইন প্রণয়ন করবে।
৭. মন্ত্রণালয়ের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করবে।
৮. অভ্যন্তরীণ আমদানি-রপ্তানি এবং চুক্তিবদ্ধ দল থেকে মুসলমানদের আইনি অনুসারে জিজিয়া আদায় করবে।
৯. প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় বাজেটের অনুমোদন নিবে এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করবে।
১০. বাইতুল মালে জমাকৃত অর্থের হিসাব রাখবে এবং বণ্টন নিশ্চিত করবে।
১১. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা প্রদান করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় সকল উন্নয়ন কাজের অর্থ প্রদান করবে এবং বাজেট পূরণের জন্য জনগণ থেকে সদকা গ্রহণ করবে।
১৩. মসজিদের অর্থবিষয়ক আমির মুয়াজ্জিন সাহেব আমওয়াল মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবেন।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. সরকারের (অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. জাতীয় আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছ হিসাব তৈরি করা।
৩. কোন কোন খাতে ভর্তুকি প্রদান করলে দেশ উন্নত হবে তার তালিকা তৈরি করা।
৪. নতুন মুদ্রার নকশা তৈরি করে জনগণকে দেখানো, যাতে তা চালু হলে তাদের কাছে একেবারে নতুন মনে না হয়। যেমন- দশ টাকার নোট কেমন হবে, পঞ্চাশ টাকার নোট কেমন হবে—তা দেখানো।

**মীরাস মন্ত্রণালয় (ভূমি ও সম্পদ বণ্টন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল স্থাপনা নির্মাণ করার পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং স্থাপনা নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করবে।
২. মুসলিম ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি অপ্রয়োজনীয় জমি বণ্টন করবে।
৩. ফারায়েজ-উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করবে।
৪. অন্যায়ভাবে সম্পদ-জমি দখলকারীদের জরিমানা করবে এবং উচ্ছেদ নিশ্চিত করবে।
৫. ভূমি সংক্রান্ত ক্রয়-বিক্রয়ের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৬. সরকারি প্রয়োজনে ভূমি ক্রয় করবে এবং রাষ্ট্রীয় সকল ভবন তৈরি করবে।
৭. রাষ্ট্রীয় সকল দলিল ও নকশা সংরক্ষণ করবে।
৮. সকল ভবন ও স্থানের অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে মুসলমানদের আদর্শিক নামকরণ করবে।
৯. ব্রিটিশ নকশা বর্জন করে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর অবস্থান শরিয়াহ ও কৌশলগত প্রয়োজনে পরিবর্তন করবে। যেমন- সংসদ ভবনকে কেন্দ্রীয় মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা, কেন্দ্রীয় জাদুঘরকে হোমিওপ্যাথি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. সকল সরকারি সম্পত্তির অবস্থান ও পরিমাণ সংরক্ষণ করা এবং চলমান সরকারি কর্মচারী, রাজনীতিবিদ ও গ্রুপ কোম্পানির সম্পত্তির অবস্থান ও পরিমাণ সংরক্ষণ করা। যেমন- খাসজমি, সরকারি অফিস, জিয়াউল আহসানের সম্পত্তি, বেনজীর আহমেদের সম্পত্তি, এস আলম, বেক্সিমকো ও প্রাণের সম্পত্তি।
৩. কোথায় কোথায় সরকারি ভবন নির্মাণ হচ্ছে এবং এর ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা।

****ফাদলুল্লাহ মন্ত্রণালয় (প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. জাতীয় সম্পদের (বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস) সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে এবং অপচয় রোধ করবে।
২. বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও তার ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৩. ওয়াসার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
৪. দিনের আলোর ও বাতাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৫. খনিজ ও বিরল সম্পদের অনুসন্ধান করবে।
৬. দেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ এবং ইসলামের বিধান মতে তার বণ্টন করবে।
৭. ইরান, রাশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জ্বালানি আমদানি করবে।
৮. প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের মজুদ নিশ্চিত করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে খনিজ সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করার সকল কারখানা পরিচালনা করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রের পরিচালনা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পাট ও চা রপ্তানি করবে এবং পাট দিয়ে দেশি পণ্য উৎপাদন করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. দেশে কোন কোন খাতে গ্যাস ব্যবহার করলে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে তা খুঁজে বের করা।
৩. দেশে কোথায় কোথায় তেল ও গ্যাসক্ষেত্র আছে এবং কোন কোন কোম্পানি সেগুলো উত্তোলনে নিয়োজিত তার একটি তালিকা তৈরি করা।

****তিজারা মন্ত্রণালয় (ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. খ্রিষ্টানদের লিমিটেড ও গ্রুপ কোম্পানি আইন বাতিল করবে এবং সিন্ডিকেট ধ্বংস করবে।
২. মুসলমানদের যাকাতভিত্তিক ব্যবসায়িক আইন বাস্তবায়ন করবে।
৩. মুসলমানদের সগীর, মুতাওয়াসসিত, কাবীর ব্যবসানীতি পরিচালনা করবে।
৪. ব্যবসায়ীদের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের অনুমোদন প্রদান করবে।
৫. নতুন মুতাওয়াসসিত ও কাবীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করবে।
৬. দেশের সকল আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ইপিজেড সমূহের পরিচালনা করবে।
৭. সকল পণ্যের মান যাচাই করবে এবং প্যাকেটজাত পণ্যের পরিবর্তে বেকারিপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৮. স্বাস্থ্য ও দেশ রক্ষায় প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে সিমেন্ট, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবসা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বালু ও পাথরের ব্যবসা করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. সকল মুসলমানবিদ্বেষী দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কার্যালয় ও শাখা-প্রশাখার একটি তালিকা তৈরি করা এবং তাদের বর্তমান ঠিকানা লিপিবদ্ধ করা। যেমন- জাতিসংঘ, আড়ং, প্রাণ।
৩. গ্রুপ কোম্পানিগুলোর কারণে দেশের মধ্যে ছোট ব্যবসায়ীরা লোকসানে আছে— তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

তারবিয়াহ মন্ত্রণালয় (ইসলামিক শিক্ষা বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র, সকল মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে ব্যবসা ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২. আহলুল জিম্মাহ ব্যতীত সকল স্কুল-কলেজকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক মাদ্রাসায় রূপান্তর করে নতুন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করবে।
৩. দেওবন্দ-ভিত্তিক তিন ধাপে সিলেবাস প্রণয়ন করবে এবং শ্রেণিভিত্তিক বই নির্ধারণ করবে।
৪. প্রথম ধাপে প্রত্যেক ৫-১০ বছর বয়সি শিশুদের আল-কোরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৫. দ্বিতীয় ধাপে ১১-১৭ বছর বয়সি বালক-বালিকার সাধারণ শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
৬. বালিকাদের দ্বিতীয় ধাপে বা দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. তৃতীয় ধাপে ১৮-২০ বছর বয়সি যুবকদের ব্যবসা বা কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৮. চতুর্থ ধাপে ২১-২৩ বছর বয়সি যুবকদের উচ্চতর গবেষণা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. পুরুষ ও নারীর পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করবে এবং রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরি সমূহ পরিচালনা করবে।
১০. শিক্ষা কেন্দ্রিক গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করবে এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করবে।
১১. মুসলমানদের প্রয়োজনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করবে।
১২. প্রত্যেক মুসলমানকে আল-কোরআন গণশিক্ষা প্রদান করবে।
১৩. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে ছাত্ররা পড়বে তা ঠিক করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করা, যাতে সকল প্রতিষ্ঠানকে মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্র করা যেতে পারে।
৩. সকল স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির তথ্য সংরক্ষণ করা।
৪. দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কী কী বিষয় থাকবে তার তালিকা তৈরি করা। যেমন- ঢাবি-তে মুফতি বিভাগ, রাবি-তে যাকাত বিভাগ, চুয়েট-এ পরমাণু বিভাগ, ইবি-তে ইমাম বিভাগ, চবি-তে মহাকাশ বিভাগ, নোবিপ্রবি-তে চিপ ও সার্কিট বিভাগ।

শিফা মন্ত্রণালয় (চিকিৎসা ও ওষুধ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. রাষ্ট্রীয়ভাবে দুই বছর বয়সি সকল শিশুর চিকিৎসা ও ওষুধ সম্পূর্ণ ফ্রিতে প্রদান করবে।
২. রোগ হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
৩. হোমিও চিকিৎসাকে উন্নত করবে এবং প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহার করবে।
৪. রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশে দশ-১০টি হোমিও বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার তৈরি করবে।
৫. সকল প্রকার ক্ষতিকর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বন্ধ করবে।
৬. শিশুদের ও নারীদের সকল প্রকার পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন-টিকা বন্ধ করবে।
৭. সিজারিয়ান অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করবে এবং স্বাভাবিক প্রসবের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৮. সিজার করার পূর্বে ডাক্তারদের লিখিতভাবে যথার্থ কারণ উল্লেখ নিশ্চিত করবে।
৯. ভ্যাকসিন ও ওষুধ ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে তার মান নিশ্চিত করবে।
১০. ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে কাজ করবে এবং রোগ অনুসারে ওষুধ উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার পরিচালনা করবে।
১১. মুসলমানদের চাহিদার চেয়ে বেশি চিকিৎসক নিশ্চিত করবে।
১২. সকল হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।
১৩. সকল প্রকার ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ডাক্তার-ওষুধ কোম্পানির গোপন চুক্তি নিষিদ্ধ করে তাদের তদারকি করবে।
১৪. নতুন হাসপাতালের, ওষুধ কোম্পানির ও ফার্মেসির অনুমোদন প্রদান করবে।
১৫. সকল সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে।
১৬. সকল ডাক্তারকে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রদান করবে এবং সকল ডাক্তারের ভিজিট নিয়ন্ত্রণ করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. যে সকল ডাক্তার ও হাসপাতাল মাত্রাতিরিক্ত সিজার করায়, তাদের একটি তালিকা তৈরি করা।

****ইবদা মন্ত্রণালয় (আধুনিকীকরণ ও বিজ্ঞান বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. ক্যামেরার ব্যবহার কমিয়ে আনবে এবং চিপ প্রযুক্তিতে জনগণকে দক্ষ করবে।
২. বৈশ্বিক ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অশ্লীল কনটেন্ট সম্পূর্ণ বন্ধ করবে।
৩. ইন্টারনেটের ক্ষতিকারক রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়্যারলেসের ব্যবহার কমিয়ে আনবে।
৪. নিরাপত্তার স্বার্থে বিদেশি কোডিংয়ের বিকল্প হিসেবে নিজস্ব এনক্রিপশন ও বাইনারি পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে।
৫. ডাক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৬. নতুন প্রযুক্তির জন্য গবেষণা পরিচালনা করবে।
৭. কৃষি খাতের জন্য নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করবে।
৮. রাষ্ট্রীয় সকল অনলাইন সেবা প্রদান করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে ভয়েস কল ও ইন্টারনেটের ব্যবসা পরিচালনা করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে দেশের সকল মোবাইল টাওয়ার ও সিম পরিচালনা করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বৈশ্বিক সংযোগ মুক্ত মুসলমানদের নিজস্ব ওয়েবসাইট ও হোস্টিং পরিচালনা করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে কুরিয়ারের মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি পণ্যের আদান-প্রদান করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. বাংলাদেশে খ্রিষ্টানদের প্রযুক্তি অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। খ্রিষ্টানদের প্রযুক্তির পরিবর্তে বিপরীত প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা। যেমন- Google-এর পরিবর্তে Yandex, Windows-এর পরিবর্তে ROSA Linux।
৩. ইন্টারনেট সাবমেরিন ও স্থল কেবলের দুর্বল সংযোগসমূহের স্থান চিহ্নিত করা। খ্রিষ্টানদের আধিপত্য কমাতে এবং খ্রিষ্টানদের ফেসবুক, ইউটিউবসহ সকল প্রকার নাচ-গান ও গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করার জন্য বৈশ্বিক সাবমেরিন কেবল বিচ্ছিন্ন করা।
৪. বাংলাদেশে কতগুলি মোবাইল টাওয়ার, বেতার টাওয়ার ও ওয়াকিটকি টাওয়ার আছে তার তালিকা তৈরি করা।

****মায়িদাহ মন্ত্রণালয় (খাদ্য উৎপাদন ও ত্রাণ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. বাংলাদেশের খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন বন্ধ করবে।
২. দেশীয় পশু-পাখি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করবে এবং ছোট নদীর পাশে গবাদি পশুর খামার তৈরি করবে।
৩. প্রয়োজনীয় সার আমদানি করবে এবং প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৪. সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে।
৫. পুকুরসমূহে মাছের উৎপাদনের তদারকি করবে এবং ছোট মাছ রক্ষায় পুকুরে সাবানের ব্যবহার কমাবে।
৬. খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং খাদ্য থেকে ফরমালিন ও ভেজাল দূর করবে।
৭. ব্রয়লার মুরগির ব্যবহার হ্রাস করবে ও প্যাকেটজাত খাবার কমাবে।
৮. খাদ্য তালিকা থেকে হারাম E-numbers বা হারাম জেলটিনের উৎস বন্ধ করবে।
৯. মজুদদারি রোধে আড়তদারদের ১০-৩০ দিন অন্তর পণ্য খালাস নিশ্চিত করবে।
১০. প্রয়োজনীয় খাদ্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবে।
১১. দেশের হিমাগারসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং মজুদ পণ্যের তালিকা সংরক্ষণ করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় সকল খাদ্য গুদাম পরিচালনা করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জরুরি অবস্থায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
১৩. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পশুর চামড়া রপ্তানি করবে এবং চামড়া দিয়ে দেশি পণ্য উৎপাদন করবে।
১৪. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে পশু থেকে হালাল জেলটিন উৎপাদন করে বাজারজাত করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. কৃষি খাতের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা এবং কী কী উদ্যোগ নিলে কৃষি খাতের উন্নয়ন সম্ভব তার তালিকা তৈরি করা।
৩. কৃষি খাতে সরকারি অনুদানগুলো সঠিকভাবে কৃষকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা।
৪. খাদ্যে কীভাবে ফরমালিন ও ভেজাল মেশানো হয় সেই বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করা।

****সাবিল মন্ত্রণালয় (যোগাযোগ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. মাগরিবের পর যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সকল অনুষ্ঠানের সময়সীমা নির্ধারণ করবে।
২. নারীদের যানবাহন চালানো ও মোটরবাইক আরোহণ নিষিদ্ধ করে তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।
৩. সড়ক কেন্দ্রিক সকল যানবাহনের ও চালকের অনুমোদন প্রদান করবে।
৪. দেশের যানজট নিরসন করবে এবং সকল বাজারে গাড়ি রাখার স্থান নির্ধারণ করবে।
৫. সড়কমুখী বাজারসমূহ পুনর্গঠন করে সড়কের বাইরে স্থানান্তর করবে।
৬. সড়ক ও বিমান-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৭. দেশে রেল ও নদী-কেন্দ্রিক পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি করবে।
৮. দেশের নতুন সড়ক, সেতু, বন্দর ও রেল নির্মাণ কাজ করবে।
৯. সড়কগুলোর নাম পরিবর্তন করবে। যেমন- ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক থেকে মসজিদাবাদ-তাওহিদাবাদ মহাসড়ক।
১০. মহাসড়কের পাশে চালকদের নামাজ ও বিশ্রামের জন্য মুসাফিরখানা চালু করবে।
১১. সকল সড়ক ডানমুখী করবে এবং যানবাহনের গায়ে কালিমা লেখা ও প্রবেশপথে মাশা-আল্লাহ লেখা বাস্তবায়ন করবে।
১২. সরকারি আমদানি পণ্য বিতরণের জন্য ট্রাক সেবা প্রদান করবে।
১৩. সড়ক ও যানবাহন কেন্দ্রিক আইন প্রণয়ন করবে।
১৪. গণপরিবহন উন্নয়ন করবে এবং ব্যক্তিগত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করবে।
১৫. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বাস সেবা, রেল সেবা ও বিমান সেবা প্রদান করবে।
১৬. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে রেলে পাথর পরিবহন করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. যুদ্ধকালীন রণকৌশলে ব্যবহারের জন্য জেলাভিত্তিক ছোট ও মাঝারি সকল সংযোগ সেতুর একটি তালিকা তৈরি করা। যেমন- লালপোল সেতু, গাবতলী সেতু, লালন শাহ সেতু।

****ইমারাতুল মসজিদ মন্ত্রণালয় (মসজিদ শূরা ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:**

১. মসজিদে খ্রিষ্টানদের সভাপতি ভিত্তিক পরিচালনা পদ্ধতি বাদ দিয়ে, মুসলমানদের শূরা পরিচালনা পদ্ধতি চালু করবে।
২. মুসলমানদেরকে নিয়মিত নামাজ-রোজা এবং তাবলীগে অংশগ্রহণে জন্য উৎসাহিত করবে।
৩. মসজিদের ইমামগণ যাকাত ও উশর সংগ্রহ করবে এবং আল-কোরআনের আইন অনুসারে যাকাত বণ্টন করবে।
৪. মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিন ও সপ্তাহের প্রথম দিন জুমাবারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
৫. মুসলমানদের জন্য জুমাবার পূর্ণ দিন ও বৃহস্পতিবার অর্ধ-দিবস ছুটি নিশ্চিত করবে।
৬. মুসলমানদের কর্মঘণ্টা ফজর থেকে আসর পর্যন্ত পরিচালনা করবে।
৭. সকল কারখানায় নামাজের জন্য নির্ধারিত বিরতি নিশ্চিত করবে।
৮. ইমারাতুল মসজিদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মসজিদ আমির, সহকারী আমির ও উন্নয়ন আমির কাজ করবেন।
৯. মুসলমানদের বিবাহসমূহ নথিবদ্ধ করবে এবং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধ করবে।
১০. মুসলিম এতিম-বিধবা ও মজলুম পরিবারের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান নিশ্চিত করবে।
১১. অভাবী-গরিব ও নব-মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদান নিশ্চিত করবে।
১২. যাকাত উত্তোলনের পরে যাকাত আদায়কারীর অংশ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল তহবিলে জমা করবে।
১৩. মসজিদের ইমাম সাহেব সকল মামলার ও অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন মারকাযে জমা প্রদান করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. মেম্বার ও চেয়ারম্যান যে সকল কাজ করেন, তাঁদের সকল কাজের তালিকা তৈরি করা।
৩. যাদের বসবাসের বাড়ি নেই তাদের এবং নব-মুসলিমদের তালিকা তৈরি করা।
৪. বিশ-২০ বছরের মধ্যে যে সকল মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়নি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা।

**নামল মন্ত্রণালয় (পরিবেশ ও নদী বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. প্রতিবছর প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসতবাড়িতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে। যেমন- ছোট চকলেটের প্যাকেট কোথায় রাখবে এবং কীভাবে তা রান্নার কাজে-আগুনে ব্যবহার করবে।
২. পলিথিন-মুক্ত পরিবেশ ও দূষণ-মুক্ত কলকারখানা গঠনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৩. গরমের প্রভাব কমাতে পাহাড় রক্ষা ও বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করবে।
৪. প্রতি বছর বন্যা এবং নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ ও নদী খনন কাজ করবে।
৫. দেশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে এবং ছোট নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে পানির উপস্থিতি নিশ্চিত করবে।
৬. নদীর বাঁধ থেকে নেওয়া পলিমাটি দিয়ে প্রাকৃতিক সার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে।
৭. ইটের পরিবর্তে পাথর-সিমেন্ট মিশ্রিত ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি করবে।
৮. দেশের পাহাড়-বন ও নদীর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিচালনা করবে।
৯. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে চা-পাতার উৎপাদন করবে এবং পাট রপ্তানি করবে।
১০. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বৃক্ষরোপণ করে তার পরিপক্কতার পর বিক্রয় করবে।
১১. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে জলপ্রপাত থেকে পাথর উত্তোলন করবে।
১২. রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে বন থেকে গাছ সংরক্ষণ করে বাজারজাত করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. নদীতে বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে মাছ উৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষকে এই সকল বিষয়ে সচেতন করা।
৩. দেশ থেকে কোথায় কোথায় কাঠ পাচার হয় তার তালিকা তৈরি করা।
৪. যে সকল স্থান থেকে বালু ও পাথর উত্তোলন করা হয় তার তথ্য সংরক্ষণ করা।

**তাবলীগ মন্ত্রণালয় (সংস্কৃতি ও সম্প্রচার বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:

১. সকল সভার শুরুতে সূরা ফাতিহা পাঠ এবং সভার শেষে দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করাকে বাস্তবায়ন করবে।
২. মাইকে আজান ও আল-কোরআন তিলাওয়াত ব্যতীত অন্য ধর্মগ্রন্থ বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিয়ন্ত্রণ করবে।
৩. দেশে আল-কোরআন প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে এবং মানুষের শারীরিক খেলাধুলার ব্যবস্থা করবে।
৪. মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াতে তাবলিগ-দল এই মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করবে।
৫. দেশে প্রতি বছর ইজতেমার আয়োজন তাবলীগ মন্ত্রণালয় করবে।
৬. রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম পরিচালনা করবে এবং সকল সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করবে।
৭. ইসলামিক সরকারের সকল সমাবেশ ও সম্মেলন পরিচালনা করবে। যেমন- মুফতি ও আলেম সম্মেলন, হাফেজ সম্মেলন।
৮. আল্লাহর আইন মান্য করার ফজিলত বর্ণনা করবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবে।
৯. সুন্নাহর মধ্যে মতভেদ দূর করে একীভূত ইসলামি দর্শন প্রচার করবে।
১০. সাধারণ জনগণের জিহাদের চেতনা ও ইবাদতের জন্য সপ্তাহে এক-১ রাত শবগুজারি নিশ্চিত করবে।
১১. পুরুষ- নারীর ছবিযুক্ত বিজ্ঞাপন ও পণ্য উৎপাদন বন্ধ করবে।
১২. মজলুম মুসলিমদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করবে।
১৩. আহলুল জিম্মাহ (কাফের)-দের জন্য পৃথক শিক্ষা নিশ্চিত করবে।
১৪. শরণার্থী সমস্যা নিরসন এবং বহিষ্কৃতদের প্রত্যাবাসন তদারকি করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:

১. চলমান সরকারের (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়) ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. মন্ত্রণালয়ভিত্তিক দেশ পরিচালনা-সংক্রান্ত তথ্য বেশি বেশি প্রচার করা। যেমন- ইসলামিক অর্থ মন্ত্রণালয় কীভাবে কাজ করবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কীভাবে কাজ করবে—সেই সকল বিষয় প্রচার করা।
৩. প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন করা। যেমন—ইসলামিক আইন ও শরিয়াহ আইনের পরিবর্তে মুসলমানদের আইন বলা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে খ্রিষ্টানদের রাষ্ট্রব্যবস্থা বলা, অর্থনীতির পরিবর্তে ব্যবসানীতি বলা, ইসলামিক স্বর্ণযুগের পরিবর্তে মুসলমানদের স্বর্ণযুগ বলা।

মুরসালীন মন্ত্রণালয় (পররাষ্ট্র ও চুক্তি বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. দেশের দূতাবাসসমূহ পরিচালনা করবে এবং আমদানি ও রপ্তানির জন্য চুক্তি করবে।
২. ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সুইফট কোডের বিকল্প হিসেবে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আদান-প্রদান করবে।
৩. প্রবাসীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।
৪. প্রবাসীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
৫. মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে আরবি ভাষার প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৬. আরব দেশগুলোর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে।
৭. দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করবে।
৮. বিদেশি সংস্থার প্রবেশ ও অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করবে।
৯. বিদেশি কোম্পানিগুলোর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে।
১০. মুসলমানদের রাষ্ট্রনীতি অনুসারে কাফেরদের সাথে চুক্তি করবে।
১১. মৃত প্রবাসীর মরদেহ ফ্রিতে তার স্বজনদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে।
১২. প্রবাসে অবস্থিত সকল শ্রমিককে ফ্রিতে পাসপোর্ট প্রদান করবে।
১৩. প্রবাসী শ্রমিকদের ফ্রিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:
১. চলমান সরকারের (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. ইহুদী-খ্রিষ্টান বিরোধী দেশগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। যেমন- অর্থনৈতিক অবরোধ এড়ানোর উদ্দেশ্যে ইরান থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সরবরাহ; রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য গম, ভুট্টা, সার ও কৃষি পণ্যের জরুরি সরবরাহ; এবং চীন, উত্তর কোরিয়া থেকে ভারী সামরিক সরঞ্জাম, সামরিক প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা সহযোগিতা।
৩. ইহুদী-খ্রিষ্টান দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমিয়ে মুসলিম দেশ ও আঞ্চলিক মিত্রদের সাথে ইরান, আফগানিস্তান, রাশিয়া, চীন বাণিজ্যিক করিডোর ও চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি করা।
৪. দেশ থেকে মাছ, চামড়া, পাট, পোশাক, সবজি ও কাঠ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা। যেমন- আরব দেশগুলোর জন্য মাছ, রাশিয়ার জন্য পোশাক এবং চীনের জন্য চামড়া।
৫. বাংলাদেশের যে সকল দূতাবাস আছে, তাদের অপকর্ম তুলে ধরা এবং প্রবাসীরা তাদের কাছে কীভাবে হেনস্তা হচ্ছে—তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা।

সাফ মন্ত্রণালয় (স্বরাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. সাফ মন্ত্রণালয় দেশের ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধা-সামরিক বাহিনী পরিচালনা করবে।
২. দেশের সীমান্তবাহিনী, পুলিশ ও আনসারদের সম্মিলিত নাম হবে কুওয়াতুল ইসলাম বাহিনী।
৩. দেশের আধা-সামরিক বাহিনী আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে এবং জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
৪. দেশের আধা-সামরিক বাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ তৈরি করবে।
৫. দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর আয়ের উৎস হিসেবে কেমিক্যাল ও গ্যাসের ব্যবসা করবে।
৬. দেশের আধা-সামরিক বাহিনীর একটি শাখা চোরাচালান, মাদক ও রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করবে।
৭. আধা-সামরিক বাহিনীর একটি শাখা আমর বিল মারুফ ও হুকুমুল্লাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে।
৮. দেশের সকল জনগণের তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি করবে।
৯. আঠারো-১৮ বছর বয়সীদের জন্য এক চিল্লা-৪০ দিনের আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
১০. দেশের সকল অভ্যন্তরীণ অপরাধীকে বন্দী করে তাদের বিচার কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করবে।
১১. অগ্নিকাণ্ড ও জরুরি উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রতিটি মডেল মসজিদ ভিত্তিক শক্তিশালী উদ্ধারকারী দল গঠন করবে।
১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, পার্ক, জিম এবং কর্মক্ষেত্রসহ সকল জনসমাগমের স্থানে পুরুষ ও নারীর জন্য কঠোর পৃথকীকরণ নীতি নিশ্চিত করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:
১. চলমান সরকারের (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)-এর ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. শাতিম-সহ সকল ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার তালিকা তৈরি করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রসমূহ ইসলামিক আদালতে পেশ করা। যেমন- রাখাল রাহা, হিজবুত তাওহিদ, কোডেক, গ্রামীণ ব্যাংক, মেটলাইফ, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, কাদিয়ানি, ব্র্যাক, প্রাণ, স্কয়ার, ছায়ানট, লালনগীতি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার।
৩. প্রাথমিকভাবে কারা দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে তাদের তালিকা তৈরি করা। যেমন- মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র, ইমাম, মুয়াজ্জিন, মুফতি এবং খতিব।
৪. বর্তমান সরকারের প্রত্যেক সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ কার্যালয়ের গতিবিধির ওপর নজরদারি করা।
৫. গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করে এমন সকল ব্যক্তির তথ্য সংরক্ষণ করা।

**মারসুস মন্ত্রণালয় (সশস্ত্র মুজাহিদ বিষয়ক) যেই সকল দায়িত্ব পালন করবে:
১. মারসুস মন্ত্রণালয় আল্লাহর আইনের ও মুসলমান জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সামরিক বাহিনী পরিচালনা করবে।
২. দেশের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সম্মিলিত নাম হবে কুওয়াতুল মুসলিমিন বাহিনী।
৩. সামরিক বাহিনী বহিঃবিশ্বের ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করবে।
৪. দেশের সামরিক বাহিনী নিজস্ব প্রযুক্তিতে সামরিক সরঞ্জাম তৈরি করবে।
৫. দেশের সামরিক বাহিনী মুসলমানদের সাহায্যে অভিযান পরিচালনা করবে।
৬. সামরিক বাহিনী সকল মডেল মসজিদের শূরা সদস্যদেরকে এক চিল্লা-৪০ দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
৭. সামরিক বাহিনীর আয়ের উৎস হিসেবে লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসা করবে।
৮. সামরিক বাহিনীর সদস্যদের পরিবারকে আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।
৯. সামরিক বাহিনীর বাজেট প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, বেতন-ভাতা ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে।
১০. সামরিক বাহিনীর সদস্যদেকে আল-কোরআন শিক্ষা প্রদান করবে এবং ইসলামিক কার্যক্রমের তদারকি করবে।

বর্তমান সময়ে যেই সকল কার্যক্রম শুরু করবে:
১. চলমান সরকারের (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়) ওপর নজরদারি করা এবং তাদের সকল অফিসারদের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করা।
২. প্রাথমিকভাবে যেই সকল স্থানে হামলা করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা। যেমন- শত্রুর যুদ্ধজাহাজ, বিমান উড্ডয়ন-অবতরণের স্থান, সামরিক ঘাঁটি, সেনানিবাস, অস্ত্রাগার, বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইন্টারনেট সার্ভার, সাবমেরিন কেবল, মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ার, ওয়াকি-টকি টাওয়ার, প্রশাসনিক কেন্দ্র ও গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো।
৩. হিজরত করার স্থান ঠিক করা। শত্রু আক্রমণের আশঙ্কাজনক ব্যক্তিদেরকে সেখানে হিজরতের ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৪. সম্ভাব্য হামলাসমূহের তালিকা তৈরি করা এবং তার প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা করা। যেমন- ভারতের আগ্রাসন।
৫. রণকৌশলের জন্য যাবতীয় প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৬. দেশের মধ্যকার ও বাইরের শত্রুদের তালিকা তৈরি করা। যেমন- র, মগ, শান্তিবাহিনী।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের নিরাপত্তা কাঠামো (সামরিক বাহিনী)

আদর্শ দিয়ে দেশ গড়তে হয়, সামরিক শক্তি দিয়ে সেই দেশ রক্ষা করতে হয়। খলিফা ওমর (রা.) অর্ধ পৃথিবী শাসন করে মুসলমানদেরকে শিখিয়েছেন রাষ্ট্র পরিচালনা করা। খলিফা ওমর (রা.) এক দল সৈন্যকে যুদ্ধে প্রেরণ করতেন যাদেরকে বলা যায় সামরিক বাহিনী। আরেক দল সৈন্যকে মদিনার নিরাপত্তা ও শাসন কাজ পরিচালনা করতে রাখতেন যাদেরকে বলা যায় আধা-সামরিক বাহিনী। খলিফা ওমর (রা.) বাহিনী পরিচালনার জন্য দেওয়ানুল জুন্দ নামক একটি কার্যালয় চালু করেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর সৈন্য বিন্যাস এত কৌশলী ছিল যে উনি অল্প সৈন্য দিয়ে ৩-৪টি যুদ্ধ একই সাথে সামাল দিতেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর রেখে যাওয়া মুসলমানদের সামরিক কাঠামোর সাথে বর্তমান সেনাবাহিনীর অনেক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছে খ্রিষ্টানদের রাষ্ট্রব্যবস্থার আইন ও কর্মীদের রক্ষা করতে। যদিও কিছু মুসলমান মনে করে খ্রিষ্টানদের আইন দিয়ে অপকর্মকারীদের নিরাপত্তা দিতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তখন সেই ব্যক্তি শহিদ হয়। সত্যিকার অর্থে বর্তমান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত হয় আমেরিকা থেকে। আপনি দেখবেন বর্তমান সেনাবাহিনীর উপরের অফিসাররা অবসরে গিয়ে আমেরিকায় চলে যান। অন্যদিকে সাধারণ সৈন্যরা যারা টহল দিতে ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করেন, যাদের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ি পর্যন্ত থাকে না, তারা দেশে থাকেন। বর্তমান সেনা কাঠামো হলো অফিসারদের জাকজমক ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান সেনাবাহিনী খ্রিষ্টানদের দ্বারা এত নিয়ন্ত্রিত যে সৈন্যদের জন্য অতিরিক্ত বুলেট মজুদ করতে পারে না। বর্তমান সেনাবাহিনী সাধারণ নির্বাচনের সময় ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করে। যুদ্ধের সময় তো তাদের গাড়িও থাকবে না বুলেট তো থাক দূরের কথা।

রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে সামরিক বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রম	দলের নাম	বর্তমান ব্যাটালিয়ন	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সৈন্যদলের কাজ	দল	সৈন্য
১	জাইশে ওসামা	প্যারা-কমান্ডো, নেভাল কমান্ডো, এয়ারবোর্ন কমান্ডো	রাসূল (সা.)-এর সময় তিনি নিজেই জাইশে ওসামা নামে একটি স্পেশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন। স্পেশাল সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান ছিলেন ওসামা বিন জায়েদ। জাইশে ওসামা প্রধানের কাজ ছিল খ্রিষ্টান রোমানদের দমানো, মুতাহ যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়া এবং মুসলমান দের শক্তি প্রদর্শন করা। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম প্যারা-কমান্ডো ব্যাটালিয়ন।	৪ টি	৪০ জন
২	রাজ্জালাহ	পদাতিক সন্য, মেরিন্স, বেস ডিফেন্স ইউনিট	রাসূল (সা.)-এর সময় বদরের যুদ্ধে ৩০০ জন সাহাবি ছিলেন সম্মুখ ভাগের পদাতিক যোদ্ধা, ১৩ জন অশ্বারোহী ছিলো। যারা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতেন। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন।	১০ টি	১০০ জন
৩	ফুরসান	সাঁজোয়া-ট্যাংক, অশ্বারোহী অ্যাটাক বোট, হেলিকপ্টার উইং	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে তায়েফ যুদ্ধে সাহাবীরা দাব্বাবাহ নামক একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করেন। তায়েফ শহরটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সাহাবীরা চামড়া দিয়ে একটি বড় কাঠামো তৈরি করেন। কাঠামোর ভেতরে একদল সাহসী যোদ্ধা অবস্থান নিয়ে এটিকে ঠেলে ঠেলে তায়েফের দুর্গের দেয়ালের একদম গোড়ায় নিয়ে যান। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্মার্ড ব্যাটালিয়ন।	৫ টি	৪০ জন
৪	রামাইতা	আর্টিলারি-মর্টার, গানবোট কামান, এয়ার স্ট্রাইক	তায়েফ যুদ্ধে যখন দাব্বাবাহ দিয়ে সাহাবারা তায়েফের দেয়াল ভাঙতে পারেন নাই, তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রথম পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র মিনজানিক ব্যবহার করেছিলেন। যা যেকোন দুর্ভেদ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙার অন্যতম উপায় ছিল। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন।	৩ টি	৩০ জন
৫	মুহানদিস	ইঞ্জিনিয়ার-মাইন সুইপার, ডাইভ ডেমোলিশন, রানওয়ে রিপেয়ার	রাসূল (সা.) মক্কার বিশাল বাহিনীকে রুখে দিতে হযরত সালমান আল-ফারসি (রা.)-এর পরামর্শে ৪০ হাত জায়গা খনন করতে আল-মুহান্দিসীন দলকে নির্দেশ দেন। এই খনন কাজ আজও মুসলমানদের ডিফেন্সিভ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিচয় দেয়। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম ব্যাটালিয়ন অব ইঞ্জিনিয়ার্স।	১ টি	১০ জন

ক্রম	দলের নাম	বর্তমান ব্যাটালিয়ন	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সৈন্যদলের কাজ	দল	সৈন্য
৬	যা-দ	রসদ ও জ্বালানি, লজিস্টিক শিপ, এয়ার রিফুয়েলিং	রাসূল (সা.)-এর সময় তাবুক যুদ্ধে পাথেয় সংগ্রহের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে। তাবুক যুদ্ধে প্রচণ্ড গরমে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সাহাবিরা যাতে মারা না যায় তার জন্য যা-দ দল সাধারণত খাদ্য-খেজুর, পানি ও প্রয়জনীয় সম্পদ সরবরাহ নিশ্চিত করত। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্মি সার্ভিস ব্যাটালিয়ন।	১ টি	১০ জন
৭	রুজালুল বারিদ	ওয়ারলেস ও রেডিও, সোনার ও সিগন্যাল, স্যাটেলাইট লিংক	রাসূল (সা.)-এর সময় ইস্তিসালাত বা রুজালুল বারিদ সামরিক সেনাদল এক সেনাদল থেকে অন্য সেনাদলে কাছে দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দিত। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন।	১ টি	১০ জন
৮	শিফাউন	ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স, ফ্লোটিং ক্লিনিক, এয়ার ইভাকুয়েশন	রাসূল (সা.)-এর সময় তিব্ব ওয়া মুদাওয়াত আল-জারহা নামে একটি দল অস্থায়ী তাবু খাটিয়ে চিকিসার সেবা দিত। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্মি মেডিকেল ব্যাটালিয়ন।	১ টি	১০ জন
৯	আসলিহা	অস্ত্রাগার, টর্পেডো ও মাইন ডিপো, মিসাইল ও পড মেমোরি	রাসূল (সা.)-এর সময় খাজানাতুস সিলাহ বা আসহাবুস-সিলাহ ওয়াল ফারাস দল যুদ্ধাস্ত্র-তলোয়ার, বর্ম, তীর, ধনুক তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতো এবং ক্রয়কৃত অস্ত্র তালিকাভুক্ত করতো। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্মি অর্ডন্যান্স ব্যাটালিয়ন।	১ টি	১০ জন
১০	আসহাবুস -সিলাহ	গ্যারেজ-মেরামত, ডকইয়ার্ড মেইনটেন্যান্স, হ্যাঙ্গার ইঞ্জিনিয়ারিং	রাসূল (সা.)-এর সময় যুদ্ধাস্ত্র মেরামত এবং কারিগরি সহায়তার জন্য আসহাবুস-সিলাহ দলটি কাজ করত। আসহাবুস-সিলাহ দলের সদস্যরা যুদ্ধের ময়দানের অস্ত্র সচল রাখার কাজ করতেন। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম ইএমই ব্যাটালিয়ন।	১ টি	১০ জন
১১	তাহাসসুস	গোয়েন্দা কোর, শিক্ষা কোর, ইন্টেলিজেন্স, রাডার ও টেকনিক্যাল	রাসূল (সা.)-এর সময় আসহাবুল ইস্তিখবারাত বা আল-জুসাস সন্য দল শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রাসূল (সা.)-কে অবহিত করত। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম সামরিক গোয়েন্দা কোর।	১ টি	১০ জন
১২	হারিস	মিলিটারি পুলিশ, ডোন, আরভি অ্যান্ড এফ, ফায়ার রেসকিউ, ওয়াটার রেসকিউ, ক্র্যাশ ফায়ার সার্ভিস	মুসলমানদের সকলের জন্য ইসলামে সমান আইন। তাই মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে মার্শাল ল নেই। যার কারণে মুসলমান সেনাবাহিনীতে মিলিটারি পুলিশের প্রয়োজন হয় না। তবে রাসূল (সা.)-এর সময় সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধের ময়দানে একদল সাহাবি রাতে কাজ করতেন যাদেরকে বলা হতো হারাস। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম কর্পস-মিলিটারি পুলিশ।	৩ টি	২৩ জন
১৩	দিওয়ানুল জুন্দ	কমান্ড সেন্টার নেতৃত্ব, রণকৌশল, শারীরিক প্রশিক্ষণ, ফ্লিট কমান্ড, এয়ার কন্ট্রোল	খলিফা উমরের (রা.) সময় দিওয়ানুল জুন্দ নামে একটি সামরিক দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। সামরিক দপ্তরের নেত্যতিতে তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ সহ যাবতীয় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো এবং যুদবে রণকৌশল স্থির করতে। বর্তমান সময়ে খ্রিষ্টানদের সামরিক কাঠামোতে এর নাম আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড।	১ টি	১০ জন
মোট = ১৩-টি শাখা, ৩৩-টি দল, প্রতিটি ব্যাটালিয়নে ৩১৩ জন সৈন্য, মোট ব্যাটালিয়ন সংখ্যা ৩১৩-টি, হেডঅফিস ১৩-টি					

রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর পরিচালনা পদ্ধতি:

১. মুসলমানদের সামরিক কাঠামোর উৎস: রাসূল (সা.) ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে বদর যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। বদরের জয়ের পরে খলিফা ওমরের সময় মুসলমানদের বিশাল বাহিনী হয়। খলিফা ওমর এই বিশাল বাহিনীকে ছোট ছোট ভাগে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে ভাগ করে দিতেন। যাতে বাহিনী নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একই সাথে চার-পাঁচটি যুদ্ধ করতে পারে। যেমন- পারস্য ফ্রন্টের কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.), জাসরের যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা আস-সাকাফি (রা.), রোমান ফ্রন্টের ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), ফিলিস্তিন এবং পরবর্তীতে মিসর যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন আমর ইবনুল আস (রা.)।

২. স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন গঠন: খলিফা ওমর (রা.) প্রথমবার সামরিক রেজিস্টার প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর খলিফা সেনাবাহিনীকে সেনাপতি, পদাতিক, অশ্বারোহী, তিরন্দাজ, গোয়েন্দা, ডাক্তার, প্রকৌশলী এবং দোভাষী দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাটালিয়নে গঠন করে দিতেন। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের নিজস্ব রসদ এবং সরঞ্জাম থাকতো, ফলে ব্যাটালিয়নকে কেন্দ্রীয় সাহায্যের অপেক্ষায় বসে থাকতে হতো না। কিন্তু বর্তমান সেনাবাহিনীতে একই রকম দল দিয়ে একটি ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়। যেমন—পদাতিক ব্যাটালিয়নে সবাই পদাতিক সৈন্য, আর্টিলারি ব্যাটালিয়নে সবাই আর্টিলারি সৈন্য এভাবে গঠন করা হয়।

৩. ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা: খলিফা ওমর (রা.) ১০ জন সৈন্যের জন্য একজন আরিফ-নেতা ঠিক করে দিতেন। ১০ জন আরিফ নেতার জন্য একজন কায়েদ-নেতা ঠিক করে দিতেন। ১০ জন কায়েদ নেতার জন্য একজন আমিরুল জুনদ-ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ঠিক করে দিতেন। খলিফা ওমর (রা.)-এর ব্যাটালিয়ন বিন্যাস ছিল মাকড়সার বাসার ন্যায়। তবে বর্তমান স্যাটেলাইট ও ড্রোন প্রযুক্তিকে ফাঁকি দিতে ৩১৩ জনের হালকা ব্যাটালিয়ন হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমান সেনাবাহিনীতে একটি ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা ৭০০-৮০০ হয়। একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের সাথে সাহায্যকারী ব্যাটালিয়ন যুক্ত করলে তা বিশাল বাহিনী হয়ে যাবে। এই বিশাল বাহিনী যদি যুদ্ধে যায়, তখন সাথে সাথে শত্রুর প্রযুক্তি তা ধরে ফেলবে।

৪. পরামর্শ ক্রমে সিদ্ধান্ত: খলিফা ওমর (রা.)-এর সময় যখন দুইটি ব্যাটালিয়ন একত্রিত হতো তখন কমান্ডারা একে অপরের সাথে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে পরামর্শ করতেন। কোন একজন-কমান্ডার এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে মজলিসে শুরার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন। অর্থাৎ বর্তমান সামরিক বাহিনিতে যেমন আগ থেকে ব্রিগেড গঠন করা থাকে কিন্তু মুসলমানদের নিয়ম এমন নয়। মুসলমানদের দুই এর বেশি ব্যাটালিয়ন যখন একত্রিত হবে তখন সকল ব্যাটালিয়ন মিলে একটি ব্রিগেড হয়ে যাবে। তখন এই ব্রিগেডের সিদান্তর জন্য ব্যাটালিয়ন কমান্ডারদের নিয়ে একটি ব্রিগেড বোড-শূরা গঠন করা হয়। এই ধরণের গঠন সন্য দলকে তাতক্ষনিক সিদান্ত নিতে সাহায্য করে এবং কমান্ড সেন্টারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়।

খিলাফতের সামরিক কাঠামোর বর্তমান প্রয়োগ:

১. সামরিক বাহিনী গঠন: বর্তমান সেনাবাহিনীতে সকলকে নিয়ে একটি হেডকোয়ার্টার গঠন করা হয়। এতে শত্রু যখন হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করে দেয় তখন সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ কমান্ড কাঠামো ভেঙে যায়। কিন্তু মুসলমানদের গঠনটা একটু ভিন্ন; যদি শত্রু হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করে দেয় তখন প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন নিজস্ব কমান্ড কাঠামো ব্যবহার করে যুদ্ধ চালাতে পারে। মুসলমানদের কমান্ড কাঠামো অনেকটা মাকড়সার বাসার মতো। যেমন—সকল ব্যাটালিয়নে থাকা পদাতিক দলের জন্য একটি পদাতিক হেডকোয়ার্টার, আবার সকল ব্যাটালিয়নে থাকা আর্টিলারি দলের জন্য একটি আর্টিলারি হেডকোয়ার্টার। আবার সকল ব্যাটালিয়নে থাকা গোয়েন্দা দলের জন্য একটি গোয়েন্দা হেডকোয়ার্টার। আবার সকল দলের হেডকোয়ার্টার নিয়ে এবং ব্যাটালিয়নে থাকা কমান্ড সেন্টার নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ হেডকোয়ার্টার।

২. সামরিক বাহিনীর প্রধান: বর্তমান সেনাবাহিনীতে সকলের প্রধানকে সেনাপ্রধান বলা হয়। কিন্তু মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধানের নাম হয় ইমামুল জিহাদ। প্রত্যেক সেনাবাহিনীর একটা কোড থাকে। যেহেতু মুসলমানদের সেনাকাঠামো অনেকটা মাকড়সার বাসার ন্যায় তাই সামরিক বাহিনীর কোড হয় ২৯-আনকাবুত। আর বর্তমান সেনাবাহিনীর উক্তি হলো চির উন্নত মম শির, কিন্তু মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর উক্তি হয় আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো অটল।

৩. সামরিক বিন্যাস: বর্তমানে সেনাবাহিনীর ২০০টি ব্যাটালিয়ন আছে, নৌবাহিনী সমমানের ১০টি ব্যাটালিয়ন আছে এবং বিমান বাহিনী সমমানের ৩০টি ব্যাটালিয়ন আছে। বর্তমানে সব মিলিয়ে বাংলাদেশের আনুমানিক ২৫০টি ব্যাটালিয়ন আছে। মুসলিম বঙ্গের ৩১৩টি সামরিক ব্যাটালিয়ন পূর্ণ করতে বাকি ৬৩টি ব্যাটালিয়ন পরিত্যক্ত কিছু স্টেডিয়ামকে সামরিক ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করা হবে। সারা দেশে সামরিক ব্যাটালিয়নগুলো যখন ছড়িয়ে থাকবে তখন দেশের ১০০% নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

খিলাফতের আর্দশ অনুসারে আধা-সামরিক বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রম	দলের নাম	বর্তমান কোর	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সৈন্যদলের কাজ	দল	সৈন্য
১	শুরাতিল খাস	বর্ডার কমান্ডো, পুলিশ সোয়াত, স্পেশাল আনসার	হযরত আলী (রা.)-এর সময় মদিনা এবং কুফার নিরাপত্তার জন্য শুরাতিল খাস নামে একদল বাছাই করা বিশ্বস্ত যোদ্ধা ছিল। এরা খলিফার প্রতি এতটাই অনুগত ছিল যে, তাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খলিফাকে রক্ষা করার শপথ নিতো। হযরত আলী (রা.)-এর রাজনৈতিক সংকটের সময় এরা মদিনার ভেতরের বিশৃঙ্খলা দমনে প্রধান ভূমিকা পালন করত।	৫ টি	৫০ জন
২	আসাস	বর্ডার পেট্রোল, দাঙ্গা দমন ইউনিট, পেরিমিটার গার্ড	হযরত ওমর (রা.)-এর সময় আসাস নামে একদল সৈন্য মদিনা শহরের প্রবেশপথ, কৌশলগত পাহাড়ের গিরিপথ এবং শহরের গুরুত্বপূর্ণ সীমানায় অবস্থান করত। বাইরের কোন শত্রু যাতে অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে এবং ভেতরে কোন দাঙ্গা না ছড়াতে পারে, সেজন্য আসাস ২৪ ঘণ্টা অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করত।	১৩ টি	৩১৩ জন
৩	খায়লাহ	বর্ডার ভারি যান এপিসি ইউনিট, টেকনিক্যাল নজরদারি	হযরত আলী (রা.) নিজে জগদ্বিখ্যাত একজন অশ্বারোহী ছিলেন। হযরত আলী (রা.) অশ্বারোহীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে রাখতেন যারা শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করতে ওস্তাদ ছিল। হযরত আলী (রা.) তাঁর ঘোড়সওয়ারদের নির্দেশ দিতেন যাতে তারা পলায়নপর শত্রুকে পেছন থেকে আঘাত না করে এবং যুদ্ধের ময়দানে অপ্রয়োজনীয় রক্তপাত এড়িয়ে চলে।	৪ টি	৪০ জন
৪	মানজানিক	ভারী গোলাবর্ষণ, টিয়ার গ্যাস/গান ইউনিট, স্ট্যাটিক ডিফেন্স গান	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে মুনজানিক ছিল হেভি আর্টিলারি। মুনজানিকের মাধ্যমে শুধু পাথর নয়, অনেক সময় আগুনের গোলা ছুড়ে দেওয়া হতো যা দুর্গের ভেতরে অগ্নিকাণ্ড ঘটাত। মুনজানিক ব্যবহারের জন্য গণিত এবং প্রকৌশল বিদ্যায় পারদর্শী একটি দল থাকত, যারা হিসাব করে দেখত কত দূরত্বে এবং কোন কোণে পাথর ছুড়লে দেয়ালে সবচেয়ে বেশি আঘাত লাগবে।	৩ টি	৩০ জন
৫	নাক্কাবুন	বর্ডার ইঞ্জিনিয়ার মাইন সুইপার, বোমা ডিসপোজাল, রাস্তা ও ব্রিজ গার্ড	হযরত ওমর (রা.)-এর সময় আলেপ্পো অবরোধের করা হয়। আলেপ্পোর দুর্গটি একটি বিশাল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল। মুসলমানদের আল-নাক্কাবুনরা দল দুর্গের শক্তিশালী পাহাড়ের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করে। তারা মাটির ভেতর দিয়ে অনেকটা পথ গিয়ে দুর্গের ঠিক দেয়ালের নিচে পৌঁছান। দেয়ালের নিচে বড় গর্ত করে তারা সেখানে কাঠের বড় বড় গুঁড়ি দিয়ে দেয়ালটি সাময়িকভাবে আটকে দেয়। পরে সেই কাঠের খুঁটি গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঠগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দেয়ালের বিশাল এক অংশ তার ভারসাম্য হারিয়ে বিকট শব্দে ধসে পড়ে।	২ টি	২০ জন
৬	ইমদাদ	বর্ডার লজিস্টিক সাপ্লাই, পুলিশ সাপ্লাই লাইন, আনসার ভিডিপি রেশন	খিলাফতের সময় ময়দানে মুসলমান যুদ্ধাদের তলোয়ার ভেঙে গেলে বা তীরের মজুদ শেষ হয়ে গেলে, খাসিন বিশেষ দলটি পেছন থেকে দ্রুত নতুন অস্ত্র পৌঁছে দিত। এবং মুসলমানরা কোন এলাকা জয় করার পর সেখানে দ্রুত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে তারা স্থানীয় কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করত এবং বায়তুল মাল থেকে অর্থ দিয়ে খাবার কিনত যাতে সৈন্যদের খাবারের জন্য জনগণের ওপর জুলুম করতে না হয়।	৩ টি	৩০ জন

ক্রম	দলের নাম	বর্তমান কোর	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সৈন্যদলের কাজ	দল	সৈন্য
৭	বালাগ	বর্ডার সিগন্যাল কোড, পুলিশ অয়্যারলেস কন্ট্রোল, সিগন্যাল মেইনটেন্যান্স	খিলাফতের সময় জাজাল দল যুদ্ধের ময়দান থেকে কয়েকশ মাইল দূরে মদিনায় খলিফার কাছে বিজয়ের খবর বা সাহায্যের আবেদন নিয়ে যেতো। জাজালরা দিন-রাত এক করে মরুভূমি পাড়ি দিতেন। একেকজন বার্তা বাহকের কাছে একাধিক ঘোড়া বা উট থাকত, যাতে একটি ক্লান্ত হয়ে গেলে অন্যটি ব্যবহার করা যায়।	১ টি	১০ জন
৮	আসসি	বর্ডার হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল, আনসার প্যারামেডিক	খিলাফতের সময় মদিনার ভেতরে এবং সীমান্তে যারা চিকিৎসা দিতেন তাদের আল-আসসি বলা হতো। আল-আসসি দল যুদ্ধের ময়দানে যখন তলোয়ারের আঘাতে প্রচুর রক্তপাত হতো, তখন তারা খেজুর গাছের ছাল পুড়িয়ে সেই ছাই ক্ষতের ওপর চেপে ধরতো।	১ টি	১০ জন
৯	খাজানাতুস সিলাহ	অস্ত্রাগার, টর্পেডো ও মাইন ডিপো, মিসাইল ও পড মেমোরি, ডগ স্কোয়াড, পুলিশ-ঘোড়া	খলিফাদের আমলে এই দলটির প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র—যেমন তলোয়ার, বর্ম, তীর, ধনুক, ঢাল এবং বল্লম তৈরি ও সংগ্রহ করা এবং নিখুঁত ভাবে খাতায় তালিকাভুক্ত করা। এই দলের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল কোন কমান্ডারের অধীনে কত অস্ত্র জমা আছে, তার স্পষ্ট হিসাব রাখা।	৩ টি	৩০ জন
১০	মিহনা	গ্যারেজ মেরামত, মেইনটেন্যান্স, হ্যাঙ্গার ইঞ্জিনিয়ারিং	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে যুদ্ধের ময়দানে লড়াই চলাকালীন সময় যখন কোন যোদ্ধার তলোয়ার বেঁকে যেত, বর্ম ভেঙে যেত কিংবা ঢাল ক্ষতিগ্রস্ত হতো, তখন মিহনা কারিগরি দল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তা মেরামত করে পুনরায় সচল করে তুলত।	৩ টি	৩০ জন
১১	উয়ুন	বর্ডার গোয়েন্দা, ডিবি, ইন্টেল উইং	আল-উয়ুন সদস্যরা ছদ্মবেশে শত্রু শিবিরের গোপন তথ্য সংগ্রহ করত এবং মদিনার ভেতরে কোন ষড়যন্ত্র চলছে কি না, তার আগাম খবর রাষ্ট্রপ্রধানকে পৌঁছে দিত।	১৫ টি	২৫০ জন
১২	আশ-শুয়র্তা	বর্ডার পুলিশ, থানা পুলিশ, আনসার পুলিশ	হযরত আলী (রা.)-এর আমলে আশ-শুয়র্তা ছিল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান বাহিনী। আশ-শুয়র্তাতের মূল কাজ ছিল শহরের চুরি-ডাকাতি রোধ করা, অপরাধী দের গ্রেফতার করা এবং আদালতের রায় কার্যকর করা।	৭ টি	৩১৩ জন
১৩	নাফফাতুন	বর্ডার পায়ার রেসকিউ টিম, পুলিশ ফায়ার ইউনিট, আনসার ফায়ার সেকশন	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে মুসলিম শিবিরের তাঁবু বা রসদ ভাণ্ডারে শত্রুপক্ষ যদি আগুন ধরিয়ে দিত, তবে নাফফা তুন দল সেই আগুন দ্রুত নেভাতো এবং আটকে পড়া সৈন্যদের উদ্ধার করার কারিগরি কাজ করতো।	১১ টি	২১৩ জন
১৪	খামিস	প্রধান মন্ত্রির নিরাপত্তা বাহিনী ও কারা রক্ষী	হযরত আলী (রা.) যখন খিলাফতের দায়িত্ব নেন এবং কুফাকে রাজধানী করেন, তখন তিনি শরত আল-খামিস নামে একটি বিশেষ বাহিনীটি সুসংগঠিত করেন। যারা মূলত খলিফার ব্যক্তিগত বডিগার্ড হিসেবে কাজ করত এবং যুদ্ধের ময়দানে ফ্রন্টলাইনে থেকে আক্রমণ পরিচালনা করত।	৫ টি	৫০ জন
১৫	দিওয়ানুল ইমারাহ	বর্ডার হেডকোয়ার্টার, পুলিশ লাইন, আনসার কমান্ডার অফিস	মুসলমানদের স্বর্ণযুগে প্রতিটি প্রদেশের আমির বা গভর্নরের প্রধান কার্যালয়কে বলা হতো দিওয়ানুল ইমারাহ। এই দপ্তর থেকে প্রদেশের ভেতরের পুলিশ-শুরাত এবং সীমান্ত রক্ষী ও আসাস-টহল বাহিনীকে সরাসরি পরিচালনা করা হতো।	১ টি	১০ জন
মোট = ১৫-টি শাখা, ৭৭-টি দল, প্রতি ব্যাটালিয়নে ১,৩৯৯ জন সৈন্য, ব্যাটালিয়ন সংখ্যা ৩১৩-টি, হেডঅফিস ১৫-টি					

খিলাফতের আদর্শ অনুসারে আধা-সামরিক বাহিনীর পরিচালনা পদ্ধতি:

১. মুসলমানদের আধা-সামরিক কাঠামোর উৎস: খলিফা ওমর (রা.), যাকে অর্ধপৃথিবীর শাসক বলা হয়। উনি মুসলমানদের শিখিয়ে গেছেন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কীভাবে দেশ পরিচালনা করতে হয়। চার খলিফার রাষ্ট্র পরিচালনা মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। তবে যুগের বিবর্তনের কারণে রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে কিছু ভিন্নতা আসতে পারে, কিন্তু মূল ঠিক রেখে পরিবর্তন করলে মূল রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন হবে না। হজরত ওমর (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। তাঁর শাসন কাঠামোতে শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং সামরিক বিভাগ একে অপরের থেকে স্বাধীন ছিল। মুসলমানদের নিয়ম অনুসারে সামরিক বাহিনীর জন্য আলাদা কোন আইন নেই এবং সরকার বা শাসক নিজেও আল্লাহর আইনের ঊর্ধ্বে নন। এই নিয়মের কারণে এককভাবে কেউ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। ওমর (রা.) কোন সামরিক নেতাকে রাষ্ট্রের চেয়ে শক্তিশালী হতে দেননি। যার বড় উদাহরণ খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)।

খলিফা ওমর (রা.) রাষ্ট্রের মন্ত্রী বা গভর্নর নিয়োগের আগে তাদের সম্পদের হিসাব নিতেন এবং মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালন শেষে তাদের সম্পদ অধিক হারে বৃদ্ধি পেলে তার থেকে তিনের এক অংশ নিয়ে জনগণের কল্যাণে বায়তুল মালে জমা করতেন। তখন মুসলমানদের শাসন পরিচালনার মূল ভিত্তি ছিল কঠোর জবাবদিহিতা। খলিফা ওমর (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তদন্ত বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ তৈরি করেছিলেন এবং জনগণের ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন। খলিফা ওমর (রা.) ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে মন্ত্রীদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করেছিলেন। ওমর (রা.)-এর শাসন মুসলমানদের জন্য মডেল। তিনি একদিকে নবগঠিত ইসলামকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে বিশ্বের দুই পরাশক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বর্তমান বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ভ্যাট-ট্যাক্স ও করের কারণে ভেতর থেকে জর্জরিত। ওমর (রা.)-এর কৌশল অনুসারে সঠিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা করে এবং সময় অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধাক্কা দিলে বাইজান্টাইন ও সাসানীয় সাম্রাজ্যের মতো বর্তমান গণতন্ত্র ভেঙে যাবে। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, আর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তা ভাঙা অনেক সহজ।

খিলাফতের আধা-সামরিক কাঠামোর বর্তমান প্রয়োগ:

১. আধা-সামরিক বাহিনী গঠন: আধা-সামরিক বাহিনীর সেনাপ্রধানের নাম হবে ইমামুল ইমারাহ। আধা-সামরিক বাহিনীর ব্যাটালিয়নের নাম হবে শুবাহ আর ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের নাম হবে আমিরুল শুবাহ। প্লাটুন কমান্ডারের নাম হবে মুহতাসিব, সেকশন কমান্ডারের নাম মুহাফিজ। আধা-সামরিক বাহিনীর কোড হবে ২৩- মুমিন। আধা-সামরিক বাহিনীর উক্তি হবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ। আধা-সামরিক বাহিনীর কাঠামো হবে সামরিক বাহিনীর ন্যায়। এখানে কোন ডিভিশন, রেজিমেন্ট, পুলিশ লাইন ও কোম্পানি থাকবে না। শুধু ব্যাটালিয়ন, প্লাটুন ও সেকশন থাকবে।

২. আধা-সামরিক বাহিনী ব্যাটালিয়ন গঠন: বর্তমান আধা-সামরিক কাঠামোতে প্রতিটি কোরের জন্য আলাদা আলাদা ব্যাটালিয়ন করা হয়। যেমন- ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন যারা আছে সব সম্মুখ যোদ্ধা। কিন্তু মুসলমানদের নতুন আধা-সামরিক কাঠামো হবে সকল প্রয়োজনীয় কোরকে নিয়ে একটা ব্যাটালিয়ন। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে ১৩৯৯ জন সৈন্য থাকবে, ১৫টি শাখা থাকবে। প্রত্যেক শাখার জন্য পৃথক পৃথক হেডকোয়ার্টার থাকবে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস আধা-সামরিক বাহিনীর শাখা হিসেবে কাজ করবে। তবে এদের অবস্থান ব্যাটালিয়নের বাইরে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে এদের কার্যালয় যেখানে আছে সেখানেই থাকবে শুধু পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস আধা-সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। মুসলিম বঙ্গের আধা-সামরিক বাহিনী আমার বিল মারুফ মন্ত্রণালয়ের জন্য কাজ করবে এবং গোয়েন্দা শাখার একটি অংশ প্রধান আমিরের নির্দেশে কাজ করবে।

৩. আধা-সামরিক বিন্যাস: বর্তমানে বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডের ৬৪টি ব্যাটালিয়ন, আর্মড পুলিশের ১৩টি ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড অ্যাকশনের ১৫টি ব্যাটালিয়ন, পুলিশ লাইনস ৬৪টি, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষার ৪৪টি ব্যাটালিয়ন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ৮টি বিভাগীয় সদর দপ্তর মিলে মোট বাংলাদেশে আধা-সামরিক বাহিনীর ২০৮টি ব্যাটালিয়ন আছে। মুসলিম বঙ্গের ৩১৩টি আধা-সামরিক ব্যাটালিয়ন পূর্ণ করতে বাকি ১০৫টি ব্যাটালিয়ন পুরাতন কিছু থানাকে আধা-সামরিক ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করা হবে। পুলিশ আধা-সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকলে দেশে দুর্নীতি ১০০% কমে যাবে।

৪. মুসলিম বঙ্গের নিরাপত্তা: দেশের নিরাপত্তা ফজর থেকে শুরু করে এশা পর্যন্ত সারা দিন পুলিশ ও আনসার বাহিনী নিরাপত্তা দেবে। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত সারা রাত সামরিক বাহিনীর জাইশে ওসামা, রাজ্জালাহ, তাহাসসুস দল নিরাপত্তা প্রদান করবে। তাদের সাথে থাকবে আধা-সামরিক বাহিনীর শুরাতিল খাস, আউয়াস, আল-মায়মুন, উয়ুন দল। সম্মিলিত দুই বাহিনীর নিরাপত্তা দেশকে দিনের থেকে রাতে বেশি নিরাপদ করে তুলবে।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (সা.)-এর জীবনী (কৌশলগত শিক্ষা)

সকল শাসনব্যবস্থার নিজস্ব আইন আছে এবং প্রতিটি শাসনব্যবস্থাই চায় নিজের আইনের ওপর ভিত্তি করে সকল রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করতে। বিশ্বব্যাপী ও দেশব্যাপী শাসনব্যবস্থার নেতৃত্বের জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য। মুসলমানদের রাসূল (সা.) দেশব্যাপী আল্লাহর আইন কায়েমের জন্যই যুদ্ধ করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আগের ৪০ বছর তিনি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আল-আমিন হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর যখন তিনি আল্লাহর দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, তখন তৎকালীন কাফেররা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিতে শুরু করে এবং মুসলমানদের ওপর কাফেররা অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে।

রাসূল (সা.) কাফেরদের নির্যাতনের মুখেও কখনো বিশৃঙ্খল পথ বেছে নেননি। রাসূল (সা.) মক্কার দরজা ভাঙচুর করেননি, রাস্তা বন্ধ করে জনগণের সম্পদের ক্ষতি করেননি কিংবা কোন সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টাও করেননি। তবে রাসূল (সা.) বিভিন্ন গোত্রের সামরিক শক্তির খোঁজ নিতেন। রাসূল (সা.) সাহাবীদের মক্কার দূর পাহাড়ে গিয়ে ঘাঁটি গড়তে বলেননি, কারণ পাহাড়ে গিয়ে যুদ্ধ করা সহজ হলেও তা ছিল কাফের শাসকদের পদ্ধতি—যা বর্তমানের ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে দেখা যায়। ইসলামে প্রচার বন্ধ করতে কাফেরা রাসূল (সা.)-কে কাবার ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো। কিন্তু রাসূল (সা.) কাবার ক্ষমতা গ্রহণ করেননি। মুসলমানরা এর থেকে শিক্ষা পায় যে ভুল উপায়ে আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- হতে পারে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের নামে খ্রিষ্টান নিয়মে নির্বাচন।

কাফেরা শত বাধা দিয়েও রাসূল (সা.)-মের দাওয়াত বন্ধ করতে পারেনি। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াত পেয়ে ইয়াসরিব থেকে আসা একদল যুবক ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়, যা আকাবার প্রথম শপথ হিসেবে পরিচিত। আকাবার প্রথম শপথের এক বছর পর আবার একটি চুক্তি হয়, যাকে আকাবার দ্বিতীয় শপথ বলে। দ্বিতীয় শপথের কয়েকটি চুক্তির মধ্যে একটি চুক্তি ছিল কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে তারা রাসূল (সা.)-কে নিজেদের নারী ও শিশুর মতো হেফাজত করবে। আকাবার শপথকারীরা ছিলেন মূলত মুসলমান ও সক্ষম যোদ্ধা। রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতের কারনে। যখন মক্কার কাফেরদের নির্যাতন চরমে পৌঁছালো, তখন রাসূল (সা.) সবাইকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হিজরত মানে নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য শাসকের এলাকায় যাওয়া, পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করা নয়। রাসূল (সা.) হিজরতের জন্য দুই ধরনের স্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন: ১. যেখানে ন্যায়পরায়ণ শাসক আছে, ২. যেখানে মুসলমান ও তাদের সামরিক সক্ষমতা আছে।

হিজরতের প্রথম দিকে রাসূল (সা.) সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় পাঠান কারণ সেখানকার রাজা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তবে রাসূল (সা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত না করে ইয়াসরিব বা মদিনায় হিজরত করেন। রাসূল (সা.)-এর মদিনার হিজরতকে সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যবেক্ষণ করলে, মদিনায় হিজরতের পাঁচটি কারণ উঠে আসে: ১. মদিনাতে নিরাপত্তা ছিল। ২. যুদ্ধের অস্ত্র মজুদ করা যাবে। ৩. সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া যাবে। ৪. ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সুবিধা পাওয়া যাবে। ৫. যেকোন সময় যুদ্ধ করা যাবে।

রাসূল (সা.) এই পাঁচটি সুবিধা মদিনাতে পেয়েছিলেন এবং সে কারণেই রাসূল (সা.) মদিনাতে হিজরত করেছিলেন। মদিনায় যাওয়ার পর তিনি মক্কার কাফেরদের বাণিজ্যিক কাফেলায় হামলা শুরু করেন। যেমন- বর্তমানের বড় কোম্পানি, টোলপ্লাজা ও গ্যাসফিল্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উৎসগুলো। বাণিজ্যিক কাফেলায় হামলা করার কারণে কাফেররা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এবং তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বদরের যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে অল্প সৈন্য ও রসদ মাধ্যমে মুসলিমদের বিজয় দান করেন। হিজরতের পর থেকে রাসূল (সা.) আল্লাহর আইন অনুযায়ী মদিনাকে পরিচালনা শুরু করেন। মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থার সাফল্য ও সৌন্দর্য দেখে কাফেররা হিংসাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা, তা মদিনা রাষ্ট্র কাঠামোর মাধ্যমেই প্রমাণিত। কেবল মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমেই মুসলমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন আনা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করা সম্ভব।

মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ (সাহাবাদের রাজনীতি)

রাসূল (সা.) হলেন মুসলমানদের আদর্শ, আর রাসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ হলেন মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ। রাসূল (সা.) যখন হিজরত করে মদিনাতে গিয়েছিলেন, তখন থেকে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেছেন, দল পরিচালনা করেননি। অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রের মতো মন্ত্রীপরিষদ ছিলো, যাকে ওয়ালি বলে। রাসূল (সা.) নির্মিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সাহাবীগণ বিশ্বনেতৃত্বে পৌঁছিয়েছেন, তাই সাহাবাগণ মুসলমানদের রাজনৈতিক আদর্শ। সকল নবী, রাসূল ও সাহাবাগণের রাজনীতি ছিলো অভাবগ্রস্ত ও দুর্বলদেরকে নিয়ে, যার যাকাত প্রথা ও সূরা আবাসা-র মাধ্যমে জানা যায়। রাসূল (সা.)-মের সাহাবীগণ গরিবের খোঁজ-খবর নিতেন, এতিমের পাশে থাকতেন। ধনবানদের থেকে অর্থ নিয়ে গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। সাহাবাগণের রাজনীতিতে আল্লাহর আইন ছিল সর্বোচ্চ এবং আল-কোরআন ও সুন্নাহ ছিল সকল আইনের উৎস। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহাবাগণ শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও নীতির ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করতেন। সাহাবীগণ, বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদিনের (প্রথম চার খলিফা) শাসনামলে, ন্যায়বিচার (ইনসাফ) প্রতিষ্ঠা ছিল প্রধান লক্ষ্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর মতো সাহাবীগণ ন্যায়বিচারের উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ যোগ্যতা ও আল্লাহভীতিকে প্রাধান্য দিতেন। ক্ষমতা বা পদের জন্য লোভী ব্যক্তিকে নেতা নির্বাচন করা হতো না, বরং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হতো। সাহাবীগণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শূরা- পরামর্শ গ্রহণ করতেন। জনগণের কল্যাণ ও অকল্যাণ সুষ্ঠু এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে—এই বিশ্বাসে সাহাবীগণ শূরা পদ্ধতির ওপর জোর দিতেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর জীবন ছিল নবীর আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সাহাবীগণ সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলতেন এবং রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। সাহাবীগণের জীবন ছিল নবীর-আদর্শের পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ অনুকরণ। আল্লাহর উপর এবং ইসলামের আইনসমূহে সাহাবীগণ অটল বিশ্বাসী ছিলেন। এর জন্য সাহাবীগণ কাফেরদের যেকোন জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। সাহাবীগণ মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করতেন। সাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের চেয়ে অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এটি ছিল সাহাবীগণের স্বভাবগত অভ্যাস। সাহাবীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর হলেও নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর উম্মতের শ্রেষ্ঠতম দল সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-রা ছিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মুসলমানদের জন্য ঈমানের মাপকাঠি। সাহাবীগণের ঈমানের অনুসরণ-অনুকরণ করাকে প্রত্যেক মুসলমানের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

সাহাবায়ে কেরাম হলেন মুসলমানদের ঈমানের মাপকাঠি। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। ধরুন, আপনি একটি টেবিলের ওপর একটি বোতল রাখলেন। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়—এই বোতলটি ছোট না কি বড়? আপনি নিশ্চিতভাবে কোন উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ ছোট বা বড় হওয়ার বিষয়টি আপেক্ষিক। কিন্তু যখন ওই বোতলটির পাশে আমি আরও একটি বড় বা ছোট বোতল রাখব, তখনই কেবল আপনি তুলনা করে বলতে পারবেন আগের বোতলটি আসলে কতটুকু বড় বা ছোট। এই দ্বিতীয় বোতলটিই হলো প্রথম বোতলের জন্য মাপকাঠি।

ঠিক তেমনিভাবে, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে অনেক দল ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের এই বিভক্তির ইতিহাসে ঈমানদার যদি নিজেদের এককভাবে বিচার করে, তবে ঈমানদার সত্য না কি মিথ্যার ওপর আছে, তা কখনোই সঠিকভাবে বুঝতে পারব না। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হলেন ঈমানদাদের সেই পরম মাপকাঠি। ঈমানদারদের বিশ্বাস আমল এবং আদর্শকে যখন মুসলমানরা সাহাবাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখব, তখনই কেবল মুসলমানরা বুঝতে পারব তারা সঠিক পথে আছি কি না। বোতলের উদাহরণের মতো,নিজের ঈমানকে সাহাবাদের ঈমানের পাশে রাখলেই কেবল সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রাসূল (সা.)-এর জীবনীর আলোকে মুসলমানদের করণীয় (ইসলামিক কৌশল)

বাংলাদেশের মুসলমানরা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চায়। মুসলমানদের এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির, আর জাতির ঐক্যের জন্য অপরিহার্য ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার। ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি মদিনা রাষ্ট্র। রাসূল (সা.) যেভাবে মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন, বর্তমান মুসলমানদের সেই সুন্নাহর সাথে মিল রেখেই কাজ করতে হবে।

রাসূল (সা.)-মের মদিনা রাষ্ট্র গঠনের সাতটি ধাপ ছিল: ১. তিনি ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। ২. হিজরতের কৌশলগত স্থান নির্ণয় করেন। ৩. হিজরতের পূর্বে আকাবার শপথ বা সামরিক চুক্তি করেন। ৪. চূড়ান্ত হিজরত করেন। ৫. মদিনাতে ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শুরু করেন। ৬. শত্রুর বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা করেন। ৭. সময় ও কৌশল অনুযায়ী সম্মুখ বদর -যুদ্ধ করেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের করণীয়:
১. ইসলামের দাওয়াত: ইসলামের দাওয়াতের কাজ বর্তমানে ব্যাপকভাবে চলছে এবং এটি কিয়ামত পর্যন্ত একটি চলমান প্রক্রিয়া।

২. হিজরতের কৌশলগত স্থান নির্ণয়: বাংলাদেশের থেকে অনেক দূরে কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের দেশে হিজরত করা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই রাসূল (সা.)-এর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই বাংলাদেশের জন্য কার্যকর, দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে যেখানে নিরাপত্তা আছে, সমরাস্ত্র মজুদ করা যাবে ও সামরিক প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং যুদ্ধের সময়োপযোগিতা বিবেচনা করলে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আরাকানকে একটি উপযুক্ত স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে মজলুম আরাকানি মুসলমানরা বিদ্যমান।

৩. হিজরতের পূর্বে সামরিক চুক্তি: রাসূল (সা.) যেমন মদিনার আনসারদের সাথে আকাবার শপথ করেছিলেন, তেমনি আরাকানের মুজাহিদদের সাথে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তি করা প্রয়োজন। চুক্তির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হলো:
ক. আল-কোরআন ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করতে হবে।
খ. সকল বাংলাদেশের মুজাহিদকে সপরিবারে আরাকানের নাগরিকত্ব প্রদান করতে হবে।
গ. বাংলাদেশের মুজাহিদদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
ঘ. বাংলাদেশের মুজাহিদগণ সামরিক বাহিনীর অংশ হবেন এবং তাদের নিজস্ব স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি থাকবে।
ঙ. বাংলাদেশের মুজাহিদদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্রের জোগান দিতে হবে।
চ. চুক্তি অনুসারে শাসনব্যবস্থা, নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার মৌলিক শর্তসমূহ কখনো পরিবর্তন বা নবায়নযোগ্য হবে না।
ছ. বাংলাদেশের কোন মুজাহিদ আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণ করবে না।
জ. বাংলাদেশে ভিত্তিক মুজাহিদ বাহিনীর জন্য আলাদা কমান্ডার থাকবে।
ঝ. বাংলাদেশের কমান্ডাররা আরাকানের মূল কমান্ডারের আদেশ পালন করবেন।
ঞ. বহিরাগত বা অন্য স্থান থেকে আসা মুজাহিদগণ কখনোই আরাকানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবেন না।
ট. আরাকান যুদ্ধের মূল কমান্ডার অবশ্যই আরাকানি মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে।
ঠ. যুদ্ধের চলমান ব্যয়ভার উভয় পক্ষ যৌথভাবে বহন করবে।
ড. কোন প্রকার অত্যাচারী বা অপরাধী ব্যক্তিকে প্রশ্রয় ও আশ্রয় দেওয়া যাবে না।
ঢ. চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষের বিরুদ্ধে কেউ আক্রমণ করলে সবাই সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

৪. চূড়ান্ত হিজরত ও সঠিক দল নির্বাচন: মুসলমানদেরকে আরাকানে হিজরতের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে। দীর্ঘ ৫০ থেকে ১০০ বছর আরাকান মুসলমানরা সভ্যতার ছোঁয়া ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকায় অনেকের আচরণ ও মানসিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। আরাকান মুসলমানদের চারিত্রিক সংশোধন এবং মদিনা রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করা বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব। আরাকানে বর্তমানে বেশ কিছু সক্রিয় দল রয়েছে, যাদের মধ্য থেকে বাংলাদেশকে সঠিক দলটি বেছে নিতে হবে। সঠিক দলের মানদণ্ড হবে—যারা সুন্নাহ মোতাবেক চলে, যাদের কপালে সালাতের চিহ্ন আছে, যারা মানুষের প্রতি দয়ালু এবং যারা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াইরত, তারাই মূলত মুসলমান দল।

সঠিক দল চেনার জন্য নিজের আমল সংশোধন জরুরি; কারণ আমি ভুল পথে থাকলে ভুল দলেই অন্তর্ভুক্ত হবো। আরাকানের কিছু আলেম হকের পক্ষে কথা বলেন না বা নিজেরা হকের জন্য লড়াই করেন না, ফলে তাদের পক্ষে সঠিক দল চেনা কঠিন। তাই প্রকৃত মুসলমান বাহিনী যাচাই করতে প্রয়োজনে ১-২ বছর সময় নিতে হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে হবে, কারণ কিতাবি ডিগ্রির চেয়ে ময়দানের বাস্তব জ্ঞানই মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে বেশি কার্যকর। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন মুসলমান হও।-আল ইমরান: ১৩৯

কেন মুসলমানদের আরাকানে হিজরত প্রয়োজন:
ক. ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তা: বাংলাদেশে ভারত ও আমেরিকার আসন্ন আগ্রাসন ও হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে একটি নিরাপদ কৌশলগত অবস্থান তৈরি করা।

খ. কৌশলগত সুরক্ষা: ভারত ও আমেরিকাকে মোকাবিলা করার সময় নিজেদের শারীরিক নিরাপত্তার জন্য তাবলীগকে এবং ঢাল হিসেবে অন্যান্য ইসলামি দলকে ব্যবহার করা। এতে মুসলিম বঙ্গ পুনর্গঠনের সময় মুসলমানদের অন্য কোন গোষ্ঠী বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। মুসলমান শক্তিকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে আরাকানে হিজরত অপরিহার্য।

গ. নেতৃত্বের সুরক্ষা: যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকাই বড় বিজয়। মুসলমান নেতারা জীবিত আছেন—এই চিন্তাটি কাফেরদের জন্য আতঙ্কের কারণ। তাই নেতারা নিরাপদ স্থানে অবস্থান কাফেরদের মনে ত্রাস বজায় রাখে।

ঘ. আল্লাহর প্রতিনিধির সুরক্ষা: আল্লাহর প্রকৃত প্রতিনিধি তিনিই, যাঁর ভয়ে অপরাধী ও রাসুল (সা.)-এর কুৎসা রটনাকারীরা ভীত হয়। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে এমন নেতৃত্ব দেখা গেছে, যারা কেবল সঠিক সময়ে হিজরত করে নিরাপদ স্থানে সরে না যাওয়ার কারণে শত্রুর হাতে শহীদ হয়েছেন। তারা জীবিত ও নিরাপদ থাকলে শত্রুপক্ষ সবসময় আতঙ্কে থাকত।

ঙ. সামরিক শক্তি পুনর্গঠন: বর্তমান সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ইসলামিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং নতুন মুজাহিদদের জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র নিশ্চিত করার জন্য আরাকানে হিজরত করা।

চ. নেতৃত্বের নিরাপত্তা: ইসলামিক সরকারের মন্ত্রীদেরকে শত্রুর খাঁচা থেকে সরিয়ে নিরাপদ ও দুর্ভেদ্য অবস্থানে রাখার জন্য আরাকানে হিজরত করা।

৫. ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সূচনা: রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করার পরপরই সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা শুরু করে ছিলেন। বর্তমান সময়ে মুসলমানদের জন্যও মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করা অপরিহার্য। মুসলমানদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয়... কাফেরদের ক্রোধের বিনিময়ে মুসলমানদের জন্য নেক আমল লেখা হয়। (আত-তাওবা: ১২০)

কেন মুসলমানরা মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করবে:
ক. আমিরাত প্রতিষ্ঠা: মুসলমানদের পূর্বপুরুষগণ দাওয়াতের মাধ্যমে অগণিত মুসলমান এবং মসজিদ-মাদ্রাসার মতো সম্পদ রেখে গেছেন। এখন সময় এসেছে এই সম্পদগুলোকে কাজে লাগিয়ে মদিনা রাষ্ট্রের আদলে মুসলিম বঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার। কেবল পূর্বপুরুষদের মতো দাওয়াতের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকা মানে মদিনা রাষ্ট্রকে পিছিয়ে দেওয়া। বর্তমান সরকারের শিকড় উপড়ে ফেলতে এবং তাদের ওপর পূর্ণ নজরদারি করতে একটি সমান্তরাল ইসলামিক সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

খ. মুমিন ও মুনাফিকের সীমারেখা: বাংলাদেশে কাফেরের চেয়ে মুনাফিকের সংখ্যা বেশি। মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টানা প্রয়োজন, যার একপাশে থাকবে সত্যনিষ্ঠ মুসলমান এবং অন্যপাশে সুবিধাবাদী মুনাফিকরা। এই বিভাজন রেখা ছাড়া খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রের রাজনীতি বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়।

গ. খ্রিষ্টানদের জঙ্গি রাজনীতির অবসান: বর্তমান দলভিত্তিক রাজনীতি খ্রিষ্টানদের তৈরি। দল পদ্ধতিতে কাফেরা যাকে ইচ্ছা জঙ্গি তকমা দিয়ে দমন করে এবং জনগণকে আতঙ্কিত রাখে। কেবল সামরিক অভিযান দিয়ে রাষ্ট্র কায়েম হয় না—এটিও একটি ভুল ধারণা। তালেবানরা যেমন কাবুল বিজয়ের আগেই অন্যান্য প্রদেশগুলোকে রাষ্ট্রের ন্যায় পরিচালনা করত, আমাদেরও তেমনি নিজস্ব রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ঘ. নতুন জনবল ও কাঠামো তৈরি: ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুনাফিকি করে এবং বিদ্যমান সামরিক শক্তি ব্যবহার করে যারা মদিনা রাষ্ট্র চালু করতে চেয়েছেন, তারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং প্রাণ হারিয়েছেন, যেমন-মিশর। বাংলাদেশকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে কাফেরদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্মী বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন কর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য মুসলিম বঙ্গের সরকার ব্যবস্থা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

ঙ. বিকল্প সিংহাসন নির্মাণ: বাংলাদেশের মুসলমানদের উদ্দেশ্য কাফেরদের তৈরি ইবলিশি সিংহাসনে বসা নয় বরং আল-কোরআনের আইন অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব সিংহাসন তৈরি করা। মুসলমানদের সিংহাসন বর্তমান গণতান্ত্রের সিংহাসনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

চ. রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার: বর্তমান রাজনীতি কাফেরদের তৈরি, তাই মুসলমানরা কাফেরদের রাজনৈতিক চালে ব্যস্ত আছে। পরিস্থিতির মোড় মুসলমানদের অনুকূলে আনতে হলে নিজস্ব নতুন রাজনীতির কোন বিকল্প নেই।

ছ. পরিচালনা: এই জমিন, ব্যাংক, স্কুল, হাসপাতাল ও জনগণ—সবই আল্লাহর এবং মুসলমানদের প্রাপ্য। বর্তমানে ইবলিশের অনুসারীরা এগুলো পরিচালনা করছে। নতুন করে সব তৈরির বদলে বিদ্যমান সম্পদগুলো থেকে ইবলিশি শক্তিকে সরিয়ে দিয়ে মুসলমানরা পরিচালনা শুরু করবে। সবকিছু পরিচালনা করা সম্ভব কেবল সুসংগঠিত সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

জ. নেতৃত্ব নির্বাচন: দলের নেতা কখনো গোটা জাতির নেতা হতে পারে না। গণতন্ত্র কেবল দলের অনুগত নেতা তৈরি করে, যা স্বৈরাচার ও সুদি মহাজনদের জন্ম দেয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতির ফলে সাধারণ মুসলমান মুনাফেকির পথে ধাবিত হয়। এখন সময়ের দাবি খ্রিষ্টানদের রাজনৈতিক মঞ্চের বিপরীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি করা।

ঝ. মুজাহিদ বাহিনী: যারা হিজরত করবে তাদের পরিবারের নিরাপত্তা, মুজাহিদদের রিজার্ভ রাখা এবং রাষ্ট্রের দাপ্তরিক কাজ সচল রাখতে মুসলিম বঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা জরুরি। এমনকি কাফেররা যদি শীর্ষ নেতাকে হত্যাও করে, মুসলিম বঙ্গের রাষ্ট্র কাঠামোর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন নেতা তৈরি হবে, যাতে মুসলমান জাতি কখনো নেতৃত্বশূন্য না হয়।

ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করার জন্য মুসলমানদের করণীয়:

ক. মন্ত্রণালয় গঠন: শূরা পদ্ধতির ভিত্তিতে সর্বোচ্চ তেত্রিশ (৩৩) সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রণালয় গঠন করা। এই মন্ত্রণালয় একটি শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামোর হিসাবে কাজ করবে।

খ. ধর্মীয় বৈধতা: মুসলিম বঙ্গের সরকার ব্যবস্থাটি একটি সংগঠন রূপে পরিচালিত হবে, যার নাম হবে-সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। মুসলিম বঙ্গের সরকারের সত্যতা, স্বচ্ছতা ও ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য শূরা সদস্যগণ দেশের সর্বজনমান্য শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সামনে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করবেন। যেমন- আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।

গ. সরকারি নিয়োগ: মুসলিম বঙ্গের শূরা সদস্যদের মধ্য থেকে যাকে যে মন্ত্রণালয়ের আমির হিসেবে নিযুক্ত করা হবে, তাঁর নাম ও পদবিসহ একটি আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র তৈরি করা। এবং (খ) নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আলেমদের উপস্থিতিতে সেই পত্রে স্বাক্ষর নেওয়া। এই নিয়োগপত্রটি বাংলা ও আরবি উভয় ভাষায় হবে, যাতে ভবিষ্যতে এর বৈধতা ও ভিত্তি নিয়ে কোন সংশয় না হয়।

ঘ. মুসলমানদের রাজনীতি: মুসলিম বঙ্গের নিযুক্ত প্রত্যেক আমিরকে ৫ থেকে ৭টি করে মডেল মসজিদের দায়িত্ব প্রদান করা। প্রতেক আমির দায়িত্বপ্রাপ্ত মসজিদে নবীদের আদর্শের ভিত্তিতে রাজনীতি করবেন এবং জনগণের সেবার মাধ্যমে নিজেদের জনপ্রিয় করে তুলবেন।

ঙ. কৌশলগত অবস্থান: ইসলামিক সরকারের আমিরগণ বর্তমান প্রশাসনের কাছে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে উপস্থাপন করবেন। এই বক্তব হবে আমিরগণের কৌশলগত অবস্থান, যাতে মূল লক্ষ্য অর্জনের আগে কোন বাধা না আসে। কিন্তু সাধারণ মুলমানদের নিকট সঠিক পথ উপস্থাপনা করবেন।

চ. গণতন্ত্রের পতন: তুমি বাঁচাও তোমার জাতি, তুমি সাজাও তোমার দেশ—এই মূলমন্ত্র নিয়ে মুসলমানদের এগোতে হবে। ইতিহাস বলে কেউ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করে না; শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটাতে হলে ক্ষমতা বুঝে নিতে হয়। মুসলমানদের বর্তমান কাজ হবে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হলে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা মডেল মসজিদ কেন্দ্রিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করবেন এবং জনগণের কাছে তার ইসলামিক সমাধান তুলে ধরবেন। ইসলামিক সমাধানের মাধ্যমেই আমিরগণ ধাপে ধাপে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কাজ বুঝে নেব। ইসলামিক সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে আমিরগণ বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে চারপাশ থেকে ঘেরাও করব যাতে বাংলাদেশে ইহুদী- খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রের পতন ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়।

৬. বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা ও অর্থনৈতিক কৌশল: রাসূল (সা.) মদিনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলাতে হামলা করেছিলেন। সেই সুন্নাহর আলোকে বর্তমান ব্যবস্থার সামরিক, আধা-সামরিক ও অভ্যন্তরীণ বাহিনীর ঐক্যের মূল ভিত্তি অর্থ ব্যবস্থা দুর্বল করে দিতে হবে। বর্তমান বাহিনী যখন পর্যাপ্ত অর্থ পাবে না, তখন তাদের দমন-পীড়ন ও শাসনের শক্তি কমে যাবে।

বর্তমান সরকারের বাণিজ্যিক লক্ষ্যবস্তু এবং মুসলমানদের কৌশল:
ক. গার্মেন্টস ও গ্যাস খাত: বর্তমান সরকার রেমিট্যান্স আয় করছে গার্মেন্টস শিল্পে কম দামে গ্যাস দিয়ে, যেখানে সাধারণ মুসলমানদের বেশি দামে এলপিজি কিনতে হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা।

খ. ব্যক্তিগত আয়কর: সাধারণ মুসলমানদের মাসিক আয়ের ওপর বর্তমান সরকার যে কর বসাচ্ছে, তাকে মুসলমানদের সম্পদ লুট হিসেবে চিহ্নিত করে জনমত গড়ে তোলা এবং যারা আয়কর দিয়ে খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখবে তারা মুনাফিক।

গ. গ্রুপ কোম্পানি ও ব্যাংক-বীমা: বর্তমান গ্রুপ কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া ব্যবসার কারণে মুসলমান যুবকরা নতুন ব্যবসা করতে পারছে না এবং গ্রুপ কোম্পানি পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে সিন্ডিকেট তৈরি করে, তা জনগণের সামনে তুলে ধরা।

ঘ. ভ্যাট ও বহুমুখী কর: সাধারণ মুসলমানের এক মাসের আয় থেকে বর্তমান সরকার বারবার কর নিচ্ছে। যেমন—প্যাকেটজাত পণ্য, টোল, খাজনা, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল থেকে বারবার করের নামে খাজনা আদায় করছে। এক মাসের আয় থেকে বারবার কর নেওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ অভাবী হচ্ছে। বর্তমান সরকারের কর প্রথার বিরুদ্ধে মুসলমানদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করা।

ঙ. পাসপোর্ট ও নবায়ন ফি: রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের পাসপোর্ট নবায়ন ফি মওকুফের দাবি তোলা এবং শ্রমিক প্রবাসীদের থেকে বর্তমান পাসপোর্ট ফি আদায়কে জুলুম হিসেবে সাব্যস্ত করা।

চ. ভ্রমণ কর: বিদেশে কর্মরত শ্রমিক রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য স্থল, জল ও আকাশপথে ভ্রমণ কর তাদের সম্মানে মওকুফ করার দাবি তোলা এবং তাদেরকে উন্নত চিকিৎসা ফ্রি করে দেওয়া।

ছ. সরকারি দুর্নীতি দমন: সরকারি কর্মচারীরা নিজেদেরকে ব্রিটিশ রাজা মনে করে। ব্রিটিশ রাজা শব্দ জনগণের মনে গেঁথে দিয়ে বর্তমান সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মারমুখী মানসিকতা সৃষ্টি করা।

জ. ইলিশ রপ্তানি: মুসলমান জেলেদের পেটে লাথি দিয়ে হিন্দুদের পূজায় কম দামে ইলিশ পাঠানোর ইস্যুটিকে সরকারের মুসলমান বিরোধী অবস্থান হিসেবে তুলে ধরা।

ঝ. ট্রাফিক জরিমানা ও ইনস্যুরেন্স: বর্তমান সরকার গাড়ির মামলা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের পেটে লাথি মারে এবং ইনস্যুরেন্সের নামে মুসলমানদের টাকা দিতে বাধ্য করে। এই খাজনার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা।

ঞ. পরিবেশ ও শিল্প বর্জ্য: বর্তমানে গার্মেন্টস, ডাইং ও চামড়া শিল্পের কোম্পানিগুলোর বিষাক্ত বর্জ্য নদীতে ফেলার কারণে মাছ উৎপাদন কমেছে; যার ফলে সাধারণ মুসলমানের অভাবে দিন কাটচ্ছে। কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা।

ট. রাজনৈতিক দলের আয়: ইসলামিক সরকার শুধু বাইতুল মাল নাম দিয়ে মুসলমানদের থেকে অর্থ আদায় করতে পারবে। বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দল এই নাম ব্যবহার করতে পারবে না।

ঠ. সরকারি জমি: এই জমিন আল্লাহর, অথচ বর্তমান সরকার মুসলমান বাস্তুহারাদের জমি দেয় না। সরকার নিজের কার্যালয়ের জন্য ব্রিটিশ নিয়মে বড় বড় জমি দখল করে। সরকারি পরিত্যক্ত জমি পাওয়া মুসলমানদের নৈতিক অধিকার।

ড. ইন্টারনেট ব্যবস্থা: ইন্টারনেট হলো খ্রিষ্টানদের আধিপত্য, পর্নোগ্রাফি, যিনা, পরকীয়া, জুয়া এবং ইবলিশের প্রচারণার প্রধান মাধ্যম। মুসলমানদের এই ফিতনা থেকে বাঁচাতে হলে সমুদ্রের নিচের অপটিক্যাল কেবল ধ্বংস করতে হবে।

ঢ. এনজিও ও সুদ কোম্পানি: সুদে টাকা নেওয়া ব্যক্তিদের কিস্তি বা টাকা ফেরত না দিতে উৎসাহিত করা এবং সুদের অফিসগুলোকে ধ্বংস করা। সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মুসলমানরা কি যুদ্ধের ঘোষণা শুনে যুদ্ধ করবে না?

ণ. বৈদেশিক ঋণ: উন্নয়নের নামে নেওয়া আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের ঋণের টাকা বর্তমান মন্ত্রীরা খ্রিষ্টানদের দেশে পাচার করে। মুসলমানদের টাকা দিয়ে বর্তমান মন্ত্রীরা খ্রিষ্টানদের উন্নয়ন করছে—এই তথ্য সাধারণ মুসলমানের সামনে তুলে ধরা।

৭. সময় অনুযায়ী যুদ্ধ এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয়: বর্তমান ঘুণেধরা গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলে কাফেররা অবধারিতভাবে মুসলমানদের ওপর চড়াও হবে, যা যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এই যুদ্ধের ক্ষেত্রের ফলে একদিকে কাফের শক্তি দুর্বল হবে, অন্যদিকে ঈমানদার মুসলমানরা কৌশলগতভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

মুমিন মুসলমানরা কেন যুদ্ধ করবে:

ক. মদিনা রাষ্ট্র পুনরদ্ধার: যুদ্ধ ছাড়া কোন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধহীন অবস্থায় বহু মত ও পথের সৃষ্টি হয়, যা ভবিষ্যতে বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। তাই একটি চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য যুদ্ধের কোন বিকল্প নেই।

খ. স্বল্প সংখ্যায় বিজয়ের ইতিহাস: বড় যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকলে ছোট ছোট বাধাগুলো সহজেই ডিঙানো যায়। মুসলমানদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসলমানরা সবসময় কম সংখ্যা নিয়েই বড় বড় বাহিনীকে পরাজিত করে। যেমন—তালুত ও জালুতের যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ, হুনাইন যুদ্ধ এবং আইন জালুতের যুদ্ধ।

গ. শক্তি সঞ্চয়: আরবদের সাথে মাত্র ৬ দিনের যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইসরায়েল আজ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ মূলত একটি শক্তির সক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়, যা ইসরায়েলকে বেপরোয়া করে তোলে।

ঘ. আল্লাহর আইন: মুসলিম বঙ্গের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা এবং মদিনা রাষ্ট্রের আলোকে দেশ পরিচালনার সকল কার্যক্রম প্রকাশ্যে চালু করার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধ অপরিহার্য।

ঙ. খ্রিষ্টানদেকে চ্যালেঞ্জ: বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানানো এবং মুসলিম বঙ্গকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

চ. মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য: যুদ্ধের ময়দানই হলো একমাত্র জায়গা যেখানে ছদ্মবেশী মুনাফিক এবং সত্যনিষ্ঠ মুমিনদের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

ছ. নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা: নতুন সামরিক বাহিনী গঠন এবং সমাজের আলেম, মুফতি ও ইমামদেরকে প্রকৃত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধই পথ তৈরি করে দেবে।

জ. আত্মসমর্পণ: বর্তমান সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করা এবং সেনানিবাস ও থানাগুলোকে ইসলামিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন।

খ্রিষ্টান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান এবং গাজওয়াতুল হিন্দ: খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার তাণ্ডবে আজ ৯০ শতাংশ মুসলমান ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে। বাংলাদেশে ইসলামের দাওয়াহ এবং মুমিন—উভয়ই আছে। এখন মুসলমানদের প্রধান কাজ হলো হিজরতের প্রস্তুতি নেওয়া এবং রাসূল (সা.)-এর ইঙ্গিত অনুযায়ী হিজরতের স্থান চূড়ান্ত করা। ইনশাআল্লাহ, হিজরতের স্থান চূড়ান্ত হলে সেখানে অবস্থানরত প্রস্তুত মুজাহিদদের নিয়ে মুসলিম বঙ্গের মানচিত্র অনুযায়ী মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালুর জন্য যুদ্ধ শুরু হবে। মুসলমানরা যখন মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করতে যাবে, তখন ভারত ও আমেরিকা মুসলমানদের ওপর হামলা করবে। ভারত ও আমেরিকার এই বৃহৎ হামলাই হয়তো সেই কাঙ্ক্ষিত গাজওয়াতুল হিন্দ।

ভারত যখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, তখন মুসলিম বঙ্গের মুমিনরা আরাকান এবং কাশ্মীরের মুজাহিদদের দিয়ে দুই দিক থেকে সাঁড়াশি আক্রমণ চলবে। ইনশাআল্লাহ এতে কাফের বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পরাজিত হবে। মূলত আরাকান যুদ্ধের মাধ্যমেই গাজওয়াতুল হিন্দ যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে, এখন শুধু যুদ্ধের বিস্তার বাকি। জাতিসংঘ ও কাফিররা এই সত্য গোপন করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন: বরং আল্লাহ সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করে, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, ফলে মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সূরা আম্বিয়া: ১৮)

মুসলিম বঙ্গের ইসলামিক রাজনীতি (মুসলমানদের রাজনীতি)

ইসলামিক সরকার গঠনের পরে মুসলমানরা কীভাবে সমাজে রাজনীতি করবে, কীভাবে জনগণের নিকট দাওয়াহ প্রদান করবে এবং কোন শ্রেণির জনগণকে আগে দাওয়াহ দেবে, তা ঠিক করতে হবে। মুসলমানরা রাজনীতি সাজাবে সাহাবিদের রাজনৈতিক আদর্শকে অনুসরণ করে। মুসলমানদের রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জনগণকে আল-কোরআনের দিকে নিয়ে যাওয়া, যাতে জনগণ মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন মনে না করে। মুসলমানদের রাজনৈতিক কৌশল হবে এমন—যেখানে একদিকে বর্তমান সরকারের ওপর জনগণের ঘৃণা জন্মাবে, অন্যদিকে মুসলিম বঙ্গকে তারা ভালোবাসবে।

বর্তমান রাজনীতি মুসলমানদের রাজনীতি নয়। মুসলিম বঙ্গের নতুন রাজনীতিকে অনেকে গ্রহণ করবে না; এই জন্য যাতে মুসলমানরা হতাশ না হয়, সেই জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—আল্লাহ যখন তালুতকে রাজা নির্বাচন করলেন, তখন অনেক ইহুদী আলেম তালুতকে রাজা মানেনি। তারা রাজা মানুক আর না মানুক, আল্লাহ তাআলা সূরা আল-আনফালের ৬০ নং আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন, মুসলমানগণ যেন কাফেরদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি এবং পালিত ঘোড়া-রণকৌশল প্রস্তুত রাখে। শক্তি ও রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলমানগণ আল্লাহর শত্রুকে এবং মুসলমানদের শত্রুকে ভয় দেখাবে। এ ছাড়া অন্য শত্রুদেরকেও ভয় দেখাবে যাদেরকে মুসলমানগণ চেনে না, কিন্তু আল্লাহ চেনেন। আমরা বর্তমান মুসলমানরা শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য সর্বপ্রথম তাদের আয়ের উৎসসমূহ বন্ধ করে দেবো, যা রাসূল (সা.) মক্কার কাফেরদের জন্য করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ, মুসলমানদের শত্রুদের ভয় দেখানোর জন্য কাফেরদের আয়ের উৎসসমূহ বন্ধ করাই যথেষ্ট হবে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম বঙ্গের রাজনীতি ঠিক করার পূর্বে মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে পারলে, আমরা মুসলিম বঙ্গের রাজনীতি ঠিক করতে পারবো। রাজনীতি ঠিক হলে মুমিনগণ যখন যেভাবে পারবেন, সাধারণ মুসলমানদেরকে নতুন রাজনীতির বয়ান বোঝাবে।

মুমিন মুসলমানদের রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:
ক. সকল শ্রেণির মুসলমানদেরকে নামাজে উপস্থিত করা।
খ. মুসলমানদের নিসাব পরিমান অর্থ থেকে যাকাত আদায় নিশ্চিত করা।
গ. মুসলমান দরিদ্রদের রোজা নিশ্চিত করার জন্য রমজান মাসের এক সপ্তাহ পূর্বে যাকাতের অর্থ বিতরণ করা।
ঘ. মুসলমানরা যাকাত দেওয়ার পরে যারা সামর্থ্যবান, তাঁদেরকে হজ্জ করার জন্য বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছানো।
ঙ. মুসলমানদের মধ্য থেকে ইসলামিক দল-প্রথা বিলুপ্ত করে সবাইকে এক আল্লাহর বান্দা করা।
চ. মুসলমানদের মধ্যে গরীব ও ধনীর দূরত্ব কমিয়ে আনা।
ছ. মুসলমান প্রজন্ম তৈরি করার জন্য সকল শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেওবন্দ কেন্দ্রিক করা।
জ. বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে আর্থিক চাপে ফেলা।
ঝ. মুসলমানদের সকল প্রতিষ্ঠানে শূরা পদ্ধতি চালু করা এবং খ্রিষ্টানদের সভাপতি, চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর পদ্ধতি বাদ দেওয়া।
ঞ. ইসলামিক রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার জন্য জনগণকে আর্থিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
ট. মুসলমানদের মধ্য থেকে ইমাম ও আলেমদেরকে সমাজের নেতৃত্বে নিয়ে আসা।
ঠ. মুসলমানদের পরিবার থেকে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করা। যেমন- জ্বিন, কুফরি, কালো জাদু, লালনগীতি, ভণ্ড পীর।
ড. মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণি ভিত্তিক মানুষকে পৃথক পৃথকভাবে সংশোধন করা। যেমন- আপনি দিনমজুরকে শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় উপদেশ দিলে হবে না। আবার উচ্চবিত্ত ব্যক্তিকে শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় উপদেশ দিলে হবে না। যারা দিনমজুর, তাদের মধ্যে ইসলামিক সরকারকে প্রবেশ করতে হবে তাদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম দিয়ে। যারা শিক্ষিত, তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে শান্তি ও আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যম দিয়ে। যারা উচ্চবিত্ত, তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে তাদের থেকে অধিকার আদায়ের মাধ্যম দিয়ে।

বর্তমান সরকারের অর্থ ব্যবস্থার উপর আর্থিক প্রভাব ফেলার রাজনীতি: শত্রুর অর্থ ব্যবস্থাকে দুর্বল করা সুন্নত, যা মুসলমানরা রাসূল (সা.)-এর সারিয়্যা অভিযান থেকে জানতে পারে।

ক. মুসলমানদের সরকার কিছু খাত থেকে কোন খাজনা নেবে না। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা কর নাম দিয়ে বিপুল পরিমাণ খাজনা লুট করছে, খাজনা লুটের খাতগুলো হলো: শিক্ষা খাতের রেজিস্ট্রেশন, গাড়ি নিবন্ধন, সম্পদ হস্তান্তর, বিবাহ নিবন্ধন, লাইসেন্স, মামলা এবং রোড পারমিট। এই সকল খাজনা কারণে সাধারণ মুসলমান দিন দিন গরিব হচ্ছে।

খ. মুসলমানদের সরকার হাট-বাজার থেকে খাজনা তোলা বন্ধ করে দেবে। গরিব মুসলমান বাড়ি থেকে নারকেল, সুপারি, হাঁস, মুরগি বিক্রয় করার জন্য হাটে নিয়ে যায়, এই সব বিক্রয় করার পরে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ইজারাদার গরিব মুসলমান থেকে খাজনা আদায় করে। অভাবের কারণে গরিব মুসলমান এই সকল পণ্য বিক্রয় করছেন। এই সকল পণ্য থেকে খাজনা আদায় করা কি ঠিক?

গ. মুসলমানদের সরকার বসত বাড়ি/ জমির উপর খাজনা বন্ধ করে দিবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বসত বাড়ি/ জমির ওপর খাজনা আদায় করে। আল্লাহর জমি মুসলমান মালিক সরকারকে কেন খাজনা দিতে হবে। ধরুন বন্যার কারণে আপনার জমিতে ফসল হন নাই, কিন্তু খ্রিষ্টানদের নিয়মে আপনাকে জমির খাজনা দিতে হবে। তাও আবার দেরি করে দিলে খাজনার উপর সুদ দিতে হয়। মুসলিম দেশে কাফেররা বসবাস করলে কর দিতে হয়, মুসলমানরা কি কাফের যে গণতান্ত্রিক সরকারকে কর দেবে?

ঘ. মুসলমানদের সরকার গাড়ির ইনস্যুরেন্স এবং মামলা বন্ধ করে দেবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার গাড়ির ইনস্যুরেন্স ও মামলা দিয়ে বিপুল পরিমান অর্থ লুট করছে, এতে করে সাধারণ মুসলমান দিন দিন গরিব হচ্ছে।

ঙ. মুসলমানদের সরকার মোবাইল কল, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল থেকে কোন প্রকার ভ্যাট কর্তন করবে না। আপনি মিটারে ৫০০ টাকা প্রবেশ করালে, গণতান্ত্রিক সরকার বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ১৫০ টাকা কেটে নেয়, বাকি ৩৫০ টাকা মিটারে প্রবেশ করে। মুসলমানদের সরকার আপনার ৫০০ টাকা সম্পূর্ণই মিটারে প্রবেশ করাবে।

চ. মুসলমানদের সরকার সকল প্রকার মূল্য সংযোজন কর (VAT) বন্ধ করে দেবে। গণতান্ত্রিক সরকার কর (VAT) বসিয়ে জনগণের সম্পদ লুট করছে। যেমন- আপনি মোবাইলে ১০০ টাকা রিচার্জ করলে কার্যত মাত্র ৪৩ টাকা ৭০ পয়সা ব্যবহার করতে পারবেন। ৫৬.০৩ টাকা কর্তন করা থেকে বুঝা যায়, খ্রিষ্টানদের নিয়মে গণতান্ত্রিক সরকার কী পরিমাণ অর্থ লুট করছে।

ছ. মুসলমানদের সরকার সকল প্রকার আয়কর কর্তন বন্ধ করে দেবে। গণতান্ত্রিক সরকার আয়কর এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর সরাসরি কর ধার্য করে। মুসলমানদের রক্তমিশ্রিত অর্থ থেকে খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক সরকার কী পরিমাণ অর্থ লুট করছে, তা মুসলমানরা চিন্তাও করতে পারবেন না। যেমন- আপনি প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা আয় করেন। তাহলে সরকারকে ৫,৬২৫/- আয়কর দিতে হবে। এরপর আপনি বিদ্যুৎ বিল দিতে গেলে সেখানে কর (VAT), প্যাকেটজাত পণ্য কিনতে গেলে সেখানে কর (VAT)। এইভাবে এক জন্য মুসলমান থেকে মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা কর কেটে নেওয়া হয়।

জ. মুসলমানদের সরকার জেলেদেরকে ১২ মাস নদীতে মাছ ধরতে দেবে। মুসলমানদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। মুসলমানরা মাছ ধরব আর খাব—এইটাই মুসলমানদের সামাজিক নীতি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার পূজাতে মাছ পাচার করার জন্য নদীতে মাছ ধরা নিষেধ করে।

ঝ. মুসলমানদের সরকার সকল মসজিদে ও মাদ্রাসাতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ সরকারি ভাবে বেতন পাবেন। ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ ইসলামিক সরকারের নিকট সম্মানিত।

ঞ. মুসলমানদের সরকারের নিকট প্রবাসীরা অনেক সম্মানিত। যে সকল প্রবাসী বিদেশে অসুস্থ হয়ে দেশে আসবেন, তাঁদের জন্য ইসলামিক সরকার চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (ফ্রি) করে দেবে। ইসলামিক সরকার প্রবাসীদের কথা শুনেছে যে, তাঁরা বিদেশে চিকিৎসককে বুঝিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা বলতে পারে না। এই জন্য প্রবাসীদের দেশে আসতে হয়।

ট. ইসলামিক সরকার সকল গাড়ি চালকের ঘুম নিশ্চিত করার জন্য মহাসড়কের পাশে টার্মিনাল ও মুসাফিরখানা তৈরি করে দিবে, যাতে সড়কে দুর্ঘটনা কমে যায়। মুসাফিরখানা কারণে গাড়ি চালকদের নামাজের আওতায় আনাও সহজ হবে।

ঠ. ইসলামিক সরকার গ্রুপ কোম্পানির ব্যবসায় সীমাবদ্ধতা আনবে। বর্তমানে গ্রুপ কোম্পানিগুলো বেশি ঋণখেলাপি, গ্রুপ কোম্পানিগুলো কারণে ছোট ব্যবসায়ীরা লোকসানে আছে এবং যুবকরাও নতুন ব্যবসার সুযোগ পাচ্ছে না।

ড. ইসলামিক সরকার করজে হাসানা প্রথা চালু করবে। দেশের মধ্যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ক্ষুদ্রঋণ কোম্পানি, এনজিও, এমএলএম কোম্পানি ও সমবায় কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা মুসলমানদের ঋণ দিয়ে গোলাম বানিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করে। হারামখোরদের কারণে সাধারণ মুসলমান দিন দিন গরিব হচ্ছে।

ঢ. ইসলামিক সরকার প্রতি চল্লিশ-৪০ কি: মি: সড়ক ১ বছরের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করবে। গণতান্ত্রিক সরকারের চল্লিশ-৪০ কি: মি: সড়ক নির্মান করতে সময় লাগায় ২ থেকে ৩ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের কারণে জনগণ ও যানবাহন ক্ষতির সম্মুখীন হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কথা আর নাই বললাম।

ণ. ইসলামিক সরকার এক-১ বছরের মধ্যে সকল জমির মামলা নিষ্পত্তি করবে। খ্রিষ্টান আইনে বিচার পেতে মুসলমানরা বছরের পর বছর ধরে মামলা চালান অথচ কোন ফলাফল পান না। তার ওপর উকিলকে অর্থ দিতে দিতে সাধারণ মুসলমানের সম্পদ তলানিতে চলে যায়। শেষে দেখা যায় মুসলমানদের সময় ও অর্থ দুটিই বৃথা যায়।

ত. ইসলামিক সরকার সকল নদী-খাল পরিষ্কার করবে, শুধু সেন্টমার্টিন বা সাদা পাথর নয়। বর্তমানে দেশে কোম্পানিদের ছোট প্যাকেটে নদী-খাল ভরে গেছে। যার ফলে মাছ উৎপাদন কমে গেছে।

ম. ইসলামিক সরকার সকল পুরুষের জন্য ব্যবসা বা চাকরি নিশ্চিত করবে। বর্তমানে দেশে অনেক মুসলমান বেকার আছে যার প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করা হয় না। খ্রিষ্টানরা চায় মুসলমানরা বেকার থাকুক যাতে খ্রিষ্টানদের মুখাপেক্ষী হয়।

মুসলমানদের নিয়ে ইসলামিক সরকারের মহড়ার রাজনীতি:

ক. সকল ইমাম ও মুয়াজ্জিন যাতে নিজেদেরকে সমাজের নেতা মনে করেন এবং সকল মুফতি যাতে নিজেদেরকে বিচারক মনে করেন—এমন মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন করা।

খ. সকল মাদ্রাসার শিক্ষক যাতে নিজেদেরকে সামরিক কমান্ডার মনে করেন এবং সকল মাদ্রাসার ছাত্র যাতে নিজেদেরকে সামরিক সৈন্য মনে করে—এমন মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্য সম্মেলন করা।

গ. যাকাত সম্মেলন, হজ্জ এজেন্সি সম্মেলন, ওয়াকফ সম্মেলন, মাদ্রাসা সম্মেলন, ইসলামিক লেখক ও পাঠক সম্মেলন, দ্বীনে ফেরা সম্মেলন করা।

ঘ. কৃষক ও শ্রমজীবীদের নিয়ে সম্মেলন করা, যাতে মেহনতি মানুষ নিজেদেরকে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি মনে করে।

ঙ. এতিম ও গরিবদের নিয়ে সম্মেলন করা, সমাজের বিত্তবানরা যাতে নিজেদেরকে এতিম ও অসহায়দের অভিভাবক মনে করেন এমন মনোভাব সৃষ্টির জন্য সম্মেলন করা।

মুসলিম বঙ্গের সামাজিক পরিবর্তন মূলক রাজনীতি:

ক. ইসলামিক সরকার জন্মনিবন্ধন পদ্ধতি বাদ দিয়ে দেবে। যারা মুসলিম বঙ্গের জন্মগ্রহণ করবে তাদের কোন জন্মনিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। জাতীয় পরিচয়পত্র হলেই যথেষ্ট। মুসলমানদের ব্যস্ত রাখতে খ্রিষ্টানরা এত নিয়ম বের করে।

খ. ইসলামিক সরকার বিনামূল্যে-ফ্রি সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করবে। সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। আল্লাহকে মুসলমানরা চিনুক তা ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা চায় না।

গ. ইসলামিক সরকার সকল গার্মেন্টস কর্মী, কারখানা কর্মী ও দিনমজুরের জন্য পাঁচ-৫ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা করবে, যাতে তারা ইবাদত ও বিশ্রাম নিতে পারে।

ঘ. ইসলামিক সরকার আহলে জিম্মাহদের জন্য পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করে দেবে, যা তাদের ধর্মীয় নীতি অনুসারে পরিচালিত হবে।

ঙ. ইসলামিক সরকার অন্যায়ভাবে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড এক-১ মাসের মধ্যে কার্যকর করবে। আল্লাহর নির্দেশে এই শাস্তি, কারো ব্যক্তিগত নীতি নয়।

চ. ইসলামিক সরকার মুসলমানদের রাজনীতি ঠিক করবে। মুসলমানদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে কাফেরদের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করতে।

ছ. মুসলমানদের রাজনীতি দুর্বলদের নিয়ে; সকল নবী-রাসূলকে প্রথমত দুর্বলরাই সমর্থন করেছেন। যাকাতের মাধ্যমে সবল ও দুর্বলের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনা হয়। মুসলমানগণ এতিম ও গরিবদের নিয়ে কাজ করবে এবং গরিবদের অধিকার নিয়ে কথা বলবে। নবী ও রাসূলগণের আদর্শ গ্রহণ করলে মুসলমানগণকে ধনীরা প্রত্যাখ্যান করবে।

জ. বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামিক দল মনে করে। খ্রিষ্টানদের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সরকার গঠনের মাধ্যম মনে করে। খ্রিষ্টান দেশসমূহকে উন্নয়নের মাপকাঠি মনে করে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ শেষ গন্তব্য হিসাবে খ্রিষ্টান দেশসমূহকে মনে করে। বাংলাদেশের মুসলমানদের মন ও ধারণা থেকে এইসব দূর করতে হবে।

ঝ. ইন্টারনেট, যার অর্থ হলো ভেতরের জাল; এই জাল দিয়ে কাফেররা মুসলমানদের ঈমানকে ধ্বংস করে। তাই কাফেরদের এই জাল কর্তন করতে হবে। এতে করে মুসলমানদের নিজস্ব মিডিয়া ও সার্ভার উন্নত হবে এবং খ্রিষ্টানদের উপর নির্ভরশীলতা ও তাদের প্রভাব কমবে।

ঞ. ইসলামিক সরকার বসতবাড়িতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করবে। বর্তমান সময়ে স্কুলে নাচ-গান শেখানো হয় অথচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শেখানো হয় না।

ট. মুসলিম বঙ্গের মানুষ আল্লাহর আইনের বিচার সম্পূর্ণ ফ্রি পাবে, বিচারের জন্য কোন উকিল ধরতে হবে না।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের আন্তর্জাতিক রাজনীতি:

ক. ইসলামিক সরকার আরকান মুসলিমদের-রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের জন্য সামরিক অভিযান শুরু করবে।

খ. ইসলামিক সরকার বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধার করবে।

গ. ইসলামিক সরকার কাশ্মীরকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার জন্য সাহায্য করবে।

ঘ. ইসলামিক সরকার করিমগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদকে মুসলিম বঙ্গের সাথে সংযুক্ত করবে।

ঙ. ইসলামিক সরকার মেঘালয়ের ইছামতী-ভোলাগঞ্জ-মাওলাই-উমলিং, অসমের করিমগঞ্জ-শিলচর-তিনসুকিয়া-ডিব্রুগড়-ধুবড়ি, ত্রিপুরার খুমুলুঙ-গন্ডাছড়া, অরুণাচল প্রদেশের দিয়ুন-বোর্দুমসা, মিজোরামের লুংলেই-কমলাপুর, নাগাল্যান্ডের দিমাপুর-কোহিমা, মণিপুরে ইম্ফল-মোরহ অঞ্চলের বাংলাভাষী ব্যক্তিকে ট্যাক্স ফ্রি ব্যবসা ও ট্যাক্স ফ্রি যাতায়াত করার সুযোগ দিবে। এই সকল অঞ্চলের বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য ইসলামিক সরকার সব সময় সাহায্য করবে।

মুসলিম বঙ্গের ইসলামিক সরকারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির রাজনীতি:
ক. বর্তমান সরকারের কর্মীরা নিজেদেরকে ব্রিটিশ-নিয়োগকৃত রাজা মনে করে। তাদের ওপর জনগণের মারমুখী মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য যেখানে যেখানে নদীভাঙন, সড়ক ভাঙন হবে, সেখানে সমাবেশ করে প্রতিবাদ করা।

খ. ইসলামিক সরকার বস্তুহারাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেবে। গণতান্ত্রিক সরকার বস্তুহারাদের জমি না দিয়ে, নিজের জন্য অনেক জমি বরাদ্দ করে। যে সরকার মুসলমানদের জমি দিতে পারে না, সেই সরকার কীভাবে মুসলমানদের সরকার হয়?

গ. বাংলাদেশে যারা প্রতি মাসে রেমিটেন্স পাঠান, ইসলামিক সরকার তাদের বিমান ভাড়া থেকে কোন প্রকার কর নেবে না। প্রবাসী ভাইয়েরা অনেক কষ্ট করে দেশে রেমিটেন্স পাঠায়। আর গণতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রীরা কাগজের নোট ছাপিয়ে মানুষকে দেয় এবং বলে খরচ করো। অন্যদিকে, মন্ত্রীরা সব রেমিটেন্স খ্রিষ্টান দেশে তাদের বউ-বাচ্চার কাছে পাঠিয়ে দেয়। যার কারণে দেশের মধ্যে কাগজের টাকা বেশি হয়ে যায়, তখন মন্ত্রীরা গ্রুপ কোম্পানিগুলোকে বলে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে। কোম্পানিগুলো দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় কারণে মুসলমানরা ১ টাকার পণ্য ৫ টাকা দিয়ে কিনতে হয়।

ঘ. ইসলামিক সরকার বিনামূল্যে রেমিটেন্স যোদ্ধার মৃতদেহ তাদের স্বজনদের নিকট পৌঁছে দেবে। বর্তমানে সবাই বলে প্রবাসীরা রেমিটেন্স যোদ্ধা অথচ এই যোদ্ধা যখন প্রবাসে মৃত্যুবরণ করে তখন বর্তমান সরকার তাদের মৃতদেহের কোন খবর রাখে না।

ঙ. ইসলামিক সরকার বিনামূল্যে শ্রমিক প্রবাসীদের পাসপোর্ট প্রদান করবে। যেসব প্রবাসী ভাই সঠিক পথে দেশে রেমিটেন্স পাঠাবেন, তাঁদেরকে বিনামূল্যে-ফ্রি পাসপোর্ট প্রদান করবে।

চ. ইসলামিক সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস বোতলজাত করে বিক্রি করবে। বর্তমান সরকার মুসলমানদের প্রাকৃতিক গ্যাস কম দামে খ্রিষ্টানদের পোশাক বানাতে গার্মেন্টস কোম্পানিদের দেয়। যদিও আমরা রেমিটেন্স পাই, তাতে লাভ কী, সকল রেমিটেন্স আবার মন্ত্রীরা খ্রিষ্টানদের দেশে পাচার করে। অন্য দিকে, মুসলমানদের নদীসমূহ ধ্বংস হচ্ছে গার্মেন্টসের বর্জ্য দিয়ে। তার ওপর মুসলমানদের বেশি দামে এলপিজি গ্যাস কিনতে হয়।

মুসলিম বঙ্গের ইসলামিক সরকারের আয়ের উৎসসমূহ: ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থ আয় কীভাবে করবে। আগে বলে রাখি, ইসলামিক সরকার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকারের অর্ধেক (৫০%) অর্থ হলেই যথেষ্ট।

ক. যেই সকল ব্যবসা একক মালিকানাধীন হলে সম্পদ জমা হবে, সেই সকল ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে। উক্ত ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ দিয়ে ইসলামিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যেমন- লোহা, বালু, পাথর, সিমেন্ট, সকল প্রকার তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, মোবাইল-কল, চা পাতা, পাট, চামড়া ও কেমিক্যাল সহ বিভাজন অযোগ্য ব্যবসা ইসলামিক সরকার করবে।

খ. দেশে ১টি মাত্র সুদবিহীন ব্যাংক থাকবে যা ইসলামিক সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। সেবার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে আয়কৃত অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে ব্যয় করবে।

গ. দেশের উন্নয়নের জন্য জনগণের নিকট বিনিয়োগ চাওয়া হবে। ইসলামিক সরকারও বিনিয়োগ করে যে অর্থ আয় করবে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

ঘ. মুসলমানদের কেন্দ্রিয় কোষগারকে বাইতুল মাল বলা হয়। ইসলামিক সরকার বাইতুল মাল পূরণের জন্য জনগণের নিকট সদাকা চাইবে।

ঙ. মুসলমানদের ক্ষুদ্র ব্যবসা নীতির কারণে পণ্য সরবরাহ-সাপ্লাই চেইন ঠিক রাখার জন্য ইসলামিক সরকার ব্যবসা করবে। সরকার পণ্য সরবরাহ থেকে অর্জিত অর্থ রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

চ. ইসলামিক সরকার বন্দর, বিমান, রেল ও গণপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তা রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় করবে।

মুসলমান উম্মাহর ঐক্য (মুসলিম বঙ্গের একতা)

ঐক্য—আমরা সব সময় এই একটি শব্দ শুনতে পাই। শব্দটি ছোট হতে পারে, কিন্তু তা অর্জন করা কঠিন। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক যেকোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত, দলগত ও সমাজগত মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে এক হওয়াকেই ঐক্য বলে। ঐক্য নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের ওপর। অর্থাৎ, শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রণালী যদি জাতির ঐক্যের জন্য তৈরি করা হয়, তাহলে জাতি ঐক্যবদ্ধ হবে। আর শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রণালী যদি জাতির বিভাজনের জন্য তৈরি করা হয়, তাহলে জাতি দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। যেমন- খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র, যার রাজনৈতিক গঠন হলো দেশে একাধিক দল থাকতে হবে। কিন্তু মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্র দিয়ে মদিনা রাষ্ট্র চালু করার জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, বাস্তবতা হলো তা অসম্ভব। কারণ, মুসলমান পরিচালিত হচ্ছে খ্রিষ্টানদের বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মুমিনরা যদি মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায়, তাহলে প্রথমে কিছু মুমিনকে মদিনা রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু করতে হবে। এতে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটবে এবং মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে। কারণ, মদিনা রাষ্ট্র নীতিতে দল প্রক্রিয়া নেই। মদিনা রাষ্ট্রের মাধ্যমে মুসলমান জাতিকে তিনটি-৩ বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

মুসলমান জাতির ঐক্যবদ্ধের তিনটি বিষয়:
১. এক আল্লাহ ২. এক ধর্ম ৩. এক দেশ

এক আল্লাহ: আল্লাহ তাআলার সকল গুণের মধ্য থেকে মাত্র একটি গুণ তিনি মানবজাতিকে দিয়েছেন। তা হলো, মানুষ চাইলে আইন দাতা হতে পারবে। কিন্তু মানুষ চাইলেও রিজিক দাতা হতে পারবেন না। আল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক; তিনি মানবজাতির জন্য পৃথিবীর উপযোগী শ্রেষ্ঠ আইন দিয়েছেন। প্রভু কর্তৃক মানবজাতির জন্য প্রদত্ত আইনকে শাসনতন্ত্র বলে। আল্লাহ সেই প্রভু, যিনি মানবজাতির অজ্ঞ অবস্থায় জন্ম গ্রহণের কারণ এবং পৃথিবী সৃষ্টির সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পৃথিবীর সৃষ্ট সকল বিষয় সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, আর সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আইন মানবজাতির জন্য সঠিক, নির্ভুল এবং কল্যাণকর। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত যে কেউ মানবজাতি জন্য আইন দিতে পারে। এই কারণেই সৃষ্টিকর্তার আইন ব্যতীত অনেক আইন দেখা যায়। যেমন -আল্লাহ তাআলা আল-কোরআনের মাধ্যমে মানুষের জন্য আইন দিয়েছেন। আবার খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রে জাতিসংঘের মাধ্যমে মানুষের জন্য আইন দেয়। মুসলমানদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে, যারা মুখে আল্লাহর ইবাদত করে, কিন্তু আইন মানে খ্রিষ্টান গণতন্ত্রের। মুসলমানদের একমত করতে হবে যে, এক আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আইন দাতা এবং অন্য কারো আইন মুসলমানরা মানবে না।

এক ধর্ম: ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আসমানি গ্রন্থের সঠিক অনুসরণ করাকে ধর্ম বলে। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে, মানুষ নিজ নিজ পছন্দের ধর্মের অনুসরণ করে। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মানুষ ব্যক্তির অনুকরণ করে। মুসলমান ব্যতীত সকল ধর্মের অনুসারীগণ ব্যক্তির অনুসরণ করে। একমাত্র মুসলমানরা ব্যক্তির অনুকরণ করে। অর্থাৎ: মূর্তি পূজারিগণ সরাসরি মূর্তির নিকট সাহায্য চায়, এই চাওয়াকে বলে অনুসরণ করা। কিন্তু ইসলাম ধর্মের অনুসারীগণ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুকরণ করে, এক আল্লাহ তাআলা এবং সবকিছুর দাতার কাছে চায়। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আছেন, যারা সব কিছু হোয়াইট হাউসের কাছে চায়। আমাদের মুসলমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে যে, আমরা সব কিছু শুধু এক আল্লাহ তাআলার নিকট চাইব এবং হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুকরণকারী হয়ে সাহাবাদের নিয়মে এক ইসলাম পালন করব। সৃষ্ট সকল কিছুকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করাকে নিয়ম বলে। যেমন -একটি হাতঘড়ি যিনি বানিয়েছেন, তিনি তাকে হাতে লাগানোর জন্য বানিয়েছেন। তার হাতঘড়িকে আপনি পায়ে লাগাতে পারেন, কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার হবে না। এখানে হাতঘড়ির সঠিক ব্যবহার করাকেই নিয়ম বলে। একটি কাজ আপনি অনেকভাবে করতে পারেন, যেভাবেই করুন না কেন তা সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ সম্পূর্ণ করলে তার সৌন্দর্য ও ব্যবহারের মান ঠিক থাকবে। ঠিক সেইভাবেই ইসলামকে ব্যবহার করে নিজের জীবন সাজানোর অনেক পদ্ধতি আছে। সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনার ঈমান মজবুত হবে এবং ইসলামকে সুন্দর দেখাবে।

এক দেশ: আল্লাহ তাআলা খুঁটিবিহীন আসমান সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তা দেখে। আল্লাহ আসমানকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে সৃষ্টি করেননি। সেই আল্লাহ তাআলা জমিন সৃষ্টি করেছেন; তিনি জমিনকে দেশ নাম দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ মানুষকে এই জমিনের প্রতিনিধি করে সৃষ্টি করেছেন, এই জন্য মানুষ জমিনকে ভাগ করতে পারে। কিন্তু মানুষ আসমানকে ভাগ করতে পারে না। কারণ, মানুষ জমিনের প্রতিনিধি, আসমানের নয়। এক আল্লাহ তাআলা জমিন সৃষ্টি করার কারণে, আমরা মুসলমান জাতি জমিনকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করি না। কিন্তু ইবলিশ ও কাফেররা কোথাও ধর্মকে ব্যবহার করে, কোথাও ভাষাকে ব্যবহার করে জমিনকে দেশ নাম দিয়ে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করেছে, যাকে ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি বলে। জমিনের এই বিভক্তির কারণে আমাদের এক মুসলমান জাতি অন্য মুসলিম জাতিকে সাহায্য করতে পারে না। আমরাও জমিনের এই বিভক্তিকে মেনে নিয়েছি। জমিনের এই বিভক্তি দূর করার জন্য আমরা মুসলমান জাতিকে এক জমিন নীতিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শুধু এই নীতি ইসলামে রয়েছে।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (বাবরি মসজিদ)

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের কার্যক্রম সম্পর্কে আনুষঙ্গিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গ এই উপমহাদেশে আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে চায়। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে চায়। আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করেছি। ইসলামের আদলে আমরা কীভাবে দেশকে সাজাব, তাও প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলামিক আমিরাতের কর্ণধার কারা হবেন, তাঁদের চিহ্ন সম্পর্কেও ইংগিত করা হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে ভুল হলে, তা আপনারা পরিহার করবেন। আর সত্য হলে নিজ উদ্যোগে কাজ করে যাবেন। সহজে কীভাবে মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো। এর থেকে কার্যকরী কোন পথ থাকলে তা প্রকাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা তা গ্রহণ করব।

আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যুদ্ধের আইন দিয়েছেন, যদিও মুসলমান যুদ্ধকে অপছন্দ করে, তবুও আল্লাহ এই আইন দিয়েছেন। প্রকৃত মুসলমানগণ ইসলামিক আমিরাত বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ শুরু করেছে। এখন মুসলমানদের নিজ নিজ অস্ত্র তুলে নিতে হবে এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়তে হবে। মুসলমানদের এই পদক্ষেপ যদি কাফেরদের, ইহুদীদের ও খ্রিষ্টানদের রাগের কারণ হয়, তাতে মুসলমানদের কিছু করার নেই। কারণ আল্লাহর কাছে মুসলমানরা নিজের জীবনকে জান্নাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দিয়েছে। মুসলমানরা কোন কাফেরের মন রক্ষা করতে দুনিয়াতে আসেনি। আল্লাহ মানুষের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, মুসলমানরা সতর্ক দৃষ্টি কাফেরদের উপর রাখে। বাংলাদেশে কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করছে তা আমরা জানি। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ও নজরদারিতে রাখা হচ্ছে।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর আইন বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা এবং বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা। কাফেররা মুসলমানদের মসজিদ ভেঙে মুসলমানদের ইজ্জতের উপর মল ত্যাগ করেছে। তার কিসাস স্বরূপ আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গকে ইসলামের জন্য কবুল করেন, তাহলে বাবরি মসজিদ পুনরুদ্ধার করে কাফেরদের রক্তে তাদের গঙ্গা নদীকে লাল করে দিবো এবং এই উপমহাদেশে এমন কোন স্থান থাকবে না, যেখানে কালেমার পতাকা উত্তোলন করা হবে না। মুসলমানদে এই উপমহাদেশে নামকরণ করা হয়েছে-গাজওয়া ইসলামিক আমিরাত, যার রাজধানী হবে কিসাস নগর-যার বর্তমান নাম অযোধ্যা। কিসাস নগর-এর বাবরি মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ থেকে গাজওয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে। অযোধ্যা নাম কিসাস নগর রাখার কারণ, মুসলমানরা জখমের বদলায় অনুরূপ জখম দেবে, যা আল্লাহর বিচার। আজ আমরা ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য কান্না করি। কাশ্মীর, আরাকানের মুসলমান ভাইরা কি ইবলিশের ভাই? সত্যিকারের ভালোবাসা যদি ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য থাকে, তাহলে কাশ্মীর, আরাকান থেকে খ্রিষ্টান ও হিন্দুদেরকে বের করতে হবে। খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের সাথে মুসলমান যুদ্ধ করলে, তারা ইহুদীদেরকে সহায়তা দিতে পারবে না। আর ইহুদীরা সহায়তার অভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না। এইভাবে ফিলিস্তিনকে সাহায্য করা সম্ভব। ইহুদীদেরকে সহায়তা দেয় এমন প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করা প্রয়োজন। আজ কাফেররা মুসলমানদের পৃথিবী ছোট করে দিতে চায় অথচ কাফেরদের পৃথিবী ছোট হওয়ার কথা ছিল।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জমিনের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে মুমিনরা মৃত্যু-পিপাসু, তাই যেখানে প্রয়োজন সেখানে যাওয়া তাদেরই কাজ। মনে রাখবেন, মুসলিম বঙ্গে অনেক মুজাহিদ আছে, আর মুজাহিদের জন্য ময়দান নিরাপদ স্থান। আল্লাহ তাআলার কুদরতি সাহায্য ময়দানে দেখা যায়, সাথে সাথে আল্লাহর সাথে মোলাকাত সহজ হয়। এখন মুমিন আলেমদের কাজ হলো দেশ থেকে মুজাহিদদেরকে নিয়ে গিয়ে ময়দানে জামায়েত করা।

মুসলমানরা ময়দান ছাড়া নিজ দেশে জামাতবদ্ধ হলে কাফের ও মুনাফিকরা মুসলমানদের মূল সহ শেষ করে ফেলবে। মুসলমানদেরকে সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ সতর্ক দৃষ্টি রাখাটা আল্লাহর একটি গুণ। আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাঁর রং গ্রহণ করতে বলেছেন। বাংলাদেশ এখন ইসলামিক যোদ্ধা-শূন্য। খ্রিষ্টানরা তাদেরকে জঙ্গি বলে, যারা খ্রিষ্টানদের গণতন্ত্রিক আইনের বিপক্ষে যুদ্ধ করে। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা, আমরা অনেকে জঙ্গি বিমান বলি, তার অর্থ যুদ্ধ বিমান। মুসলমানকে জঙ্গি বলা অর্থ, মুসলমান আল্লাহর যোদ্ধা। মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু মুনাফিক খ্রিষ্টান আইন মান্য করে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। তাই মুসলমানদেরকে দেশের ভিতরে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করতে হবে। মুসলমানগণ একসাথে কাজ করলে খ্রিষ্টান আইন মান্য কারিরা সহজেই মুসলমানদেরকে হত্যা করে ফেলবে। মুসলমানদের জন্য ময়দান নিরাপদ, দেশের ভিতরে থেকে গোপনে কাজ করা নিরাপদ নয়। মনে রাখবেন, গোয়েন্দারা আপনার মোবাইলের ওপর নজর রাখে।

সবাই হয়তো মনে করবেন, এত গোপন বিষয় আমরা কেন এভাবে প্রকাশ করছি। কারণ, এইভাবে বলাটাও একটি কৌশল। আমাদের মৃত্যুর পরে যাতে যে কেউ এই পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে পারে এবং এই অগ্রযাত্রা যাতে কেউ বন্ধ করতে না পারে তার জন্য প্রকাশ করা। আল্লাহর নিকট ও তাঁর মুমিন বান্দাদের নিকট এই পরিকল্পনাটি হবে একটি স্পষ্ট দলিল, আর কিছু লোকের জন্য পরীক্ষা। সবাই গোপন করে হেকমত অবলম্বন করে। যারা ময়দানে যেতে ভয় করে, তারাই শুধু এটি করে। আর যারা সত্যিকারের ময়দানে যেতে চায়, তারা প্রকাশ করাকে পছন্দ করে। তাদের পছন্দই, আমাদের পছন্দ।

আমরা বুঝি, আল্লাহর পাগল মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে আসার পরে কী খোঁজে। তারা আল্লাহর পথে আসার কথা শুনতে পায়, কিন্তু আল্লাহর সাথে কীভাবে মোলাকাত করবে, এই পথ কেউ দেখায় না, তাই আমরা দেখিয়ে দিলাম। আমরা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য পাগল হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরতে থাকি, আলেমদের কাছে যেতে থাকি; কেউ আমাদেরকে কিছু বলতে পারে না। ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পাই, ফিলিস্তিন থেকে এক মা ডেকে বলছে, তোমার দেশের মায়েরা কি ইহুদী জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য বীর জন্ম দিতে পারে নাই? তখন আমরা ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে দেখলাম কাশ্মীরকে, কাশ্মীর গিয়ে দেখি কাশ্মীরের মুক্তির চাবি বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এসে দেখি, আরাকানের মুসলিমরা ডেকে বলছে, আগে আমাদেরকে মুক্ত করো। যখনি আমরা আরাকান অভিমুখী হয়ে রওয়ানা হলাম, তখনি কানে এসে লাগে বাবরি মসজিদের ভাঙনের শব্দ। দিক-বিদিকের কান্না, ডাক ও ভাঙনের শব্দে আমরা পাগল হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম কাশ্মীর, হরিয়ানা, বাবরি প্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলা, আরাকান ও লাক্ষাদ্বীপকে সংযুক্ত করে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র করার।

যারা মুসলমান, তারা আল্লাহর ইবাদতে ক্লান্তি বোধ করে না। প্রতিটি কাজের কিছু উসুল-নিয়ম থাকে, যা আপনাকে মান্য করতে হবে। আপনাকে পরিবার ও পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা শিখতে হবে। আর এটা করতে না পারলে আপনি ময়দানে যেতে পারবেন না। পৃথিবী হলো যুদ্ধের ময়দান, একে ময়দান মনে করে জীবন পরিচালনা করতে হবে; তাহলে দেখবেন আপনার জন্য পৃথিবীতে চলা সহজ হয়ে যাবে। হয়তো আল্লাহ আমাদের সাথে আপনাকে জামাতবদ্ধ করাবেন। মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। আমাদের বয়স, জ্ঞান ও শক্তির সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে, করণীয়সমূহকে দুই-২ অংশে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অংশ: আপনার বয়স ১৫ থেকে ৪০ হলে, এই বয়সের মুজাহিদগণ, রাসূল (সা.) জীবনীর প্রথম ৪০ বছরের অনুশীলন করে। চল্লিশ বছরের নিচের মুজাহিদগণ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে আমরা নওজোয়ান মুজাহিদ বলি, তাদের বেশি কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আপনারা আল-কোরআনের উপর ভরসা রাখুন। আল-কোরআনের উপর ভরসা না থাকলে আপনি ময়দানে যুদ্ধ করতে পারবেন না।

নওজোয়ান মুজাহিদগণ ইবাদতের পাশাপাশি যে প্রশিক্ষণ নেবেন তা নিচে দেওয়া হলো:
১. শারীরিক প্রশিক্ষণ। ২. রণকৌশল ও অভিযান। ৩. অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের নাম। ৪. মানচিত্র ও কম্পাসের ব্যবহার।
৫. গোয়েন্দা ও যোগাযোগের কৌশল।

নওজোয়ান মুজাহিদগণকে এইসব শিক্ষার পাশাপাশি কিছু উসুল মানতে হয়। এইসব উসুল না মানলে আপনি কখনো সঠিক দলের সাথে জামাতবদ্ধ হতে পারবেন না। আপনি মনে করতে পারেন, এটি হলো সঠিক পথযাত্রীদের বেশভূষা। আমরা পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও উসুলের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট নজরানা পেশ করব। আল্লাহকে বলব, তিনি যদি আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেন, তাহলে আমরা নিজেরাসহ সকলকে আল্লাহর আইন দিয়ে পরিচালনা করব। এতে করে আল্লাহ যদি আমাদেরকে কবুল করেন, তাহলে আমরা আল্লাহ পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সাহায্য পাব। উসুলসমূহের আরে একটি উদ্দেশ্য হলো, কাফের ও মুনাফিকরা যাতে জানতে পারে আমরাও প্রস্তুত।

উসূলসমূহ: ১. আল্লাহর ফরজ ইবাদত করা, কোন ভাবে ফরজ ইবাদত ত্যাগ করা যাবে না। ২. আল-কোরআন নিজ ভাষায় বুঝে পড়া। ৩. পাঞ্জাবি ও পাগড়ি পরিধান করা। ৪. প্রতি দিন মিসওয়াক করা। ৫. চোখে সুরমা দেওয়া। ৬. দস্তরখানায় খাওয়া। ৭. ডান কাত হয়ে ঘুমানো। ৮. সপ্তাহে এক দিন, মাসে তিন থেকে পাঁচ দিন নিজ গৃহের বাইরে অবস্থান করা (শবগুজারি)। ৯. ইসলামিক সরকারের দিক নির্দেশনা মান্য করে চলা। ১০. সকল সুন্নত ও নফল মান্য করার চেষ্টা করা। ১১. সব সময় হাতে তসবি রাখা। ১২. সাহাবিদের জীবনী পড়া বা যেখানে পড়ে তাদের সাথে জামাতবদ্ধ হওয়া। ১৩. ছোট ছোট দল করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

নওজোয়ান মুজাহিদগণকে প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য এগারোটি উসুলের কথা বলা হলো। আপনাকে মূল সেনাবাহিনীতে যুক্ত করে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে— যে উত্তমভাবে কাজ করে আল্লাহ তার কর্মফল বিনষ্ট করেন না। আপনার বয়স ৪১ হয়ে গেলে আপনি পরবর্তী ধাপের প্রশিক্ষণ নিতে থাকবেন।

দ্বিতীয় অংশ: আপনার বয়স ৪১ থেকে বেশি হলে, এই বয়সের মুজাহিদগণ রাসূল (সা.)-এর মদিনার জীবন অনুসারে প্রথম অংশের মুজাহিদগণকে ও রাষ্ট্রকে পরিচালনা করেন। আপনারা যারা ৪০ বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় অংশে পৌঁছেছেন, উনারা এখন দেশ পরিচালনা ও যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ নিবেন। দেশ ও যুদ্ধ পরিচালনার প্রশিক্ষণের জন্য সিরাতের আলোকে সরকার গঠন করতে হয়। দেশ ও যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি, সেই আলোচনা অনুসারে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

মুসলিম বঙ্গের সম্ভাব্য প্রতিকূলতা ও তার প্রতিকার (জিহাদ ও সমাধান)

বাংলাদেশে থেক মুসলিম বঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হবে। সেই বাধা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আল্লাহর আইন বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রথমে ইসলামিক সরকারকে বাংলাদেশের খ্রিষ্টান সেনাবাহিনীর বাধার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ বাংলাদেশে সেনাবাহিনী আল্লাহর আইনের উপর আনুগত্য প্রকাশকারী নয়। বাংলাদেশে সেনাবাহিনী কখনো আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করবে না। আমরা যদি বাংলাদেশে সেনাবাহিনীকে টিকিয়ে রেখে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে যাই, তাহলে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হবে, যা গৃহযুদ্ধে রূপ নেবে। পৃথিবীতে যত দেশ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করতে চেয়েছে, সব দেশে গৃহযুদ্ধ হয়েছে। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের অর্থ হলো চলমান সকল আইন বাদ দিয়ে দেশকে নতুন আইনে সাজানো।

যদিও ইসলামিক সরকারকে প্রথমে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী বাধা দেবে, তবে তারা এই কাজ একা করবে না। যদি তারা একা চেষ্টাও করে, তবে আল্লাহর আদেশে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী ব্যর্থ হবে। তাদেরকে ব্যর্থ করার জন্য আমরা ছোট সংযোগসেতু ভেঙে দেব এবং আরও কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করব; এতে করে তাদের স্থল অভিযান কষ্টসাধ্য হবে। অন্য দিকে মুসলিম বঙ্গে খ্রিষ্টান দেশের সেনাবাহিনী না আসার সম্ভাবনা বেশি, কারণ মুসলিম বঙ্গে বর্ষাকালীন আবহাওয়ার কারণে তারা সেনা পাঠাতে চাইবে না, কিন্তু ভারতের সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম বঙ্গে পাঠানোর সম্ভাবনা বেশি। এমনিতে আল্লাহর আইন মুসলিম বঙ্গে চালু করার জন্য, কাশ্মীরের স্বাধীনতা জন্য এবং বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করার জন্য ভারতকে মুসলিম বঙ্গে টেনে আনতে হবে। যদি ভারত মুসলিম বঙ্গের না আসে, তবে তারা মুসলিম বঙ্গের ওপর মিসাইল হামলা করতে পারে। মিসাইল হামলা মোকাবিলার করতে মুসলমানরা দেশের মধ্যে কোন যুদ্ধ করতে পারবে না। যদি মুসলিম বঙ্গের উপর ভারত হামলা করে তখন সকল মুসলমানকে মিজোরাম, আসাম ও মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। শুধু কিছু মুসলমান চাষাবাদ করার জন্য মুসলিম বঙ্গে অবস্থান করবে। ভারত সীমান্তে যত কিছু করুক না কেন ১৮ কোটি মানুষের চাপ সামলানোর ক্ষমতা তাদের নেই। মুসলমানদের এই সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার জন্য আর কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

মুসলিম বঙ্গের সম্ভাব্য প্রতিকূলতাগুলো:
১. মুসলিম বঙ্গে গৃহযুদ্ধ এড়াতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করা।
২. নতুন সেনাবাহিনী গঠন করে তাদের অস্ত্রসজ্জা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. ভারতের সামরিক আগ্রাসন থেকে মুসলিম বঙ্গকে নিরাপদ রাখা।
৪. সম্ভাব্য মিসাইল হামলা থেকে মুসলিম বঙ্গেকে নিরাপদ রাখা।
৫. কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও বাবরি মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা।
৬. মুসলিম বঙ্গে ইসলামিক আমিরাত চালু করা।
৭. আরাকানে ইসলামিক আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিম বঙ্গের সম্ভাব্য প্রতিকারসমূহ:
১. মুসলিম বঙ্গে ইসলামিক সরকার ব্যবস্থা চালু করা।
২. বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অভিযান বন্ধ করার জন্য ছোট সংযোগ সেতু ভেঙে দেওয়া।
৩. হিট অ্যান্ড রান নিয়ম ব্যবহার করা; অর্থাৎ, পাহাড়ি এলাকাতে ছোট ছোট দল করে তাদের উপর হামলা চালিয়ে পিছু হটতে হটতে তাদেরকে আচমকা হামলা করা।
৪. মুসলমানদেরকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের হামলাকে বিলম্বিত করতে হবে। হামলা বিলম্বিত করার জন্য হুমকি দেব যে, তারা যদি মুসলিম বঙ্গে আগ্রাসন চালায়, তাহলে কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ ও চিকেন নেক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে।
৫. হামলা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে ভারতকে বোঝানো যে তারা যদি মুসলিম বঙ্গে সেনা পাঠায়, তাহলে কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ ও পাকিস্তান সীমান্তে সেনা উপস্থিতি কম হবে। এতে করে অন্যান্য মুজাহিদীনগণ হামলা বৃদ্ধি করবে।
৬. ধারণা করা যায়, ভারত মুসলিম বঙ্গের সেনা পাঠাবে, কিন্তু উপরউক্ত হুমকি প্রদান করলে তারা সেনা পাঠাতে কয়েক দিন বিলম্ব করতে পারে। বিলম্বিত সময়ের মধ্যে নতুন সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদের অবস্থান ঠিক করতে হবে।
৭. ভারত সেনা পাঠালে তাদেরকে প্রথম এক মাস কোন হামলা না করা। তারা যখন নিজেদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, তখন সুযোগ বুঝে তাদের ওপর হামলা করা।

রূপরেখা মোতাবেক ইসলামিক আমিরাত (কাল্পনিক মুসলিম বঙ্গ)

৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি।

আজ জুমার দিন। নতুন বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে, জুমার দিন এখন সপ্তাহের প্রথম দিন। আমার এই শহরের পূর্বের নাম ছিল রংপুর, যার পরিবর্তিত হয়ে এখন নতুন নাম ধারণ করেছে রহমতপুর। ফজরের মিষ্টি আজান মাইকে ভেসে আসতেই পুরো রহমতপুর শহর যেন এক পবিত্র আবহে জেগে উঠল। আজানের সেই সুর ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। রহমতপুরে এখন মাইকে আল-কোরআন তেলাওয়াত ও আজান ব্যতীত অন্য যেকোন কিছু বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ফজরের নামাজের পরই আমার নিত্যদিনের রুটিন শুরু হয়। মুসলমানদের নিয়ম অনুযায়ী, দৈনন্দিন কর্মতৎপরতা ফজরের আড়াই ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। পুরনো খ্রিষ্টান আমলের সেই কৃত্রিম ব্যস্ততা এখন আর নেই। কাজের গতি হয়তো কিছুটা ধীর, কিন্তু তাতে বরকত অনেক বেশি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত হলাম যে আমার পাজামা-পাঞ্জাবি পরিপাটি এবং দাড়ি সুবিন্যস্ত আছে কি না। গত সপ্তাহেই আমি আমার পুরনো খ্রিষ্টান পোশাকগুলো পুড়িয়ে ফেলেছি। আলহামদুলিল্লাহ, পুরুষের পোশাক নিয়ে এখন মনে কোন দ্বিধা নেই। নামাজ শেষে ঘরে এসে দেখলাম ভোরের মৃদু আলোয় ঘরের দেয়ালে টাঙানো-মাশা আল্লাহ ক্যালিগ্রাফিটি যেন এক অনন্য মহিমায় জ্বলজ্বল করছে।

গত রাতে ঈশার পূর্বেই কাজ এবং রাতের খাবার শেষ হয়েছে। বর্তমানে বিবাহ, মাহফিল বা যেকোন গণসমাবেশ মাগরিবের পর চালিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যখন থেকে ইসলামিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন থেকে আমার মতো হাজারো যুবক নতুন করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আমার বাবা একজন সাধারণ কৃষক ছিলেন। গত বছর যখন সকল বিদেশি কোম্পানিকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং ঘুষ ও সুদের অর্থে গড়া অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা সাধারণ মানুষের কল্যাণে বণ্টন করা হলো, তখন আমার পরিবার একটি ছোট কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক মূলধন পেয়েছিল। আমি সেই মূলধন দিয়ে একটি ছোট কারখানা গড়ে তুলেছি। কারণ, সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনা হলো: সকল চুক্তিভিত্তিক ও একচেটিয়া উৎপাদন বন্ধ করতে হবে, যাতে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ মানুষ উদ্যোক্তা হতে পারে। এর ফলে বড় কর্পোরেট কোম্পানির বদলে হাজার হাজার ছোট উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। যা আমাদেরকে ভেতর থেকে মজবুত করে।

মুসলিম বঙ্গের ব্যবসানীতি এখন সম্পূর্ণ সুদ-মুক্ত; প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের সকল কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রে কেবল একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক রয়েছে, যেখানে রাসূল (সা.)-এর সময়ের ন্যায় কেবল আমানত রাখা ও উত্তোলন করা যায়। মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে কিছু নাগরিক সুবিধা চালু করা হলেও তার জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রদান করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, যাকাতভিত্তিক ব্যবসানীতিতে সুদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রয়োজন আজ ফুরিয়ে এসেছে। আগে আমরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতাম এবং ব্যাংক সেই টাকা ব্যবসায়ীদের সুদের বিনিময়ে ধার দিত; ব্যাংক ছিল কেবল সুদ লিখে রাখার একটি মাধ্যম। সুদের এই প্রথার কারণে সম্পদ কেবল বিত্তশালীদের হাতে কুক্ষিগত হয়।

আল-কোরআনের সূরা হাশরের ৭ নম্বর আয়াতের নির্দেশ—যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল মানুষের মধ্যে কিছু ব্যক্তির নিকট জমা নায় হয়—এই আয়াত বাস্তবায়নে সরকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছে। পুরনো সুদভিত্তিক ব্যবসানীতির গ্রুপ প্রথা ও সিন্ডিকেট এখন নেই। এর ফলে বেকারত্ব কমেছে এবং মানুষের অহেতুক শহরমুখী হওয়ার প্রবণতাও হ্রাস পেয়েছে। সুদের কারবার এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুদের কারবার করার অর্থ হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আর এই যুদ্ধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

দেশে অর্থের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে আজ আমি আমার কারখানার মুনাফা থেকে যাকাত পৃথক করলাম। সুদ-মুক্ত ব্যবসানীতি ও চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা বেড়েছে, যার ফলে আমি আমার উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে পারছি। আজ আমার যাকাত প্রদানের নির্ধারিত দিন। মুনাফার সম্পূর্ণ যাকাত আমি ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দেব; তিনি এই অর্থ আল-কোরআনের নির্দেশিত খাতসমূহেই ব্যয় করবেন। যাতে সমাজের অভাবী ও দুস্থ মানুষগুলো আসন্ন রমজানের রোজাগুলো কোন দুশ্চিন্তা ছাড়াই পালন করতে পারে।

দুপুরে মসজিদের দিকে যাওয়ার পথে এক অভাবনীয় প্রশান্তিতে আমার মন ভরে উঠল। রাস্তায় এখন আর নারীদের অবাধ ভিড় নেই; নিতান্ত প্রয়োজনে কেউ বাইরে বের হলেও তারা সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত বোরকায় আবৃত থাকেন। ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম কিংবা পরকীয়া তো এখন নেই; এমনকি মাহরাম-রক্তের সম্পর্কের পুরুষ ব্যতীত পুরুষ-নারীর একত্রে চলাচলও এখন আইনত নিষিদ্ধ। এর ফলে পরিবারে শালীনতা ও পবিত্রতা ফিরে এসেছে। সমাজ থেকে অনৈতিকতা ও ব্যভিচার নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ইসলামিক সরকার নারীদের ২০ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এই নির্দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তা পালন করছে।

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদ এখন কেবল ইবাদতের স্থান নয়, বরং সমাজের সকল কর্মকাণ্ডের মূল প্রাণকেন্দ্র। মসজিদের ইমাম সাহেব এখন একাধারে সমাজের নেতা এবং প্রাথমিক বিচারক। জুমুআর খুতবার পূর্বে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোকপাত করলেন। আজকের খুতবায় তিনি আরাকানের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য জিহাদের গুরুত্ব এবং তারা যে যাকাতের অর্থের প্রধান হকদার, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। সেই সঙ্গে আল-কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী যাকাতের সম্পদ কীভাবে সঠিক খাতে ব্যয় করতে হবে, তার দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন।

নামাজ শেষে ইমাম সাহেব একটি সংক্ষিপ্ত সভা আহ্বান করলেন। সূরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হলো। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সমাজে পুরুষদের বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সকল নারীকে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর দিয়ে ঘরে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সভার সমাপ্তি হলো দোয়ায়ে কুনুতের মাধ্যমে, যা এখন আমাদের শপথ বাক্য হিসেবে গণ্য হয়। সভা শেষে আমীরুল মুমিনীন কর্তৃক নিযুক্ত রহমতপুরের স্থানীয় মডেল মসজিদের আমীর সকলের সাথে মুসাফাহ করলেন। তিনি পূর্বে এলাকার একটি স্বনামধন্য মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বিচার নিশ্চিত করার লক্ষে দেশের সকল মাদ্রাসার মুফতি মুহতামিমগণই এখন জেলার প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।

নেতার খুতবা ও জুমুআর নামাজ শেষে যখন ঘরে ফিরলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে দেখলাম আমার ১৭ বছর বয়সী ছোট বোনটি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। সে ছিল অসম্ভব মেধাবী এক ছাত্রী। আমি কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, কী হয়েছে বোন? সে কাঁপা স্বরে উত্তর দিল, ভাইয়া, আমার দশম শ্রেণির পড়া তো শেষ হলো। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে ছিল আরও পড়ার। আমি এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমি জানি বোন। কিন্তু মুসলমানদের ইসলামিক সরকার নারীদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাদের অভিমত হলো, এর পরের উচ্চশিক্ষা নারীকে চাহিদা ও স্বাধীনতার নামে নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলে। এখন তোমার মূল দায়িত্ব হলো ঘরেই জ্ঞানচর্চা করা এবং সংসারের কাজে মনোনিবেশ করা। যেহেতু বাবা বেঁচে আছেন, তাই তোমার উপার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। সরকার সেই সকল নারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে যাদের স্বামী বা পিতা আছে, যাতে সমাজ থেকে পুরুষ বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়।

বিকেলে ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বের হলাম। সে সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত বোরকায় আবৃত। নিরাপত্তার স্বার্থে নারীদের জন্য দুই চাকার যানবাহনে আরোহণ নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা পায়ে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা হলাম। রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী সকল সামাজিক কাজ ও অনুষ্ঠান মাগরিবের পূর্বেই সমাপ্ত করতে হয়, তাই আমাদেরও দ্রুত ঘরে ফেরার তাড়া ছিল। পথিমধ্যে দেখলাম, মাদ্রাসার একদল ছাত্র সামরিক বাহিনীর ন্যায় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে টহল দিচ্ছে। ইমাম সাহেবদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফলেই দেশ থেকে গুপ্তহত্যা, গুম ও খুনের মতো অপরাধ নির্মূল হয়েছে। আজ বিকেলে একটি বিশেষ বিচারকার্য সম্পন্ন হলো; পরকীয়া ও সমকামিতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তির প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। এ জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার বিন্দুমাত্র আপস করতে নারাজ। এই কঠোর পদক্ষেপসমূহ সমাজ থেকে ব্যভিচার ও অনৈতিক প্রেমের সম্পর্ক পুরোপুরি বন্ধ করতে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বিদেশি কোন সংস্থা বা গুপ্তচরের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ায় দেশ এখন বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বাজার থেকে ফেরার পথে লক্ষ্য করলাম, কোন দোকানেই আর নারীর ছবি সংবলিত কোন বিজ্ঞাপন নেই। অশ্লীলতা নির্মূল করতে সরকারের এই কঠোর নির্দেশনা এখন সর্বত্র মান্য করা হচ্ছে। বিউটি পার্লার, মদের বার এবং সিনেমা হলসমূহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার মোড়ে যেখানে আগে নারীর ছবিযুক্ত বিশাল বিলবোর্ড থাকত, সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে মহান আল্লাহর মহিমা প্রকাশকারী আল্লাহু আকবার ধ্বনি। নারীর ছবিযুক্ত সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও পণ্য উৎপাদন এখন আইনত দণ্ডনীয় ও নিষিদ্ধ। আমি আরও দেখলাম, এক দোকানদার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নারীদের বিশেষ পোশাকসমূহ কাগজে মুড়িয়ে জনচক্ষুর আড়ালে বিক্রি করছেন। বর্তমান জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন; রাজপথ বা কোন মোড়েই এখন আর কোন মূর্তি বা ভাস্কর্য নেই। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ এখন মাত্র ০.৫০ পয়সা হলেও, ইন্টারনেটের মূল্য অনেক বেশি এবং তা কেবল ৩জি প্রযুক্তিতে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

ফিরে আসার পরপরই আমার বন্ধু ছুটে এল, সে আগে ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত ছিল। সে বিচলিত হয়ে বলল, বন্ধু, আমি তো এক বিপদে পড়েছি। আমার এক প্রতিবেশী গোপনে সুদের কারবার করছে! মূলত ইসলামিক সরকারের নতুন মুদ্রা প্রথা চালু হওয়ার পর থেকেই পুরনো কারেন্সি, সুদ এবং ঘুষের ওপর অত্যন্ত কঠোর নজরদারি চালানো হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ও কাগজের মুদ্রার মধ্যে সামঞ্জস্য আনার লক্ষ্যে সুদ ও ঘুষের টাকায় গড়ে তোলা ব্যবসায়ীদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। সকল প্রকার হারাম উপার্জিত অর্থ এখন ইসলামিক সরকারের হারাম তহবিলে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

আমার বন্ধু এখন আর পুলিশে নেই, কারণ সকল সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীকে কর্মবিরতি প্রদান করা হয়েছে। সে আমাকে বলল, আমি ইমাম সাহেবের কাছে যাব, কারণ তিনিই এখন আমাদের সমাজের বিচারক। আমরা দুজন মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম। মসজিদে এখন আর আগের খ্রীষ্টানদের সভাপতি-নির্ভর পরিচালনা পদ্ধতি নেই, বরং ইসলামিক শূরা পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং ইমাম সাহেবই সেই শূরার প্রধান। ইমাম সাহেবের সম্মুখে বন্ধু তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। সব শুনে ইমাম সাহেব কাল সকালে উভয় পক্ষকে তলব করলেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন— অভিযোগ প্রমাণিত হলে এটি কেবল সমাজবিরোধী কাজ নয়, বরং আল-কোরআনের আইন লঙ্ঘনের গুরুতর অপরাধ। এখন আমাদের সকল আদালত আল-কোরআনের আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। আমাদের শিক্ষা এখন একমুখী, যার করণে প্রতিটি নাগরিক একই মানসিকতা ও আদর্শ নিয়ে বড় হচ্ছে, যা অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও মতাদর্শিক পার্থক্য দূর করে সমাজকে একটি নিরেট ব্লকের মতো শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলছে।

মসজিদ থেকে ফেরার পথে আমরা একটি দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, দোকানদার তার মজুদকৃত পণ্য দ্রুত বিক্রির চেষ্টা করছে। কারণ, নতুন নিয়ম অনুযায়ী আড়তদারদের প্রতি ১০-৩০ দিন অন্তর অন্তর মজুদ পণ্য খালাস করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো বাজারে পণ্যের কৃত্রিম সংকট রোধ করা এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিত্যপণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা।

পরের দিন দুপুরের আগেই আমি নিকটস্থ মারকায মসজিদ (উপজেলা কার্যালয়ে) উপস্থিত হলাম। পঁয়ত্রিশ-৩৫ টি মসজিদ নিয়ে সাত-৭ জন শূরা সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এই মারকায স্থানীয় সকল শাসনকার্য পরিচালনা করে। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, একজন সদস্যকে সম্প্রতি অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি একটি ফরজ বিধান অমান্য করেছিলেন—যা শূরা সদস্য হয়ে থাকার যোগ্যতা হারাবার প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এরপর নতুন সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হলো, কারণ তার পিতা ছিলেন একজন শহীদ মুজাহিদ। মারকায শূরার আমির সাহেব জানালেন, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী এলাকার সকল সড়ক ও যানবাহন এখন থেকে ডানমুখী করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সকল সড়ক ও প্রতিষ্ঠানের পূর্বের অর্থহীন ও বস্তুকেন্দ্রিক নামসমূহ বাতিল করে মুসলমানদের আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ ও অর্থবহ নামকরণ করার কাজও শুরু হয়েছে।

মারকায থেকে ফিরতি পথে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে কথা হলো। আগামী কয়েকদিন পরেই তার তিন মাস মেয়াদি আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হতে যাচ্ছে, যা তার মধ্যকার অলসতা দূর করে তাকে সামাজিক শিষ্টাচারসম্পন্ন একজন সুশৃঙ্খল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। এই প্রশিক্ষণ শেষে নিজের পছন্দানুযায়ী কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাকে তিনটি বিষয় নির্বাচন করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মূলত যে বিষয়ে সে নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে পারবে, সেই বিষয়ের ওপরই তাকে কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমি তাকে আদর্শিক ও সেবামূলক পেশা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি এবং মুফতি-বিচারক, ডাক্তার অথবা মসজিদের ইমাম হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেছি।

আমার স্ত্রী বর্তমানে গৃহেই অবস্থান করছেন। আমাদের বিবাহ ইসলাম মোতাবেক অতি সামান্য দেনমোহরের বিনিময়ে মসজিদে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি সর্বদা সুন্নতি পোশাক-গোল জামা পরিধান করেন এবং উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকেন। মূলত পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে পরিবার গঠনের নীতি বর্তমান সমাজে এক নতুন স্থিতিশীলতা বয়ে এনেছে। আমার স্ত্রী এখন সিজার-বিহীন স্বাভাবিক প্রসব সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। কারণ, বর্তমান সরকার যথাযথ চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণ ছাড়া সিজারিয়ান অপারেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং প্রতিটি অপারেশনের জন্য ডাক্তারকে রাষ্ট্রের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করেছে। পাশাপাশি ইসলামিক সরকার নারী ও শিশুদের সকল প্রকার পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন-টিকা প্রদান কার্যক্রমও বন্ধ করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থায় বর্তমানে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে আমরা অ্যালোপ্যাথিক নামে যে রাসায়নিক নির্ভর ওষুধ সেবন করতাম, যার ফলে রোগ প্রায়ই বারবার ফিরে আসত এবং হাসপাতাল ও ডাক্তারদের ব্যবসা ছিল রমরমা। বর্তমানে ইসলামিক সরকার সেই পদ্ধতির নির্ভরতা কমিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে প্রধান চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর ফলে মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়ার হার যেমন কমেছে, তেমনি জনস্বাস্থ্যও উন্নত হয়েছে। এখন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা কেবলমাত্র জরুরি বা বিশেষ প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথি দেশকে বৈশ্বিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেছে।

আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে এক বিশাল পরিবর্তন এসেছে। আল্লাহর স্মরণে আমরা এখন মোবাইলের আসক্তি ছেড়ে হাতের তাসবিহ ব্যবহার করছি, যা আমাদের কাছে এক উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচিত। আমার হাতে থাকা আরবি হরফে লেখা নতুন বাংলা বইটি উল্টে দেখলাম, এখন প্রতিটি গ্রন্থই ডান দিক থেকে লেখা শুরু হয়। লেখার পদ্ধতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে বাংলা কথাকে এখন আরবি হরফ দিয়ে লিখা হয়। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্রাহ্মী লিপিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। লিখার পরিবর্তন একটি জাতির চিন্তাধারাকে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার, যা মানসিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে বাঁচায়।

আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তাতেও এসেছে পবিত্রতার ছোঁয়া। এখন আমরা ইংরেজি থ্যাঙ্কস এর পরিবর্তে আলহামদুলিল্লাহ বলি, সরি পরিবর্তে আসতাগফিরুল্লাহ বলি এবং ওকের পরিবর্তে ইনশাআল্লাহ বলি। আমাদের বাংলা বর্ণগুলো এখন দেখতে অনেকটা আরবি হরফের মতো, যা ফলে আল-কোরআন শিক্ষাতে সহজ হচ্ছে। এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার মন এখন প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ। পুরো সমাজ আজ ইসলামিক আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে— যেখানে ব্যবসানীতি, সমাজনীতি, বিচারব্যবস্থা ও শিক্ষা— সবকিছুই আল-কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গ আজ কেবল একটি রাষ্ট্র নয়, বরং এটি আল-কোরআনের এক দৃশ্যমান বাস্তব রূপ, যা জাতির জীবনে বরকত ও সুদৃঢ় ঐক্য বয়ে এনেছে। আমার মতো অগণিত মানুষের বিশ্বাস, এটিই প্রকৃত বরকতময় সমাজ। নিয়মের এই কঠোর বলয়ের মাধ্যমেই আমাদের সমাজ আজ মুনাফিক ও কাফিরদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। আমার এই প্রিয় দেশ এখন এক আল্লাহ, এক ধর্ম, এক দেশ—এই নীতিতে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে মুসলিম বঙ্গের বিশ্লেষণ (গবেষণা)

সভ্যতার সূত্র অনুসারে মানবজাতিকে পরিচালনার পদ্ধতি: সভ্যতার পরিচালনা পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যারা মুমিন-মুসলমান তারা রাসূল (সা.)-এর রাষ্ট্রের আদলে বর্তমান শরিয়াহ আইনে পরিচালিত আফগানিস্তানকে শরিয়াহ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। আর যারা মুনাফিক-মুসলমান তারা বর্তমান গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়ে খ্রিষ্টানদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। সভ্যতার পার্থক্য কেবল কিছু নিয়মের নয়, বরং দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দর্শনের। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে মানুষকে দাসে পরিণত করে করপোরেট মুনাফা লুট করার ওপর, আর ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আইনে পরিচালনা করার ওপর। বর্তমানে দেশের আইন আসে মন্ত্রীদের থেকে আর মন্ত্রীদেরকে আইন দেয় খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো। গণতন্ত্র ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মসংস্থান ও অফিস-আদালতকে শহরকেন্দ্রিক করেছে, যাতে মানুষের যাতায়াত, তেল ও গ্যাসের চাহিদা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো যায়। মানুষ যত বেশি এই চক্রে ঘুরবে, পেট্রো-ডলার এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তত বেশি লাভ হবে। গণতন্ত্র মানুষকে একটি চিরন্তন চাকরির দাসত্বে আটকে রাখে। ইবনে কাসির (র.) হাদিসের আলোকে দেখিয়েছেন কীভাবে শেষ জামানায় ফিতনা মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করবে এবং মানুষ বুঝতেই পারবে না যে সে ফিতনায় আক্রান্ত। সভ্যতার পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে খ্রিষ্টানব্যবস্থা কীভাবে ইন্টারনেট, জিএমও খাদ্য, চিকিৎসা, ব্যাংকিং এবং লিপির পরিবর্তন দিয়ে মানুষের রক্তে ইবলিশি ফিতনা ঢুকিয়ে দিয়েছে। সভ্যতার পার্থক্যে অতি সূক্ষ্ম বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। খ্রিষ্টানরা মূলত এই সব কৌশল ব্যবহার করে মুসলমানদের মনে শয়তানি চিন্তা প্রবেশ করায়। সভ্যতার পার্থক্যে খ্রিষ্টানদের চক্রান্তের মূল স্তম্ভগুলো আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় উল্লেখিত বিষয়ের বাইরে অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে, সেই সব বিষয় সময়ের স্বল্পতার কারণে উল্লেখ করা হয় নাই। সভ্যতার পার্থক্যের তথ্যগুলো বাস্তবতা ও ইতিহাস থেকে নেওয়ার কারণে এখানে কোন রেফারেন্স উল্লেখ করা হয় নাই।

বাংলাদেশ থেকে মুসলিম বঙ্গ গঠনের রূপরেখা: বাংলাদেশকে পরিবর্তন করে মুসলিম বঙ্গ করলে দেশের যা পরিবর্তন হবে,

১. বর্তমানে ১ হাজার ৫০০টির বেশি অফিস ও বিলাসবহুল অধিদপ্তর ভেঙে ৩.৫ লক্ষ মসজিদকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করা হবে।

২. নতুন কোন সচিবালয় ও এসি অফিস নির্মাণ না করায় রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত মূলধনী ব্যয় রাতারাতি ৯৫% কমে যাবে।

৩. বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ কওমি আলেম আছেন যাদের মধ্য থেকে যোগ্যতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রথম বছরেই ৩ লক্ষ আমির ও বিচারক নিয়োগ দেওয়া যাবে। এর ফলে শূন্য খরচে রাষ্ট্র তার ইতিহাসের বৃহত্তম তৃণমূল প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক পাবে।

৪. বাংলাদেশের করপোরেট ব্যবসা বন্ধ করে দিলে এবং তাদের বড় বড় গোডাউনগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পাইকারি হোলসেল সেন্টারে রূপান্তর করলে ১ বছরে ৪৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যা জিডিপিতে তৃণমূলের অবদান ২৫% বাড়িয়ে দেবে।

৫. বাংলাদেশের সকল সুদি ব্যাংককে একীভূত করে একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় আমানত ব্যাংকে রূপান্তর করতে সর্বোচ্চ ৯-১২ মাস সময় লাগবে। সুদি ব্যাংক বন্ধ হলে বৈদেশিক ঋণের সুদের কিস্তি বন্ধ হয়ে যাবে। এতে প্রথম বছরেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রায় ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকবে, যা দিয়ে দেশের নিজস্ব নদীপথ ও রেলপথের সংস্কার একযোগে শুরু করা যাবে।

৬. যখন ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের কাগজের মুদ্রার মান স্বর্ণের রিজার্ভ এবং খনিজ সম্পদ গ্যাস, কয়লা, পলিমাটির মোট মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে, তখন দেশের বাজারে মুদ্রাস্ফীতি চিরতরে ২% এর নিচে নেমে আসবে।

তবে মুসলিম বঙ্গ যেহেতু একটি অখণ্ড পারমাণবিক শক্তিধর অঞ্চলের পাশে, তাই এখানে সম্পূর্ণ করপোরেট-বিরোধী ও আইএমএফ-মুক্ত একটি খেলাফত গড়ে উঠলে খ্রিষ্টান বিশ্ব ও কাফের রাষ্ট্রগুলো ব্যবসায়িক নিষেধাজ্ঞা দেবে। মুসলিম বঙ্গকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করতে কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং নদীপথের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মুসলিম বঙ্গের রাষ্ট্রব্যবস্থাটি বাস্তবায়ন করা প্রথম ১ বছর কিছুটা কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে ২য় বছর থেকে এর অর্থনৈতিক সুফল যেমন—করমুক্ত ব্যবসা, বিনা খরচে বিচার, সুদমুক্ত অর্থনীতি কারণে রাষ্ট্রে সুবিধাসমূহ যখন জনগণের ঘরে পৌঁছাবে, তখন আমিরের প্রতি জনগণের আনুগত্য ১০০% নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় মুসলিম বঙ্গ একটি স্বনির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা যা চালুর পর অত্যন্ত দ্রুত নিজের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম।

মুসলিম বঙ্গ কর্তৃক প্রাথমিক নির্দেশনাসমূহ: মুসলিম বঙ্গের প্রাথমিক নির্দেশনাগুলো মূলত একটি বৈপ্লবিক রাষ্ট্রের জরুরি অবস্থার অধ্যাদেশ। রাষ্ট্রের যখন আমূল পরিবর্তিত হয়, তখন ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনে মধ্যে সমাজকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পুরনো ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করার জন্য এই ধরনের কড়া ও আপসহীন নির্দেশনার প্রয়োজন হয়। ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গকে রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণার পর:

১. আইনশৃঙ্খলা ১ থেকে ৭ দিন: বর্তমান আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কর্মবিরতি দিয়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার মসজিদের অধীনে গড়ে ৫ জন করে ছাত্র নিয়োগ দিলে দেশজুড়ে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি হবে। যেহেতু ছাত্ররা স্থানীয় এবং এলাকার প্রতিটি অপরাধপ্রবণ স্থান ছাত্রদের চেনা, তাই প্রথম ৭২ ঘণ্টাতেই প্রথাগত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এবং রাজনৈতিক ক্যাডারভিত্তিক চাঁদাবাজি ৯৮% নির্মূল হবে।

২. রাষ্ট্রের কার্যক্রম ৭-১০ দিন: সরকারি অফিস ও জেলা আদালতগুলো বন্ধ করে নথিপত্র মসজিদে স্থানান্তর করলে কাজের সাময়িক ধীরগতি আসবে। তবে ১০ম দিনের মধ্যে ৩.৫ লক্ষ মসজিদ ইমাম আমির হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নিলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের বিকল্প হিসেবে মসজিদ চালু হলে তৃণমূলের মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিক সমস্যা সমাধান ও প্রশাসনিক কাজ কোন ঘুষ ছাড়াই ১০০% সচল হয়ে যাবে।

৩. নিত্যপণ্যের দাম ১১ থেকে ৩০ দিন: মধ্যস্বত্বভোগী, আড়তদার এবং বাজারের রাজনৈতিক চাঁদা একযোগে বন্ধ হওয়ার কারণে এবং ৩০ দিনের মধ্যে গুদাম খালি করার আইনি বাধ্যবাধকতায় বাজারে পণ্যের সরবরাহ উপচে পড়বে। প্রথম ৩০ দিনের মধ্যে চাল, ডাল, তেল ও সবজির দাম ৩০-৪০% কমে আসবে।

৪. শ্রমবাজারের মহাবিপ্লব ৩১ থেকে ৬০ দিন: চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম ৬০ দিনের মধ্যে বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীদের পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করলে দেশে প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ পদ শূন্য হবে। এই পদগুলোতে বেকার পুরুষদের এবং নারীদের পুরুষ অভিভাবকদের (বাবা/ভাই/স্বামী) পদায়ন করলে দেশের যুব বেকারত্ব এক ধাক্কায় ৮৫% কমে যাবে।

৫. নৈতিক ৬১ থেকে ৯০ দিন: দেশের বিউটি পার্লার, মদের বার, পতিতালয়, সিনেমা হল বন্ধ হলে এবং রাস্তায় মাহরাম ছাড়া চলাচল নিষিদ্ধ হলে ইভটিজিং, ধর্ষণ, পরকীয়া ও নৈতিক অবক্ষয়জনিত অপরাধ ৯৯% নির্মূল হবে। এবং মোবাইল ইন্টারনেটকে ৩জি-তে নামিয়ে আনা ও মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ায় ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব ও অনলাইন গেমসে তরুণদের দৈনিক গড় অপচয় ৪.৫ ঘণ্টা কমে ৩০ মিনিটে নেমে আসবে। এর ফলে যুবসমাজের মানসিক মনোযোগ ও উৎপাদনশীলতা রাতারাতি বৃদ্ধি পাবে।

৬. চিকিৎসা ৯১ থেকে ১০০ দিন: চিকিৎসকদের জন্য সিজারের পূর্বে লিখিত জবাবদিহিতা চালু করলে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান প্রসবের হার দেশের মোট প্রসবের ৫০% থেকে সরাসরি ১০%-এর নিচে নেমে আসবে। সাধারণ পরিবারগুলোর চিকিৎসকের ফি ও টেস্টের পেছনে খরচের ৬০% কমে আসবে।

প্রথম ১০০ দিন শেষে, পুরনো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের ওপর একটি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর, করমুক্ত, সুদমুক্ত এবং শূন্য-বেকারত্বের মদিনা রাষ্ট্রভিত্তিক কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। সাময়িকভাবে করপোরেট ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ধাক্কা লাগলেও, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এতটা শক্তিশালী হবে যে দেশ যেকোন ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবরোধ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম বঙ্গের মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম: বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়গুলো বাদ দিয়ে যখন মুসলিম বঙ্গের মন্ত্রণালয়গুলো চালু হবে তখন রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যেসব পরিবর্তন আসবে:

১. প্রশাসনিক, বিলাসবহুল অফিস ও প্রটোকল বাবদ বার্ষিক ২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
২. জনগণের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও কোচিং বাণিজ্যের ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
৩. দেশের যোগাযোগ, যানজট মুক্তি ও তেল আমদানিতে ৪০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
৪. চিকিৎসা, টেস্ট কমিশন ও ওষুধ কোম্পানির সিন্ডিকেট ধ্বংস করলে ১৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
৫. মাদক, জুয়া, যিনা ও রাজনৈতিক দল বিলোপে অপরাধ দমন বাবদ ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
৬. নদীর পলিমাটি ও খনিজ সম্পদের নিজস্ব ব্যবহার করলে ৪৮ হাজার কোটি টাকা লাভ হবে।
৭. গ্রুপ কোম্পানির একচেটিয়াত্ব ভেঙে ক্ষুদ্র ব্যবসার যাকাত বসালে ৭০ হাজার কোটি টাকা আয় হবে।

সর্বমোট রাষ্ট্রের ও জনগণের বার্ষিক সাশ্রয় ও আয় হবে প্রায় ৫.৩ ট্রিলিয়ন টাকা। যখন বাংলাদেশ থেকে খ্রিষ্টানদের পুঁজিবাদ এবং কাফেরদের তৈরি আইন-কানুন সমূলে উপড়ে ফেলা হবে, তখন রাষ্ট্র কেবল আধ্যাত্মিকভাবেই আল্লাহর প্রিয় হবে না, বরং বস্তুগতভাবেও শূন্য বেকারত্ব, শূন্য ভিক্ষুক, এবং সর্বনিম্ন অপরাধ হারের এক অপরাজেয় বৈশ্বিক পরাশক্তিতে পরিণত হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বাস্তবসম্মত পরিসংখ্যান ও কাঠামোগত তত্ত্ব প্রমাণ করে, মুসলিম বঙ্গ অপ্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় প্রায় ৭০-৮০% কমিয়ে আনে এবং সেই সাশ্রয়কৃত সম্পদকে সরাসরি উৎপাদনশীল খাত কৃষি, সেচ, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং প্রতিরক্ষায় স্থানান্তরিত করে। মুসলিম বঙ্গ কেবল একটি আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র নয়, বরং একটি গাণিতিকভাবে টেকসই, স্বাবলম্বী এবং অপরাজেয় রাষ্ট্রকাঠামোর নিখুঁত রূপরেখা। মুসলিম বঙ্গের প্রতিটি মসজিদ হবে একই সাথে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র, একটি শরয়ী আদালত, একটি যাকাত ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যাংক এবং একটি সামরিক ডিফেন্স পোস্ট। মুসলিম বঙ্গের সমন্বিত ঘাঁটি শেষ জামানায় উম্মাহকে শয়তানি ফিতনা থেকে রক্ষা করে খেলাফতের প্রকৃত নেয়ামত উপহার দিতে সক্ষম।

ইসলামিক আমিরাত মুসলিম বঙ্গের নিরাপত্তা কাঠামো: বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৬১০ বর্গকিলোমিটার। ৩১৩+৩১৩=৬২৬টি ব্যাটালিয়ন সারা দেশে ছড়িয়ে দিলে প্রতি ২৬৩ বর্গকিলোমিটারে ১টি করে আধা-সামরিক ব্যাটালিয়ন এবং ১টি করে নিয়মিত সামরিক ব্যাটালিয়ন অবস্থান করবে। এর অর্থ হলো, দেশের যেকোন প্রান্তে কোন সংকট তৈরি হলে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্রিগেড সাইজ রেসপন্স টিম সেখানে পৌঁছাতে পারবে। খিলাফতের আদলে সামরিক বাহিনীর বিন্যাসটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, ফ্র্যাক্টাল-ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটেড নেটওয়ার্ক, যা শত্রুর ড্রোন ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তির টার্গেটিং অ্যালগরিদমকে ফাঁকি দিতে সক্ষম এবং এর প্রতিটি ব্যাটালিয়ন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন। ইসলামিক সামরিক কাঠামোতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার কারণে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সামরিক শক্তির ওপর আদর্শিক ও বেসামরিক আইনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণত শত্রুপক্ষ রাতের অন্ধকারকে কৌশলগত সুবিধা হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু মুসলিম বঙ্গ রাতের বেলায় হাই-মোবিলিটি এবং হাই-ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে দেশকে দ্বিগুণ সুরক্ষা করেছে। মুসলিম বঙ্গের সামরিক কাঠামোতে যুগের পরিবর্তনের কারণে কিছু নাম নতুন করে সংযোগ করা হয়েছে এবং সামরিক দল গঠন প্রক্রিয়াতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। মুসলিম বঙ্গের সামরিক কাঠামোতে উল্লেখিত নামগুলো সামরিক সুবিধার্থে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

বর্তমান সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড অত্যন্ত কঠোর ও এককেন্দ্রিক। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন যুদ্ধের শুরুতে শত্রুপক্ষ মূল সেনা সদর দপ্তর বা সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টার ধ্বংস করে দেয়, তবে নিচের ব্যাটালিয়নগুলো দিকনির্দেশনাহীন হয়ে পড়ে। মাকড়সার বাসার জ্যামিতিক নকশার সুবিধা হলো, এর সুতোগুলো চারদিকে জালের মতো ছড়ানো থাকে এবং কোন একটি কোণ ছিঁড়ে গেলেও বাকি জালটি অক্ষত থাকে। ইসলামিক কেন্দ্রীয় কমান্ড না থাকলেও প্রতিটি ব্যাটালিয়ন নিজস্ব কমান্ডারের অধীনে স্বাধীনভাবে পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ চালাতে পারে।

বর্তমান সেনাবাহিনীতে অফিসার এবং সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে বিশাল এক মনস্তাত্ত্বিক ও জীবনযাত্রার দেয়াল আছে। অফিসারদের জন্য আছে ডিউটি বাদেও বিশাল সুযোগ-সুবিধা, আলাদা মেস, জমকালো গলফ কোর্স, বিলাসবহুল ক্লাব এবং অবসরোত্তর পুনর্বাসনের বিশাল সুবিধা। বর্তমান সেনাবাহিনী হলো ভারী, আমলাতান্ত্রিক এবং পিরামিডীয় কাঠামো যা শিল্পবিপ্লব উত্তর ইউরোপীয় এবং খ্রিষ্টান রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা। অন্যদিকে, খিলাফতের সেনা কাঠামো হলো হালকা, গতিশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নৈতিকতা-চালিত বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা, যা আধুনিক যুগের ড্রোন-স্যাটেলাইট প্রযুক্তি এবং হাইব্রিড যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও কার্যকর।

রাসূল (সা.)-এর জীবনীর আলোকে মুসলমানদের করণীয়: মুসলিম বঙ্গ মূলত গণতন্ত্রের বিপরীত একটি সমান্তরাল রাষ্ট্রকাঠামো। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সামরিক কৌশল এবং বিশ্বের বিভিন্ন সফল ইসলামি বিপ্লবের ডেটা ও পরিসংখ্যানের আলোকে ইসলামিক কৌশলের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পতন ঘটাতে কত সময় লাগতে পারে, তার একটি বাস্তবসম্মত ও কৌশলগত সময়রেখা আলোচনা করা হলো।

একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র, যার অধীনে আধুনিক সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বৈশ্বিক খ্রিষ্টান শক্তিদের সমর্থন রয়েছে, তার পতন কোন একক আকস্মিক ঘটনায় ঘটে না। ইসলামিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পতন প্রক্রিয়াটি ৬টি ধাপে আনুমানিক ৫ থেকে ২০ বছর সময়সীমার মধ্যে হতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ৫ থেকে ২০ বছর লাগার কারণ দেখানো হলো:

১. বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থ আসে ভ্যাট-ট্যাক্স ও কর থেকে যা জনগণ থেকে চাঁদা হিসেবে তোলা হয়। যদি দেশের ৫০% জনগণ ১ বছর ভ্যাট-ট্যাক্স ও কর দেওয়া বন্ধ করে তাহলে এই রাষ্ট্র ৫ বছরের মধ্যে এমনি দেউলিয়া হয়ে যাবে।

২. বর্তমান রাষ্ট্র তার কর্মীদের বেতন ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ঘাটতি অর্থ খ্রিষ্টান সংস্থাদের থেকে সুদে ঋণ করে আনে। বর্তমান রাষ্ট্র এই সুদের ঋণ পরিশোধ করে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দিয়ে। যদি দেশের ৫০% প্রবাসী সুদি ব্যাংক বাদ দিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠায় তখন বর্তমান সরকার সুদের ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ঋণবিহীন ২ বছরের বেশি চলতে পারবে না।

৩. বর্তমান রাষ্ট্র বিদ্যুৎ, গ্যাস, গাড়ির লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সাধারণ মামলা ও পানির বিল থেকে কর নেয়। যদি দেশের ৫০% জনগণ এই বিল দিতে বিলম্ব করে এবং যানবাহন মামলার টাকা পরিশোধ না করে তাহলে বর্তমান সরকারের আয় ৩০% কমে আসবে। আয় কমলে সরকার তার কর্মীদেরকে বেতন দিতে পারবে না।

৪. অপটিক্যাল কেবল ও ইন্টারনেট ফিতনা: যদি সমুদ্রের নিচের অপটিক্যাল কেবল এবং খ্রিষ্টানের ইন্টারনেট কাঠামো প্রথম ধাপেই বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে পর্নোগ্রাফি, জুয়া ও খ্রিষ্টান সংস্কৃতির প্রচার বন্ধ হওয়ার কারণে যুবসমাজের মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর দ্রুত ঘটবে। এতে ২০ বছরের সময়রেখা কমে ১২ থেকে ১৫ বছরে নেমে আসবে।

৫. ভূরাজনীতিতে ভারত যদি তার অভ্যন্তরীণ কোন বড় সংকটে যেমন—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহ বা কাশ্মীরে তীব্র যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে, তবে মুসলিম বঙ্গের ওপর ভারতের হস্তক্ষেপের সক্ষমতা কমে যাবে, যা চূড়ান্ত বিজয়কে আরও নিকটবর্তী করবে।

৬. মুসলিম বঙ্গের ছায়া রাষ্ট্র কাঠামোর শীর্ষ নেতাদের সুরক্ষার শতভাগ সফল হলে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন ভাবেই ইসলামিক আন্দোলনকে নেতৃত্বশূন্য করতে পারবে না, যা পতনের গতিকে নিশ্চিত করবে।

মুসলিম বঙ্গের তাত্ত্বিক ও কৌশলগত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেতর থেকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করলে এবং ছদ্মবেশে সমান্তরাল রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করে বহিরাগত ঘাঁটির সহায়তায় ধারাবাহিক ধাক্কা দিলে ৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে গণতন্ত্রের পতন নিশ্চিত হবে।